শ্রীরাধা।

প্রথম খণ্ড।

তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্ কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্ ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা।

প্রথম সংস্করণ।

শ্রীমন্মথনাথ নাগ

সম্পাদক—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

মেদিনীপুর হিতৈষী
কার্য্যালয়।

মেদিনীপুর-হিতৈষী প্রেসে মুদ্রিত।

ভিক্ষা—এক টাকা]   [বাঁধাই ১৷০ মাত্র।

উৎসর্গ।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪

[এই অলৌকিকী গুণময়ী আমার মায়া দুস্তরা, তথাপি যাহারা আমাকে ভজনা করে, তাহারা এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে ; অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তির বলে আমার স্বরূপ জানিতে পারে।]

যিনি জীবের প্রেম ইষ্টের সহিত সংযোগ করিয়া দেন, অর্থাৎ ইষ্ট-সমাহিতচিত্ত জীবের প্রেমকে যিনি ইষ্টের আন্তরিকতা বৃদ্ধির উপায় স্বরূপের নির্দ্দেশ দান করেন—তিনিই যোগমায়া।

শ্রীরাধা-রচনা-প্রবৃত্তি দানে যিনি আত্যন্তিক অনুরক্তি দান করিয়াছেন, যাঁহার কৃপায় স্বপ্নেও শ্রীরাধা ও গোপবালাগণের নৃত্য গীতাদি ক্রীড়ার আত্যন্তিক সাধনা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, যাঁহার কৃপায় যমুনাতটে তাঁহাদের অমৃতবর্ষী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পবিত্র ও জাগ্রত হইয়াছি, যাঁহার কৃপায় চিন্তার উদ্বেগে বিধির অনিন্দিত নির্ম্মাণ-কৌশল-সুপরিপুষ্ট শ্রীরাধার নবনীত-কোমল সোণার অঙ্গ শীর্ণ ও মসীবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া কৃষ্ণ সাধনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছি, যাঁহার কৃপায় শ্রীরাধার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-মহিমার স্বাদ গ্রহণে উন্মুখ হইয়াছি, সেই অঘটনঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার ভক্তকৃপাকরুণায় জগতে শ্রীশ্রীরাধামাধব মহিমা কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রচারিত হউক, তদুদ্দেশে সেই যোগমায়ার শ্রীচরণে পুনঃপুনঃ প্রণিপাত করিয়া এই শ্রীরাধাকথামৃত গ্রন্থ তাঁহারই অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী ভক্তগণের শ্রীকরকমলে অর্পণ করিলাম।

ভক্তকৃপাকণাপ্রার্থী
লেখক।

ভূমিকা।

ব্রজভুমির সহজ সাধনা।

ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন,—যোগ-মার্গাবলম্বী সকল ধর্ম্মেই ইহার উপদেশ আছে। আসন, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, শম, দম,—সকল ধর্ম্মেই ভগবল্লাভ জন্য ইহার বিধি বা অনুশাসন প্রদত্ত হইয়াছে। মানুষ রিপুর দাস ; সর্ব্বদাই কর্ম্মব্যস্ত ও চঞ্চল। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃই চাই সংযম। বাক্ সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, মনঃ-সংযম। একটা কিছু সংযত হইলে অন্যান্যগুলিকেও সহজে সংযত করা যায়। অভ্যাসই সকলের মূল। নিয়মিত সময়ে নিয়মিত-ভাবে সকল ধর্ম্ম, সকল কর্ম্ম সংসাধন কল্পে তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলে ক্রমশঃই তাহাতে ফললাভ করা যায়। অবশ্য দৃঢ়সংকল্প সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে কখনই ফললাভ হয় না।

হিন্দু ধর্ম্মে প্রথমতঃ কায়শুদ্ধির বিধি আছে। কায় শুদ্ধি না হইলে চিত্ত শুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে মনঃ-সংযম হয় না। মনঃ-সংযম না হইলে ধ্যান ধারণা জন্মে না। একান্ত-মনে নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যেয় বস্তু ধ্যান করিতে হয়। কায়মনোপ্রাণে সংযত হইয়া ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিলে তবেই সঙ্কল্প পূরণের আশা করা যায়। হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় কোন ধর্ম্মেই ইষ্টলাভের জন্য এমন বিধিবদ্ধ উপায় নাই। মনে প্রাণে সত্যসন্ধ—সত্যবাক্ হইতে হইলে যে যে বিধি নিষেধ আছে, তাহা আন্তরিকতার সহিত পালন করা চাই। আর চাই ভক্তি

প্রীতি প্রেম। ইষ্টদেবতার প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা চাই। যোগশাস্ত্র বলিতেছেন আদৌ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না হইলে বিধি বিহিত কর্ম্ম হয় না।

বিধি বিহিতভাবে কর্ম্ম করিতে বা ইষ্টলাভ করিতে হইলে দীক্ষার প্রয়োজন। গুরুর নিকট আসন, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি শিখিতে হয়, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে সাধনা করিতে বা তাহার বিধি নিষেধে অবহিত হইতে হয়। এজন্য যত মত তত পথেরও ব্যবস্থা আছে। মহাযোগী মহেশ্বর হঠযোগ ও তন্ত্রমতেও যোগসাধনার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হিন্দু শাস্ত্রে সহজ সাধনার পন্থাও আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পাঁচ ভাবেই ইষ্ট চিন্তা বা ইষ্টসাধনা করা যায়। হিন্দুর শাস্ত্রপুরাণে ইহার বহু প্রমাণ আছে। এ সম্বন্ধে শ্রীরাধা গ্রন্থের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হইয়াছে। মধুর ভাবের উপাসনা সহজ ও চিত্তাকর্ষক। ইহাতে ধ্যান, ধারণা, বা নিদিধ্যাসনের কোন বিধি বিহিত কার্য্য কিছুই নাই। ইহা কেবলা রতি। কেবলার স্বভাব হইতেছে এই যে, "দেখিলেও না করে প্রত্যয়!" ইষ্ট বা উপাস্যের কোন অলৌকিক কার্য্য শুনিলে বা দেখিলেও সে তাহাকে মনুষ্যাতীত দেবতা বা জীব বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। সে সর্ব্বদাই তাহাকে আপনার স্বধর্ম্মী জীব বা সম পর্য্যায়ভুক্ত মানুষ বলিয়াই মনে করিবে।

"তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম।"

আবার উপাস্যও বলিতেছেন—

"আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে তিনিও আপনাকে বড় মানাইতে চান না। তিনি চান, আমাকে ছোট বা সমভাবে ভাবুক; তবেই স্নেহ ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে, তদ্রূপ আচরণ করিলে তাহাতে যে স্নেহ মমতা ও প্রীতি প্রেমের পরিচয়, তাহাতে আমি

তাহাদের অধীন হইতে বড়ই আনন্দ পাই। তাহাদের তিরস্কার ভর্ৎসনা—বেদস্তুতি হইতেও আমার মধুর লাগে!

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হতে তাহা হরে মোর মন॥

কেন? আন্তরিকতায়! আন্তরিকতা হীন পূজা বা স্তুতি তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তিনি প্রেমের ঠাকুর! প্রেম বশতঃ তাহাকে প্রহার করিলেও তিনি হাসি মুখে তাহা সহ্য এবং তাড়ন ভর্ৎসন অঙ্গের ভূষণ করেন! তিনি প্রেমের ঠাকুর!—প্রেম যেখানে নাই, সেখানে তিনি নাই। সম্পদ, ধনরত্ন, ফল মূল—মিষ্টান্ন—দধি দুগ্ধ, ক্ষীরসরনবনী, ভোজ্যের লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে বশীভূত করা যায় না! তিনি দেখেন অন্তর! কে তাঁহাকে কেমন ভালবাসে, কেমন আন্তরিকতা দেখায়! তাঁহার প্রতি কাহার কত নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, প্রীতি-প্রেম! এবং তাহা কত সহজে কি ভাবে অর্পণ করা হইতেছে! শ্রদ্ধা ভক্তিহীন আনুষ্ঠানিক বেদ-বিহিত শাস্ত্র-সম্মত পূজায় তিনি নাই। তিনি চান সহজ প্রেম!

দাস্যে—দাসের, প্রভুর প্রতি সেবার আন্তরিকতা, সখ্যে—সখার প্রতি মরমের বন্ধন, আনন্দ, হাস্য পরিহাস, একত্র ভোজন শয়ন ও ভ্রমণের বিলাস; বাৎসল্যে—স্নেহের টান, অদর্শনে অমঙ্গল চিন্তা, তাড়ন ভর্ৎসন, সর্ব্বদাই নিকটে রাখিয়া ভোজন শয়ন, ক্রীড়াদিতে সতর্ক দৃষ্টি, পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি, সুখ স্বাস্থ্যের আশঙ্কা নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ, শিক্ষা ও জ্ঞান সমৃদ্ধি দানের অপূর্ব্ব উদ্যম; মাধুর্য্যে—আন্তরিকতার চূড়ান্ত—দেহ-গেহ, ধনরত্ন, বিপদ-আপদ, সুখ-সম্পদ, শয়ন-ভোজন, ক্রীড়া-কৌতুক, মমত্ব, হৃদয়-বিনিময়, সেবা, স্নেহ, সখ্য, শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রীতি-প্রেম,—বিরহ অসহ্য,—দুশ্চিন্তা—অমঙ্গল আশঙ্কা, প্রাণের প্রাণ—জীবনের জীবন, —আমি তোমার তুমি আমার! তোমার অদর্শনে আমি বাঁচি না!

তোমার সেবা ভিন্ন আমার আর অন্য কর্ম্ম নাই, তোমার সুখ স্বস্তি চিন্তা ভিন্ন আমার আর অন্য চিন্তা নাই, তুমি আমার দেহ, মন, প্রাণ—আত্মা! তোমার সেবার জন্যই আমার দেহ ধারণ!

ইহারই নাম সহজ ভাব! এইভাবে ইষ্ট চিন্তাতেই তিনি ধরা দেন। নতুবা তাঁহাকে ধরিবার সাধ্য কাহার? শুধু বিধি বিহিত পূজার আড়ম্বর দর্শন করাইয়া তাঁহাকে ধরা যায় না। ব্রজমণ্ডলে এখনও এই সহজ ভাব বর্ত্তমান আছে! এভাবের ন্যায় সহজ সাধ্য সাধনা আর নাই। ব্রজমণ্ডলের এভাব অধিবাসী-বৃন্দের অস্থি-মজ্জা-গত! ব্রজমণ্ডলে কিছুদিন বাস করিলে বা ব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলে এভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এমন সরল সহজ পন্থা জগতে আর কোথাও নাই। ইষ্ট সাধনার আড়ম্বর বা পূজোপকরণের বৈচিত্র্য কিছুই নাই। কেবল মনে প্রাণে ঐকান্তিকতা,—আমার প্রভুর কি প্রকার সেবা করিব; সখার সহিত কখন মিলিব—আনন্দ করিব, ক্রীড়া করিব—সখাকে কি খাওয়াইব। বাৎসল্যে—আমার গোপালের নাওয়া, খাওয়ার শোয়ার কোন ক্রটি না হয়;—"ওরে লালা! ভোর হইয়াছে,—উঠ, মুখ ধোও, সরা ঢাকা লুচি, মোহনভোগ, ননী, মাখন, ক্ষীর, সর, পেড়া লাড্ডু আছে খাও। দুষ্টুমি করো না, সভ্য ভব্য হও, কাপড় চোপড় পর, অলঙ্কার হারাইও না,—লেখা পড়া শিখ, দূরদেশে যাইও না, সঙ্গীদের সঙ্গে গৃহের আঙ্গিনাতেই খেলা কর, মারামারি করিও না, চুরি করিও না, গোচারণে দূর প্রান্তে যাইও না। মাধুর্য্যে—সমং প্রাণঃ সখামতঃ—সখা—প্রাণ-বিনিময়, তোমার হৃদয় আমার হৃদয় সমান! তোমার সুখ দুঃখে আমারও সুখ দুঃখের পরিমাণ সমান, তোমার সুখে আমার সুখ, তোমার দুঃখে আমার দুখ। তোমার সুখ, তোমার আনন্দ, তোমার স্বাস্থ্য বিধানই আমার কর্ত্তব্য। তজ্জন্য আমার একমাত্র কর্ত্তব্য তোমার সেবা, তোমার সুখ স্বাস্থ্য বিধান জন্য কায়মনোপ্রাণে যত্ন! তুমি

বনে বনে বিচরণ কর, পদে কুশাঙ্কুর ফুটে, আমাদের প্রাণে বাজে! গোচারণে দূর বন প্রদেশে যাও, কত বন্য জন্তু—কত পিশাচ আছে, সর্ব্বদাই ভয়ে আমাদের প্রাণে কাঁপে! দিবা অবসান পর্য্যন্ত গোচারণ কর, স্নানাহার হয় না এজন্য আমার উদ্বিগ্ন হই। স্নানাহারে শরীর স্নিগ্ধ হইলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। তোমায় তখন দেখিয়া আনন্দলাভ করি। কংস তোমার প্রাণনাশ জন্য সর্ব্বদাই অনুচর পাঠাইতেছে,—তুমি একক, কি জানি কখন কি করে! তোমার সেবা করিব বলিয়া আমাদের কায়মনে কত আকাঙ্ক্ষা!—দিবস রজনী মিষ্টান্ন প্রস্তুত করি, মালায় তুমি আনন্দ লাভ কর, এজন্য উত্তম পুষ্পের মালা গাঁথিয়া রাখি, ক্ষীর সর নবনীত তুমি ভালবাস, এজন্য আমরা জনে জনে পবিত্রভাবে কত সন্তর্পণে তাহা ঢাকিয়া রাখি। তোমার জন্য চিন্তায় ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলে, তুমি যে আমাদের প্রাণারাম! তোমার অমঙ্গল চিন্তায় আমাদের প্রাণ আকুল হইয়া উঠে! যতক্ষণ তোমায় দেখিতে না পাই, ততক্ষণ আমরা তোমার অনুসন্ধানে মন প্রাণ উচাটন হয়! এবং তোমায় দেখিলে তবে আমাদের প্রাণ আশ্বস্ত হয়। কখন তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, কি ভাবে কেমন করিয়া তোমায় দেখিব, দিন রাত কেবল আমাদের সেই চিন্তা! আমরা আছি দেহে কিন্তু মন প্রাণ—আছে তোমারই নিকট! কুঞ্জকাননে কখন তোমায় দেখিব, কেমন করিয়া খাওয়াইব, কেমন শয্যায় শয়ন করাইব, কেমন সাজাইব, তোমার বচন-সুধাপানে আমাদের মন-প্রাণের ক্ষুধা মিঠাইব, সারাদিন আমাদের সেই চেষ্টা ও সুযোগ অন্বেষণ!

শ্রদ্ধাভক্তি, স্নেহ মমতা, প্রীতি প্রেম অর্থাৎ প্রাণের টানই সহজ সাধনা বা উৎকৃষ্ট উপাসনা। দিবস রজনী যাহারা এই কামনাই এমন সরল সহজভাবে তাঁহাকে জানাইয়া অহর্নিশ তাঁহাকে স্মরণ

করিতেছে, তাহাদের আসন, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহারের আর কি প্রয়োজন ?

ভক্ত ভগবানকে স্মরণ মনন জন্য যাহা কিছু করিতে পারে, ব্রজ-ভাবে তাহাই স্থান পাইয়াছে, অথচ তাহা নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের সহিত সংসার যাত্রার পথের বাধক নহে। রুচি অনুসারে স্মরণ মনন জন্য যেভাবে আনন্দ পাওয়া যায় এবং তাহা যত সরল সহজ হয়, শ্রীরাধা গ্রন্থে তদ্রূপভাবে প্রকটিত হইয়াছে। কে লিখিয়াছে বলিতে পারি না, অবশ্য যন্ত্ররূপে অধমের ভিতর দিয়া তাঁহাদের ইচ্ছাতেই তাহা বাহির হইয়াছে। তাঁহাদের সে ইচ্ছার পরিস্ফুরণ যে সম্যক হয় নাই তাহা ধ্রুব সত্য! কারণ অধম অযোগ্যের দ্বারা কি সাফল্যের আশা করা যায় ?

অদ্যাপিও ব্রজলীলা করে ব্রজরায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

ইহা সত্য সত্য সত্য! প্রাণের টান লইয়া যে যে ভাবে অগ্রসর হও, দেখিবে তোমার সেই ভাবই বর্ত্তমান আছে,—প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে! তোমার প্রভু, তোমার সন্তান, তোমার নর্ম্ম সখা, তোমার নর্ম্ম সখী নিকটস্থ হইয়া তোমার সোহাগ আদর লইবে, তোমার সহিত কথা কহিবে, প্রেম প্রদর্শন করিয়া তোমাকেও মোহিত করিবে। ইহা ধ্রুব সত্য! ধ্রুব সত্য! ধ্রুব সত্য!

বৃন্দাবনে ইহা নিত্য ঘটিতেছে! শুধু বৃন্দাবন কেন, তোমার গৃহ বৃন্দাবনেও ইহা অভাব হইবে না। চাই কেবল প্রেম। প্রেমের টান যত বাড়িবে তিনি বা তাঁহারা ততই টানা হইয়া আসিবেন!

শ্রীরাধার কত প্রেম—কত টান, তাহা পরিমাপ করিবার সাধ্য কাহার ?—সে প্রেম বর্ণনা দূরে থাকুক, তাহা কল্পনা করাও বুঝি মনুষ্য বুদ্ধির অসাধ্য। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরাধা-প্রেমের কতক উদাহরণ লোক সমাজে প্রদর্শন জন্য যে লীলা করিয়া গিয়াছেন,

তাহাও চিন্তা করিবার শক্তি আমাদের নাই। তজ্জন্য শ্রীরাধা গ্রন্থের সরল সহজভাব, আমাদের ন্যায় কলির মানুষের সহজ সাধনার বোধ-গম্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইষ্টকে যত সহজভাবে আপনার করিতে পারিবে, ততই তিনি তোমার আপনার হইবেন এবং সহজ ধারণা—সহজ চিন্তায় যাহাতে তাঁহার লীলার আনন্দ লাভ হয় এবং তাহাতে দিন রাত মত্ত থাকা যায়, সেভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। আরও উপাসনার প্রধান অঙ্গ ধ্যান। লীলা-ধ্যানে যিনি যত মত্ত থাকেন, তাহার সাধনা ততই উচ্চ ও আনন্দদায়িনী। ধ্যানের জন্য শ্রীরাধা গ্রন্থ প্রত্যহ একবার পাঠ করিলেও সেই কাজ এবং আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড সত্বরই প্রকাশিত হইবে। শ্রীশ্রীরাস অধ্যায় হইতে তাহা আরম্ভ হইয়াছে। এখণ্ডে ব্রজলীলার চরম মাধুর্য্য বর্ত্তমান। এখণ্ড পাঠে অশ্রুকম্প পুলকে শরীর মুহুর্মুহুঃ শিহরিত হইবে। এমন পাষণ্ড কেহ নাই যাহার প্রেমাশ্রু না ঝরিবে!

লেখনী সম্বরণ করিতে না পারিয়া কতবার মনে ভাবিয়াছি, কেমন ভাবে মিলন হয় দেখা যাউক; কিন্তু এমন ভাবে লেখনী চলিল, এমন মিলন হইল যে, তাহা দেখিয়া অশ্রু ধারায় বক্ষঃ ভাসি-য়াছে! রাধা-কৃষ্ণ মিলনের অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া মোহিত ও আনন্দিত হইয়া উদ্দেশ্যে যোগমায়ার শ্রীচরণে পুনঃপুন প্রণত হইয়াছি।

ইতি
দোল পূর্ণিমা।
১০ই চৈত্র, ১৩৪৬।

লেখক
শ্রীমন্মথনাথ নাগ
মেদিনীপুর।

শ্রীরাধা।

প্রস্তাবনা।

ধন্য ভারতবর্ষ!—ধন্য হিন্দুস্থান! সমুদ্রমেখলা, হিমাচল-কিরিটিনী, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-নাগাপ্সরাদি সেবিতা, দেবাসুরকামকেলি-বিনোদিনী, আর্যচিন্তাপ্রসবিনী, আর্য্যধর্ম্ম সংরক্ষিণী ধন্য ভারতমাতা!

এমন অপূর্ব্ব জলবায়ু, পর্ব্বতকান্তার, গিরিগুহা, নদনদী, সিংহ-ব্যাঘ্রহস্তীভল্লুকগণ্ডারহরিণগবাশ্বমেষমহিষছাগখগনরবানর ও অত্যুত্তম পাদপলতাগুল্ম পরিবৃত দেশ পৃথিবীতে বিরল। এমন মহিমা, এমন উৎকর্ষ, এমন অপরূপ দৃশ্য জগতের আর কোন দেশে নাই। কোথাও উষ্ণ প্রস্রবণ, কোথাও লেলিহান্‌জিহ্ব অগ্নিদেব পর্ব্বত-গাত্র, প্রস্রবণ এবং উষ্ণ, ঈষদুষ্ণ ও সুশীতল সলিলপূর্ণ কুণ্ড হইতে অনন্তকাল শিখা বিস্তার করিয়া বহির্গত হইতেছেন—জলে অনল জ্বলিতেছে! জল আলোড়িত করিলে তরঙ্গ বিস্তারের সহিত সমুদ্ভাসিত জলজ পানার ন্যায় তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত হয় এবং তরঙ্গ স্থির হইলে আবার পূর্ব্ববৎ বিস্তৃতি লাভ করে!

জল আলোড়িত করিয়া লোকে কুণ্ডে স্নান করিতেছে, অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করে না! কিন্তু সেই অগ্নিতে অন্য কোন দাহ্য পদার্থ ধরিলে তাহা জ্বলিয়া যায়!—কি অপূর্ব্ব মহিমা—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী কুণ্ডে এই প্রকার অপূর্ব্ব অগ্নি অনন্তকাল জ্বলিতেছে! জ্বালামুখীপর্ব্বতগাত্র হইতে এইরূপ অগ্নিশিখা প্রতিনিয়ত উত্থিত হইতেছে। জ্বালামুখী তীর্থের অপূর্ব্ব মহিমা এই যে, ভক্ত জ্বালামুখী মাতার জন্য কোন নৈবেদ্য লইয়া গেলে অগ্নিশিখা তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া নৈবেদ্য—এমন কি দুগ্ধাদির পাত্রেও প্রবেশ করিয়া ভক্তের জন্য কিঞ্চিৎ প্রসাদ রাখিয়া সমুদয় ভক্ষণ করত অন্তর্হিত হন। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের গাত্র হইতেও অনবরত অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে!

কোথাও অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে অবিরত সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর সলিল প্রবাহিত হইতেছে! কোথাও পর্ব্বতদুহিতা নদী কলকলনাদে অচলকন্দর ভেদ করিয়া অমৃতস্বাদু কাচস্বচ্ছসলিল রাশি রূপে অত্যুচ্চ শিখরদেশ হইতে সহসা নিম্নভূমিতে পতিত হইয়া কোটী কোটী গজমুক্তার সৃষ্টি করিতেছে! কোথাও তালতমালশাল বনরাজিনীলা অপূর্ব্বদর্শন নীলাম্বুধি তীরে ক্রমান্বয়ে তরঙ্গাঘাত করিয়া ভীষণতার সৃষ্টি করিতেছে! কোথাও তালতমালশালবেল-তিন্তিড়ীপনসবনস্পতি অশত্থবটকপিত্থপাকুড় বংশডুম্বুরকুলকদলী নারিকেললিচুচম্পকবকবকুল নাগেশ্বররুদ্রাক্ষ, জবাযাতিযূথীগোলাপ-কুড়চিলবঙ্গমাধবীদ্রাক্ষাহংসলতা প্রভৃতি পরিশোভিত গভীর অরণ্যে হরিণচমরীগোমহিষহস্তীসিংহব্যাঘ্রঋক্ষবানরসর্পসরীসৃপ ময়নাময়ূরকাক-কোলিলকাকাতুয়াশুকসারসচাতকবকহংসকরণ্ডবুলবুলপাপিয়া খড়-হাঁসচিলহাড়গিলামাছরাঙ্গাছাতারে প্রভৃতি পশুপক্ষী সরীসৃপাদি নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে!

কোথাও পর্ব্বতের সুদীর্ঘ শৃঙ্গে অবিরাম তুষারপাতে বিরাট ধবলগিরির সৃষ্টি হইতেছে! কোথাও পর্ব্বতগাত্রে অসংখ্য প্রকারের উদ্ভিদরাজি উদ্ভূত হইয়া বিরাট বিভীষিকায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে!

ফলতঃ এমন অপূর্ব্বদেশ, এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য,—এমন সমুদ্রপর্ব্বতপরিবেষ্টন, এমন ফলশস্যভার, এমন শীতোষ্ণ-তুষারপরিমণ্ডিতজলবায়ু পৃথিবীর অন্য কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার যেন সকলই অদ্ভুতত্ব পরিপূর্ণ।

মাটীতে সোনা ফলে, আকাশ অমৃত বর্ষণ করে! বায়ু সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সুযোগ প্রদানে ধাবিত!—এইজন্য ইহা হিন্দুস্থান—ভারতবর্ষ! ভা (অপূর্ব্ব ধর্ম্মবাণী—মোক্ষাদি ব্রহ্মবাণী) রত (নিষ্ঠ) আর্য-দিগের জন্মভূমি বলিয়া ইহার নাম ভারতবর্ষ।

ইহা শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ নহে, ইহার আভ্যন্তরিক বা আন্তরিক সৌন্দর্য্যই এই প্রকার অদ্ভুত মহিমার জনক। এইজন্যই ইহা দেবস্থান। ভারতের দিকে দিকে পর্ব্বতের গুহায় গুহায় দেবানন্দ বৰ্দ্ধক এখনও সহস্র সহস্র মুনি ঋষি ভগবদ্ধ্যানে নিরত! তাঁহাদেরই ইচ্ছা ও কার্য্যে ভারতবর্ষ দেবস্থান। তাই এখানে যুগে যুগে ভগবানের অবতার ও লীলা হয়। জগতের মধ্যে ইহা এইরূপ অপূর্ব্ব স্থান বলিয়াই দেবতার লীলা প্রকটিত হয়। আবার ইহা দেব-বাঞ্ছনীয় বলিয়াই এইরূপ অচিন্তনীয় সৌন্দর্য্যরাশি বিভূষিত হইয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছে। এমন মাধুরীময় মুনিঋষির দেশ, এমন ভগদ্ভাব, ভক্তি ও প্রেমের দেশ, এমন জন্মগত-ভক্তিপ্রবণতার দেশ, এমন ভগবদ্ভাবাধিক্যের দেশ,—এমন দেশে ভগবানের লীলা না হইলে হইবে কোথায়? তাঁহার লীলা বুঝিবে কে? তেমন সঙ্গী মিলিবে কোথায়? তাই তিনি ভারতে আসিয়াই লীলা করিয়া থাকেন।

ইহা যেমন বিরাট দেশ,—তেমনই বিরাট আরাধনা! ভগবান্‌কে কেমন করিয়া উপভোগ করিতে হয়, কেমন করিয়া তাঁহাকে আপ-নার করা যায়, কেমন করিয়া তাঁহার আপনার হওয়া যায়,—সে চিন্তা—সে উপাসনা—সে আরাধনা ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশ জানে

না—জানিতে পারেনা। যে দেশে শয়নে স্বপনে, উঠিতে বসিতে ভগবচ্চিন্তা, যে দেশে খেলাধূলা আরাম বিরামে ভগবচ্চিন্তা, যে দেশে আহারে বিহারে ভগবচ্চিন্তা, যে দেশ ভগবানকে আপনার জন করিয়া লইয়া বিপদে সম্পদে আহারে বিহারে পুত্র, সখা, পতি ও প্রভুরূপে স্নেহ-বাৎসল্য-ভক্তি-প্রেমের আদান প্রদান করিতে অভ্যস্ত, সে দেশে ভগবান্ তাহাদের মধ্যে আসিয়া রসোপভোগ করত ভক্তগণকে কৃতার্থ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই এ দেশের লোক জানে কেমন করিয়া ভগবান্‌কে উপভোগ করিতে হয়। **তাই ভক্তঃ অপেক্ষা ভগবান্ই অধিকতর কৃতার্থ হয়েন!** কারণ তিনি ভক্তপ্রাণ। ভক্তের আনন্দই তাঁহার আনন্দ! ভক্তকে উপভোগ—ভক্তকে আনন্দ দানই তাঁহার স্বভাব! ভক্তের জন্যই তাঁহার আগমন—মানুষী দেহ ধারণ!

শয়নে স্বপনে, আহারে বিহারে, উঠিতে বসিতে, ভ্রমণে চিন্তায় তাঁহাকে উপভোগ করিবার ফন্দী অন্বেষণ করিয়া যাঁহারা তদ্গতচিত্ত তাহাদিগকে ফাঁকি দেওয়া ভগবানেরও সাধ্য নহে। তাই তিনি ধরা দিয়া তাহাদের মধ্যে একজন হইয়া তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসেই ভগবান্‌কে আস্বাদ করা যায়। কিন্তু অধিকারী ভেদে রসের আস্বাদনেও তারতম্য ঘটে।

শান্তরস-পিপাসুগণ উপলব্ধি করেন,—ভগবান্ নিষ্কল, নির্ব্বিকার, জ্যোতির্ম্ময়, সচ্চিদানন্দ, নিরাকার, অরূপ, শান্তরসাস্পদ—রস বৈ সঃ! তাঁহারা তাহাতে পরিতৃপ্ত।—ভগবানের অন্য রূপের কল্পনা তাঁহাদের মনোমধ্যে স্থান পায় না।

দাস্যরস-পিপাসুগণের নিকট ভগবান্ নিরাকার বা অরূপ থাকিতে পারেন না; তখন তাঁহাকে আকার গ্রহণ করিয়া প্রভু হইতে হয়। দাস দেখে ভগবান্ তাহাদেরই ন্যায় সাকার;—তিনি দয়াশীল, ভৃত্যের

সুখদুঃখের সহানুভাবক, আদেশ কর্ত্তা, সচ্চিদানন্দময়, শান্ত-রসাস্পদ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী গুরুগম্ভীর প্রভু।

সখ্যরস-পিপাসুগণের নিকট তিনি একবারে সখা!—সুখদুঃখে সমবেদনা—সমবয়স্ক তাহাদেরই একজন। হাস্য পরিহাস, উচ্ছিষ্ট ভোজন, কাঁধে পিঠে চড়া, কাঁধে হাত দিয়া ভ্রমণ, তাহাদের সহিত গান—বিপদে আপদে রক্ষা—একবারে প্রাণ দিয়া পড়া—"তুমি আমি সম—" এক প্রাণ এক ভাব! ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, সর্ব্বশক্তিমানত্ব ও ঈশত্ব বিলুপ্ত একবারে পঞ্চভূতের মানুষ! কেবল সখাদের আনন্দ বর্দ্ধনই তাঁহার একমাত্র কার্য্য! দাস্যে যেমন শান্ত দাস্য দুই ভাব আছে; সখ্যেও তেমনই শান্ত, দাস্য ও সখ্য তিন ভাবই আছে। দাস যেমন প্রভুর সেবায় পরিতৃপ্তি পায়, প্রভুর কৃপায় দাস্যের আনন্দে বিভোর হইয়া উঠে—আত্মহারা হয়—কেমন করিয়া প্রভুর সেবা করিবে সেই পন্থান্বেষণই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্যে পরিণত হয়,—প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহার আনন্দের সীমা থাকেনা; সখ্যেও তেমনই কৃষ্ণ দর্শনের জন্য তাহারা আকুল হইয়া উঠে। কৃষ্ণ বিনা যেন তাহাদের প্রাণ বাঁচেনা। কৃষ্ণর সহিত মিলিত হইয়া যেন তাহারা মৃতদেহে প্রাণ পায়! কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি যেন তাহাদের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া তাহাদিগকে উৎফুল্ল, প্রভূতশক্তিশালী, সাহসী ও কৃতকৃতার্থ করে। ঐশ্বর্য্যবীর্য্যের সন্ধান যে না পায় তাহাও নহে; প্রয়োজন হইলেই কৃষ্ণের বীর্য্যবত্তারূপে তাহা প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণের এরূপ শক্তি সামর্থ্য আছে জানিয়া তাহারা কৃষ্ণের ভরসায় সর্ব্ব ভয়কেই উপেক্ষা করে। কৃষ্ণ তাহাদের সর্ব্ব ভয়ের ভয়—ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং! কিন্তু সর্ব্বশক্তিমানত্বের সন্ধান তাহারা তেমন করিয়া পায়না যাহাতে তাহারা কৃষ্ণকে ভগবান্ বা দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারে। কৃষ্ণ তাহাদের সেই ধারণা উন্মেষের মূলে এমন করিয়া কুঠারাঘাত করেন যাহাতে তাহারা তাঁহাকে মানুষ

বা আপনাদেরই একজন বলিয়া বুঝিয়া প্রভূত আনন্দলাভ করে। কৃষ্ণ অসাধারণ শক্তি ও জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন এই ধারণাই তাহাদের মধ্যে জাগরুক হয়।

বাৎসল্য-রস-মুগ্ধ বা মুগ্ধার নিকট কৃষ্ণ একবারে নির্ব্বোধ বালক! —অতি অপগণ্ড শিশু—কাণ্ডাকাণ্ড কোন জ্ঞান নাই! পিতামাতারূপে তাঁহারা কৃষ্ণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন—তাড়ন ভর্ৎসনায় কৃষ্ণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছেন! কৃষ্ণের মঙ্গল কামনায় তাঁহাদের চিন্তার বিরাম নাই। কেমন করিয়া দুরন্ত ছেলেকে জল, আগুণ, বায়ু, বৃক্ষ, হিংস্র জন্তু, সর্প ও শত্রু হইতে রক্ষা করিবেন সর্ব্বদাই সেই দুশ্চিন্তা! কৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহাদের বক্ষঃ ফাটিয়া যায়! শত শত অমঙ্গল চিন্তায় অধীর হইয়া উঠেন! কৃষ্ণের সংবাদ লইবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে কিঙ্করগণে প্রেরণ করিয়া অধীর হইয়া দ্বারদেশে অবস্থান করেন। মনে করেন কি কুক্ষণে কৃষ্ণকে আন জনের সহিত ছাড়িয়া দিয়াছেন—কি জানি কি বলিতে কি হয়! কৃষ্ণ বড় দুরন্ত—কখন কি করিয়া বসে! কি জানি যদি জলে ঝাপ দেয়, আগুণ লইয়া খেলা করিতে করিতে যদি দগ্ধ হইয়া যায়, প্রবল বাত্যার সম্মুখে পড়িয়া যদি উৎক্ষিপ্ত হয়, বৃক্ষে চড়িলে যদি শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, গভীর বন জঙ্গলে প্রবেশ করিলে যদি হিংস্রজন্তুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, কৃষ্ণের মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া যদি কেহ তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, যদিবা কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাদ হয়, সে যদি তাহার অঙ্গে আঘাত করে বা তাহাকে প্রাণে মারিয়া ফেলে, এইরূপ ভয়ে বাৎসল্য রসমুগ্ধ পিতামাতা কৃষ্ণের অদর্শনে অজস্র অশ্রুপাত করিয়া অচিন্ত্য উদ্বেগে উন্মনা হইয়া দণ্ডে শতবার কৃষ্ণ দর্শনের আশায় উন্মাদের ন্যায় অধীর হইয়া বিচরণ করেন।

দূর হইতে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া ছুটিয় গিয়া কোলে লইয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আত্যন্তিক অনুরক্তির সহিত মনপ্রাণ ঢালিয়া কৃষ্ণ-

মুখচুম্বন করিয়া যেন প্রাণে বাঁচে! কৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহাদের দেহে যেন প্রাণ ছিল না, কৃষ্ণ দর্শনে যেন তাহা ফিরিয়া পাইলেন। কত যত্নে; কত স্নেহে, কত আন্তরিকতায় কৃষ্ণকে গৃহে আনিয়া ধোয়াইয়া মুছাইয়া কত সোহাগে কত যত্নে অতি কোমল, অতি স্নেহময় সুমিষ্ট দ্রব্য খাওয়াইয়া বুকে রাখিয়া ঘুম পাড়ান। শয্যায় শয়ন করাইয়া অতি সন্তর্পণে দেহের পার্শ্বে হস্ত রাখিয়া নিদ্রা যান। তাহা নিদ্রা না কৃষ্ণস্পর্শের বাৎসল্য-মোহ তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ ক্ষণে ক্ষণে উঠিয়া কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন,—কৃষ্ণ দেহের চারি পার্শ্বে কোন পোকা মাকড় পিপীলিকা বা মশকাদি আসিয়াছে কিনা আগ্রহের সহিত তাহা নিরীক্ষণ করেন,—অতি সন্তর্পণে কৃষ্ণ দেহের চারি পার্শ্বে হাত বুলাইয়া দেন, কৃষ্ণের মোহনীয় রূপ দর্শন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন—নিদ্রা কোথায় পলায়ন করে! কৃষ্ণের ভবিষ্যতের কত উজ্জ্বল চিত্র মনে মনে আঁকিয়া আনন্দ আশ্বাসে হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া তুলেন—কৃষ্ণদেহ হইতে যেন নয়ন অন্যত্র ফিরাইতে পারেন না!—আহা! কৃষ্ণ রূপ দর্শনই যেন নয়নের সার্থকতা! কৃষ্ণ নিদ্রা হইতে উঠিলে কি করিবেন, কেমন করিয়া কৃষ্ণকে বক্ষেঃ রাখিবেন, কেমন করিয়া সাজাইবেন, কেমন করিয়া খাওয়াইবেন, কেমন করিয়া নয়নে নয়নে রাখিয়া রক্ষা করিবেন, কেমন করিয়া খেলা করাইবেন, কেমন করিয়া সঙ্গীদের সঙ্গে লইয়া তাহাকে আনন্দ দান করিবেন ইত্যাদি চিন্তায় বিভোর হইয়া স্নেহাধিক্যে কৃষ্ণ প্রীতিকর কার্য্য সমষ্টি সম্পাদন করিয়া শান্ত দাস্য সখ্যের সমুদয় কর্ম্মই অগোচরে করিয়া যান। সুতরাং ভক্ত শান্ত হইতে দাস্য, দাস্য হইতে সখ্য, সখ্য হইতে বাৎসল্যে যেমন এক এক গ্রাম করিয়া উঠিতেছে ভগবানও তেমনই এক এক গ্রাম করিয়া নামিতেছেন!—আন্তরিকতা যত বাড়িতেছে ভগবান্‌ও তত আপনাকে খাটো করিয়া ধরা দিতেছেন—আপনাকে ছোট করিয়া—ভক্তের তাড়ন ভর্ৎসনার

বিষয়ীভূত হইয়া তাহাদের আন্তরিকতার প্রসারতা বৃদ্ধি করিতেছেন! ভগবান চাহেন শুধু হৃদয়;—প্রীতি, প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, আন্তরিকতাই তাঁহার কাম্য বস্তু। এ সমুদয়ের প্রসারতা যত বৃদ্ধি হয়, জ্যোতির্ম্ময়, নিষ্কল, দুর্নিরীক্ষ্য—বাষ্পের ন্যায় নিরাকার ভগবান্ ততই জমাট বাঁধিয়া ছোট হইয়া আসিয়া ভক্তের ক্রীড়ার সঙ্গী হয়েন। বাৎসল্যে পিতামাতার নিকট একবারে অবোধ শিশু! বিড়াল ছানার মত মা যেখানে রাখেন সেইখানেই থাকেন! সেবা লইবার এমন অদ্ভুত ভঙ্গী আর নাই!! কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মন উঠিতেছে না। এ সেবার উপরেও যেন আরও কি একটা আছে—যাহাতে প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়—প্রাণে প্রাণে মেশামেশি হয়! বাৎসল্যে যেন সেবার পূর্ণ পরিণতি হয় না, যেন কোথায় কি একটা ক্রটি রহিয়া যাইতেছে! ভগবান্‌কে আস্বাদ করিবার যেন আরও কি একটা প্রকৃষ্ট রস আছে, তাহা নহিলে যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না। শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যে যেন সেরূপ হৃদয়ের বিনিময় হয় না—সেরূপ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না—সেরূপ সর্ব্বস্বার্পণ হয় না! দেহ মন প্রাণ দানের তেমন পন্থা বুঝি আর নাই, তাই এ রসেও তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না—তজ্জন্য রসান্বেষণ করিতে করিতে গোপীদিগের নিকট ধরা পড়িলেন এবং বিনামূল্যে যে রসে বিক্রীত হইলেন সে রস—মধুর!

যখন গোপীরা তাঁহাকে মধুর-রসে আপ্লুত করিলেন তখন একবারে তাঁহার ভগবান্ত্বের অবসান হইল!! তখন তিনি মনচোরা হইয়া আবির্ভূত হইলেন। গোপীরা তাঁহার বিরহে কাতর, তিনিও তাহাদের বিরহে কাতর! গোপীরা বরং ধৈর্য্য ধরিয়া মান করিয়া থাকিতে পারে, তিনি কিন্তু তাহা পারেন না;—গোপীদিগের বিরহ তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহ্য!—ছলে কৌশলে তাহাদিগের মান ভাঙ্গাইবার সাহচর্য্য লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন! কেন

গোপীরা যে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছে, তাহাদের যে আপন বলিতে আর কিছুই নাই! কৃষ্ণ বলিতে যে তাহারা অজ্ঞান! যে মনমুখ এক করিয়া ভগবানে ঠিক ঠিক আত্ম সমর্পণ করিতে পারে ভগবান্ তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাহার শয়নভোজন, আরাম ভ্রমণ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য সকলই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়; তাই তিনি ভক্তের জন্য ব্যাকুল হন।

ভক্ত ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়া নিজেই সুখী হয় এবং নিজ সুখের জন্যই সে যোগ, ধ্যান, তপস্যা করে। ভগবান্ আত্মারাম—কেহই তাঁহাকে সুখ দান করিতে পারে না, তবে তিনি ভক্তের জন্য এত চঞ্চল কেন? কারণ তিনি ভক্তপ্রাণ! তাই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ জন্য ভক্তের সুখদায়ক মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"—তিনি বলিয়াছেন, যে আমাকে যে প্রকারে ভজনা করে আমি তাহাকে সেই প্রকারে ভজনা করি। অর্থাৎ আমি তাহার সেই বাসনা পূর্ণ করি।

দেব (দিব্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া) গণ ক্রীড়াশীল। তাঁহারা ক্রীড়ার্থ বা লীলার্থ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহাতে "কেন" নাই। একোহম্ বহুস্যাম্—যেমন তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছা জাগিল, অমনই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল। যাউক সে অনেক কথা। এখানে সে কথার আলোচনায় আমাদের কাজ নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন "বাগানে আসিয়াছ আম খাও, কত গাছ, কত শাখা, কত পাতা ইত্যাদি গণনায় যদি সময় যায় তবে আম খাবে কখন?"

মধুর রসের অধিকারিণী যাঁহারা, তাঁহারা ভক্তচূড়ামণি। তাঁহাদের ভিতর শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর—এই পঞ্চ রসই বর্ত্তমান। তাঁহাদের চিন্তা, তাঁহাদের সেবা, তাঁহাদের সখীত্ব, তাঁহাদের মমত্ব, তাঁহাদের অনুরাগ সর্ব্ব রসের শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয়। চিন্তার পরাকাষ্ঠায়

তাঁহারা কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সেবার মহত্ত্বে দেহ ও সখ্যের মহিমায় প্রাণ এবং মমত্বের আতিশয্যে হৃদয় দান করিয়াছেন। আর অনুরাগের অসীম আকর্ষণে আত্মসর্ব্বস্ব দানে অভীষ্ট দেবতাকে আত্মহারা করিয়াছেন। ইহাই মধুর রসের মাধুর্য্য!

গোপীদের ন্যায় এমন রসসৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার কৌশল জগতে আর নাই। দয়িতকে আত্মহারা করিবার মন্ত্রৌষধি গোপীদের ন্যায় জগতে আর কেহ জানে না। দয়িতের সেবা, দয়িতের মনোবাঞ্ছা-পূরণ, দয়িত-সর্ব্বস্ব হইয়া জীবন ধারণ করিতে তাঁহাদের ন্যায় আর কেহ নাই।

তাঁহারা জানিতেন ঃ—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র কাম্যবস্তু। তাঁহাদের যাহা কিছু কার্য্য, যাহা কিছু চিন্তা তৎসমুদয়ই কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই নির্ব্বাহিত হইত। তাঁহাদের আহার বিহার—সাজ সজ্জা, শয়ন মনন সকলই কৃষ্ণের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইত। কৃষ্ণ যাহাতে আনন্দ পান একমাত্র তদ্রূপ কার্য্যই তাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল। এক কথায় তাঁহারা ছিলেন কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণকামিনী—কৃষ্ণভাবিনী!

কথায়, চিন্তায়, কার্য্যে, শয়নে, ভোজনে, ভ্রমণে সর্ব্বপ্রকারে কৃষ্ণকে আনন্দ দানই তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য। সর্ব্ব শরীর দিয়া কৃষ্ণের আনন্দ বিধানই ছিল তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা। কৃষ্ণ ব্যতীত—কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন কামনা ব্যতীত আর তাঁহাদের অন্য কোন কামনাই ছিল না। তাঁহাদের একমাত্র কাম্য ছিল—কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ সেবা। কৃষ্ণ সেবার অভাবে কৃষ্ণের "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন। এমন একনিষ্ঠ প্রেম ধর্ম্ম জগতের অন্যত্র দুর্লভ।

ধর্ম্ম কি ?—ধৃ + মন্—ধর্ম্ম। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ। যাহা সকলকে পোষণ করে তাহাই ধর্ম্ম। পুরাণমতে যাহা দ্বারা লোক স্থিতি বিহিত হয় তাহার নাম ধর্ম্ম। যুক্তিবাদীমতে মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করাকেই ধর্ম্ম কহে। জ্ঞানবাদীমতে মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি যে ভক্তি বা প্রীতি জন্মে তাহার নামই ধর্ম্ম। শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও অহিংসা ইত্যাদি কার্য্যও ধর্ম্ম নামে অভিহিত। অভিধানে ধর্ম্মের এইরূপ বহু লক্ষণই পাওয়া যায়; কিন্তু জ্ঞানিগণ ধর্ম্মের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম সাধনার প্রথম সোপান শরীর ও মনের বিশুদ্ধীকরণ। শরীর ও মনের বিশুদ্ধতা লাভ হইলে তবে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায়। ভারতবর্ষ জড়বাদীর দেশ নহে। এখানে জড়ত্ব বা শরীরই সর্ব্বস্ব নহে। শরীরকে কেন্দ্র করিয়া শরীর হইতে পৃথক আত্মার উন্নতি সাধন জন্য পবিত্র কর্ম্মযোগাদিই এই ধর্ম্মক্ষেত্রের একমাত্র কৃত্য। এই কর্ম্ম সম্পাদন জন্য ভারতবর্ষে ভগবান্‌কে উপভোগের কতপ্রকার উপদেশ। কেমন করিয়া ভগবান্‌কে সম্ভোগ করা যায় তাহার উপদেশ বা কর্ম্মেই জীব শিব হইতে পারে। সেই সমুদয় উপদেশের বিশ্লেষণে এই ধর্ম্মক্ষেত্রে কৃত্যের প্রকার ভেদ ঘটিয়াছে। প্রকার ভেদ যত প্রকারেই হউক, বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা তাহা এমন সুকৌশলে পর্য্যন্ত সীমায় উপনীত হইয়া পরীক্ষিত সত্যে পরিণত হইয়াছে যে, সে পথে আর ভ্রান্তি নাই। যে কেহ সেই সমুদয় পথ অবলম্বন করিবেন তিনিই ঋষি প্রদর্শিত সেই সেই পথের উদ্দিষ্ট ফললাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবেন।

ভারতবর্ষ ধর্ম্মক্ষেত্র। এখানে জন্মগ্রহণ মাত্র হিন্দু ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়। বিচারবুদ্ধি দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন বা স্থাপন করিতে হয় না;—ইহাই হিন্দুর প্রকৃতিগত লক্ষণ। সে যতই

নিরক্ষর বা নীচ জাতি হউক, জন্মের সহিতই তাহার ভগবদ্বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করে। সে দেবমন্দির দেখিলে স্বতঃই প্রণত হয়। এইজন্য স্বর্গগত মিসেস্ আনি বেসান্ত ভগবানের নিকট, ভারতীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের মাটীর গুণে ভগবদ্ভক্তি লাভের সহজ উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া অন্য যে কোন জাতি ভারতে আসিলে তাহারও হিন্দুত্ব প্রাপ্তির ষোল আনা সম্ভাবনা আছে। কারণ এতদ্দেশীয় ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সান্নিধ্য লাভ করিলে সে ভগবন্মুখী হইবার বহু উপকরণ পাইয়া ধন্য হইবে। হিন্দু স্বতঃই ভগবন্মুখী হইয়া কেমন করিয়া কোন উপকরণে, কোন কৃত্যে কি ভাবে ভগবান্‌কে লাভ করা যায় তাহাই চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। শুধু চিন্তা নহে, চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেব কৃপায় সিদ্ধির সহজ লভ্য পথ লাভ করত ধন্য হইয়াছেন। সে পথ অভ্রান্ত, নিত্য, সত্য ও শাশ্বত। মানুষ যখন দেবতার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার রূপ ও শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হয় ও আত্মহারা হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়ে এবং কেমন করিয়া তাঁহার মহিমায় চিরদিন অভিভূত থাকা যায় তাহার উপায় অন্বেষণ করে তখনই দেবতা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া গূঢ় উপায় বলিয়া দিয়া **দেব-মানব** সম্বন্ধ স্থাপন করেন।

হিন্দু আত্মসংযম (শমদমাদি) আসন নিয়ম, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে স্বতঃই আগ্রহশীল কেন? শুধু ভগবান্ লাভের জন্য। দেহের কোন অংশের কি প্রকার সঙ্কোচন বা প্রসারণ, শুক্র বা বায়ু ধারণ, স্নেহ, দয়া, মায়া, ভক্তি প্রীতি ও প্রেম প্রভৃতি দ্বারা কেমন করিয়া ভগবল্লাভ হয় তাঁহার বিশ্লেষণ জন্য প্রতিনিয়তই কার্য্য ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, কোন প্রক্রিয়ায় কেমন করিয়া মনঃসংযম হয়, কেমন করিয়া ভগবান্‌কে আপনার করিতে পারা যায়, কেবল তাহার অন্বেষণেই আপনাকে

ব্যাপৃত রাখিতে চাহে। সে বুঝিয়াছে একদিন তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য ;—জগতই মরণশীল ! মানব দেহের পূর্ণপরিণতি একমাত্র ভগবল্লাভে। তখন সে বিচার করিল,—জ্ঞানে, না প্রেমে ? মৃত্যুঞ্জয়ী হইতে হইলে কোন পথটী সুগম ? —বুঝিল জ্ঞানে বহু দূর ! ধ্যানধারণা, নিদিধ্যাসন জ্ঞানের সুবৃহৎ কর্ম্ম ! ভগবান্‌কে ব্রহ্ম বা অতি বৃহৎ ভাবিয়া তাঁহাকে ধ্যানে ধারণা করিবার চেষ্টার জন্য শমদমাদি আসন, নিয়ম, প্রাণামাদির বিধি ব্যবস্থা—বলপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বত্বাধিকারের চেষ্টা !—ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া তাঁহার সত্তা উপলব্ধির প্রয়াস !—তিনি সদয় কি নির্দ্দয়, তিনি সসীম কি অসীম, সৎ কি অসৎ, তিনি চিৎ কি জড়, তিনি আনন্দ কি নিরানন্দ—এই সমুদয় উপলব্ধি জ্ঞানের কার্য্য, ইহা সকলেরই বোধব্য। কিন্তু উপায় মহান্—পথ অতি শুষ্ক। যিনি প্রেমময়, দয়াময়—আনন্দময়—কি উপায়ে তাঁহাকে উপভোগ করিয়া এ মর জীবন ধন্য করা যায়—মানব জীবন সার্থক হয়, তাহার উপায় অন্বেষণ জন্য উক্ত জ্ঞানিগণ বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যখন ভগবানের সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন করিলেন, তখন পুলকে পূর্ণ হইয়া আনন্দাশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইলে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া বলিলেন :—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না—যোগিদিগের হৃদয়ও আমার বাসভূমি নহে ; আমার ভক্তগণ যেখানে আমার গুণগান—প্রেমভরে আমার স্মরণ মনন করেন আমি সেইখানেই অবস্থান করি।

তখনই জ্ঞানীদের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল—তাঁহারা প্রেমে অভিভূত হইলেন ! তাঁহারা বুঝিলেন ভগবান্‌কে ধরিতে হইলে চাই ভক্তি।

ভক্তি—ভজধাতু তি প্রত্যয়। ভজ ধাতুর অর্থ ভজন বা সেবা। কিরূপ ভজন ? পিতামাতা, প্রভু, গুরু প্রভৃতি গুরুজনদিগের প্রতি

যে আন্তরিকতা তাহার নাম ভক্তি। ইহাতেও কার্য্য সিদ্ধি হয়; কিন্তু ভক্ত ও ভগবানে অনেক দূরত্ব রহিয়া যায়—ছোট বড়র সঙ্কোচ প্রসারণ -কিন্তু কিন্তু ভাব!—অপরাধীর ভাব!—কি জানি কখন কি অপরাধ ঘটে ভক্ত এই ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ভক্তি পাকিলে প্রেম হয়। তখন ভয় সঙ্কোচ দূরীভূত হইলেও ঐরূপ ক্ষেত্রে তাহা কতকটা রহিয়া যায়। তজ্জন্য ঋষিদিগের চিন্তা আসিল কেমন করিয়া নির্ভয়ে অসঙ্কোচে প্রেমাভিলাষ পূর্ণ করা যায়? প্রেমে ভগবানকে ভালবাসিতে না পারিলে জীবনের পূর্ণপরিণতি হয় না—জীবন অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। সর্ব্বদা ভগবানকে উপলব্ধি করিতে হইলে চাই মধুর ভাব। মধুর ভাবে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও মধুর—এই চারি ভাব আছে আবার মধুরের মধুরত্বও আছে! যেমন এই উপলব্ধি অমনই ঋষিগণের আর বিলম্ব সহিল না, আরাধনা করিয়া তাঁহারা ভগবানের প্রেয়সীত্বের অধিকার রূপ বর প্রার্থনা করিলেন। ভগবানও ঈষদ্ধাস্য সহকারে তাঁহাদিগের অভিলাষ পূরণের বর দান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। তাঁহারাই যথাসময়ে ব্রজে ব্রজগোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের অধিকারিণী হইয়াছেন। ইহাই পুরাণের কথা।

সখায় সখায় প্রেমে যেমন সঙ্কোচ নাই! পরস্পর পরস্পরের গা পা টিপিবার আদেশ করিতেও সঙ্কুচিত নহে, একজনের পীড়ায় অন্য জনের অসঙ্কোচ সেবা, সহানুভূতি, উদ্বেগ!—কেমন করিয়া সখার পীড়া সারিবে, কি করিলে, কি দিলে তাহার পীড়া যন্ত্রণার অবসান হইবে, এই চিন্তায় আত্মহারা—শয়নে ভোজনে সুখ স্বস্তি নাই, যেমন হিন্দুর স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ;—স্বামীর পীড়া হইলে স্ত্রীর প্রাণে কত আতঙ্ক!—কেমন করিয়া তাহার পীড়ার অবসান হইবে, অনন্য মনে কেবল সেই চিন্তা! আন্তরিকতা গাঢ় হইলে ইহা স্বতঃই হয়। সেইরূপ সোহাগ-লালিতা স্ত্রীর পীড়া হইলেও পতির ঐ ভাব।

প্রোষিতভর্ত্তিকা—স্ত্রী স্বামী-সোহাগিনী হইলেও একটু "কিন্তু" রহিয়া যায়। স্বামীকে সে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে—তাঁহার প্রতি তাহার অগাধ প্রীতি, স্বামীর জন্য প্রাণ দিতেও সে কুণ্ঠিত নহে। স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে—স্বামীর ভোগবিলাসের পূর্ণ উপকরণ হইতেও সর্ব্বদাই সে প্রস্তুত—সতীত্বের পরাকাষ্ঠা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে তাহার সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা—সীতা সাবিত্রীর ন্যায় পতির চরণে সর্ব্বদাই ঢালিয়া দিতেছে; কিন্তু তবুও যেন প্রেমের পূর্ণতা লাভ হয় না, কোথায় যেন কি একটু "কিন্তু" রহিয়া যায়। স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে—তাহাকে প্রাণের প্রাণ করিয়া রাখে, কিন্তু তবুও তাহাতে সখার প্রেম উদ্ভূত হয় না। পতিব্রতা স্ত্রী অসঙ্কোচে স্বামী সেবা করিলেও যেন সখার অসঙ্কোচ হৃদ্যতা লাভ করিতে পারে না। কারণ স্বামীর প্রতি তাহার একটা দেবভাব হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। প্রভু দাসীর যেমন সম্বন্ধ তেমনই সম্বন্ধে স্বামীকে দেবতা বা বড়ত্বের আসন দিয়া আপনাকে খাটো করিয়া রাখেন—সমস্ব দিতে পারেন না বা সখার ন্যায় স্বামীকে সমান পর্য্যায়ে বসাইতে পারেন না। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার মহিষীগণ অপেক্ষা ব্রজগোপীদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে যে, নারদ আসিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রভো! দ্বারকালীলা ত দেখিলাম। মহিষীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া আপনার আন্তরিকতা ও প্রেমের পরিচয় পাইলাম। আপনি ত অত্যন্ত মুগ্ধের ন্যায় প্রেয়সীদিগের আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত। তজ্জন্য জানিতে ইচ্ছা হয় ইঁহারা গোপীদিগের অপেক্ষাও কি আপনার অনুরক্তা?

শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন নারদ! চল অন্যত্র যাই, তথায় গিয়া তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিব।

অনন্তর নারদ কৃষ্ণ সহিত স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণের জ্বর

হইল, তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। নারদ কৃষ্ণের এই আকস্মিক বিপদে উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! উপায় কি,—কিসে আপনার এই পীড়ার উপশম হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, নারদ! সত্বর দ্বারকায় গিয়া আমার মহিষী-গণের নিকট আমার এই বিপদের কথা জানাইয়া তাহাদের পদধূলি লইয়া আইস। তাহাদিগকে বলিও যে তাহাদের পদধূলি মাথায় দিলে তবে আমি বাঁচিব, নতুবা জীবনের আশা নাই।

নারদ প্রভুকে বিশেষ কাতর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া পীড়ার বৃত্তান্ত সমুদয় বলিয়া তাঁহাদের পদধূলি প্রার্থনা করি-লেন; এবং বলিলেন আপনাদের পদধূলি তাঁহার মস্তকে দিলে তবে তিনি প্রাণ পাইবেন, নতুবা তাঁহার জীবনের আশা নাই।

মহিষীগণ তাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, ঠাকুর! তাহাও কি হয়? আমাদের পরম পূজ্য দেবতার মাথায় দিবার জন্য আমাদের পদধূলি দিব? আমরা কোন প্রকারেই তেমন পাপানুষ্ঠান করিতে পারিব না। তাহার উপর আপনার ন্যায় ব্রহ্মর্ষির মাথায় সেই পদধূলির বোঝা চাপাইব?—আমাদের প্রাণ থাকিতে কখনও তাহা পারিব না। নারদ তাহা শুনিয়া নিরাশ হইয়া কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া নিবেদন করিলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন নারদ! অবিলম্বে তুমি ব্রজে গিয়া আমার প্রেয়সীগণে আমার বিপদের কথা বলিয়া তাহাদের পদধূলি লইয়া আইস।

নারদ তৎক্ষণাৎ ব্রজে ছুটিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ প্রেয়সীগণে কৃষ্ণের পীড়ার কথা বলিয়া তাঁহাদের পদধূলি প্রার্থনা করিলেন। নারদের মুখে কৃষ্ণের পীড়ার কথা শুনিয়া গোপীগণ হায় হায়! করিয়া উঠিলেন এবং সত্বর সকলকে ডাকিয়া কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া অবিচার বুদ্ধিতে পদধূলির বোঝা বাঁধিয়া ব্রহ্মর্ষি নারদের মাথায় চাপাইয়া দিয়া সত্বর তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ সকাশে যাইবার আদেশ করি-

লেন। নারদ গোপীদিগের পদধূলির বোঝা মাথায় লইয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন নারদ! আমার ব্যাধির শান্তি হইয়াছে। এখন বুঝিলে কাহারা আমায় মন প্রাণ দিয়া যথার্থ ভালবাসে? তুমি ব্রহ্মর্ষি—নারায়ণপরায়ণ মহাত্মা,—তোমার মস্তকেও তাহাদের পদধূলির বোঝা চাপাইতে তাহারা কিছু-মাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। সর্ব্বপ্রকারে আমার কল্যাণই তাহাদের একমাত্র কাম্য। আমি বড়, তাহারা ছোট, এ ভাব তাহাদের নাই, তাহারা প্রকৃতই সখী এবং আমার সহিত একপ্রাণ।"

এইজন্য বলিতেছিলাম, পতিব্রতা সতীর পতির প্রতি যে ঐকান্তিক ভালবাসা তাহাও এই আন্তরিকতার সহিত তুলনীয় নহে! তাহাতে সঙ্কোচ আছে, ইহাতে তাহার কিছুই নাই, একবারে প্রাণ-ঢালা অগাধ ভালবাসা---আন্তরিকতা! এইজন্য গোপীপ্রেম জগতে অতুলনীয়!

গোপী-প্রেমের কথা শুনিলে যে সব রুচিবাগীশ নাক সিটকান, তাঁহাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, গোপী-প্রেম কি তাহা তাঁহারা বুঝিতে চেষ্টাও করেন না। এত বড় আন্তরিকতা—এমন দেহমনপ্রাণ দিয়া ভালবাসার আদর্শ জগতে আর নাই। ভালবাসা বা আন্ত-রিকতা কাহাকে বলে, হৃদয়সর্ব্বস্বকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহার একমাত্র আদর্শ গোপীগণ!— ভালবাসা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া গোপীরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

যে প্রভুভক্ত, তাহার ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি দেখিয়া প্রভুও তাহাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না। দাস ভক্তির জোরে প্রভুকে যে আকর্ষণ করে, সে আকর্ষণের বেগ সামলান প্রভুর পক্ষে অসম্ভব। এজন্য প্রভুও দাসের ভক্তি-বলে আকৃষ্ট হইয়া দাসভক্ত হইয়া পড়েন। ইহাই জাগতিক নিয়ম। ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধও এইরূপ। ভক্ত বড়ই আন্তরিকতার সহিত তাই ভগবান্—প্রভু বা গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "তুমি ভজ কি আমি ভজি, বুঝতে নারি ব্যভারে।"

তজ্জন্য ভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। —যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইভাবে ভজনা করি।"

গোপীরা তাহাদের দয়িতকে যেমন আন্তরিকতার সহিত ভাল বাসিতেন, দয়িতও তাঁহাদিগকে তেমনই আন্তরিকতার সহিত ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভালবাসা কি জিনিষ জগদ্বাসীকে তাহার আদর্শ প্রদর্শন জন্যই গোকুলে গোপী-প্রেমের উদ্ভব।

ভালবাসা—সদিচ্ছাই জগতের সার। জগতে মানুষের কথা দূরে থাকুক, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গও ভালবাসার আস্বাদ জানে। ভাল-বাসাই জগতের কাম্য। যে মানুষ স্বার্থের জন্য পর-সর্ব্বনাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে, সেও তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভালবাসে। অবশ্য তাহাদের নিকট ভালবাসা সীমাবদ্ধ। তাহারা তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভালবাসে, আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসে, নিজ নিজ শ্রেণী বা জাতিকে ভালবাসে। ভালবাসা স্বর্গীয় পদার্থ— স্বর্গের মন্দাকিনী-প্রবাহ—নন্দন-কাননের পারিজাত,—মন্থিত সাগরের অমৃত! তাহা পানে মর অমর হয়! ব্যবহারের দোষে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া জাগতিক নর ইহাকে কলুষিত করিতেছে— কারণ, তাহারা ইহার ব্যবহারের প্রকৃষ্ট উপায় জ্ঞাত নহে। ভালবাসাতেই মানুষের জীবন সার্থক হয়! ভালবাসা বা প্রেমই জগতের একমাত্র ধর্ম্ম!

ভালাবাসা যদি পবিত্র হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, তবে তাহা প্রসার লাভ করে। আমি আমার পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ও আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসি। ভালবাসার মোহে তাঁহদের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করি। তাহাদিগকে উত্তম খাদ্য, উত্তম পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি দানে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করি, তাহা-দের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মপ্রসাদের জন্য। ইহাই জাগতিক চিরা-

চরিত প্রথা। এজন্য কেহ কাহাকেও বাহবা দেয় না, বা কাহারও প্রশংসা করে না। ইহা যদি ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া দীন-দুঃখী সেবায় নিয়োজিত হয়, ব্যাধিগ্রস্ত ও আর্ত্তের দুঃখ হরণে প্রযুক্ত হয়, তবেই তাহার সার্থকতা সম্পাদনের পথ উন্মুক্ত হয়। তখনই আমরা সেই হৃদয়বান্ ব্যক্তিকে দয়ার সাগর বা মহাত্মা নামে অভিহিত করি। আমরা যদি ভালবাসার প্রকৃত কারণ না জানিয়া—বা সম্যক পর্য্যা-লোচনা না করিয়াও উক্তরূপ দয়ার কার্য্য করি তাহা হইলে আমরাও লোকের ধন্যবাদ ভাজন হই। আর লোকেই বা এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন? কারণ, ভালবাসার প্রসারতায় তাহাদের সম্মতি বা আনন্দ জ্ঞাপনই বিরাট নীতির সারবত্তার প্রতিপাদক, তাহা না বলিলেও চলে। এইরূপে ভালবাসার সীমা যতই স্বজন ও স্বদেশ ছাড়াইয়া পৃথিবী বা জগন্ময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ততই জগতে সমধিক সমাদৃত হইয়া বিশ্ব-প্রেম নামে অভিহিত হয়। এই প্রেম শুধু মানব জাতির উপর প্রযুক্ত হয়, তাহা নহে। আমাদের শাস্ত্র বলি-তেছেন 'সমত্বমারাধনামচ্যুতস্য'—জগতের সর্ব্ব জীবের উপর সমভাবই-অচ্যুত বা ভগবানের আরাধনা। কেন? যেহেতু ভগবান্ সর্ব্ব জীবেই বর্ত্তমান, এই সমত্ব শিক্ষা,—সাধনার বস্তু। সাধনা না করিলে এই সমত্ব বা সর্ব্বজীবে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। আমাদের দেশে সাধারণ প্রবচন আছে "বামুন কুকুর না কর আন, সকল জীব এক সমান।" গীতা বলিতেছেন "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আত্মারূপে অবস্থান করিতেছেন। সাধনা দ্বারা যখনই এই জ্ঞান জন্মে বা ভগবদ্দর্শন হয় তখনই "অহিংসা" পরম-ধর্ম্মরূপে আত্মায় মুদ্রিত হয়। সুতরাং হিংসা অন্তর্হিত হইলেই সমত্ব হৃদয় অধিকার করে। তখন জীব শিব হয়। তখন তিনি বুঝেন কে আমার পর?—জগন্ময় যে আমি! আমার হৃদয়ে, আমার শরীরে যে শক্তি—যে সত্ত্বা, অতি ক্ষুদ্র কীটাণু-

কীটেও যে তাগাই! আমি কাহাকে মারিতে যাই? আমি কাহাকে হিংসা করি? জগৎময় যে আমি!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাধনা দ্বারা যখন বিশ্বময় এক আত্মা বা আমিত্ব উপলব্ধি করিলেন, তখন ফুল তুলিতে বা ঘাস ছিঁড়িতে পারিতেন না। একদিন দুইটী নৌকার দাঁড়ি-মাঝিতে মারামারি হইল। তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর গঙ্গাতীরে বসিয়াছিলেন। একজন আর একজনের পৃষ্ঠে যেমন সজোরে চপেটাঘাত করিল, অমনই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া হৃদয় প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন পিঠে চাপড় মারিল! তাঁহারা বলিলেন কে মারিল? তিনি বলিলেন, ঐ নৌকার মাঝি আর এক জনের পিঠে চাপড় মারিয়াছে। তাঁহারা বলিলেন উহারা মারামারি করিয়াছে ত তুমি চীৎকার করিলে কেন? তিনি বলিলেন, আমার পিঠে আঘাত লাগিয়াছে! তাঁহারা দেখিলেন তাঁহার পৃষ্ঠে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ স্পষ্ট ফুলিয়া উঠিয়াছে! তাহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

ইহাই যথার্থ সাধনা। সাধনাতেই এইরূপ একাত্মবোধ বা জগন্ময় আমিত্ব জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান হইলে আর কি হিংসা চলে?—হিংসা করিবে কাহাকে? এই যে জ্ঞান—এই যে অনুভূতি— ইহার ভিতর আনন্দ কত! বিশ্বময় যদি সেই পরমব্রহ্ম-রস স্বরূপকে দেখি—জ্ঞান-চক্ষু যদি খুলিয়া যায়, তবে তখন বিস্ময়ের অবধি থাকে না;—আনন্দে হৃদয় সাগরের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং সচ্চিদানন্দ-রস-সাগরের পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গে কোনদিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা থাকে না। তখন জীব স্তব্ধ হইয়া অতি নিভৃত গুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক অহর্নিশ সচ্চিদানন্দ-সাগরের অমৃত-প্রবাহে মগ্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বৎসর নিমেষের ন্যায় অতিবাহিত করেন।

জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই। তবে জীব এমন হিংসা-বিদ্বেষে কলুষিত হইয়া নরাধম,—পশ্বাধম হইয়া উঠে কেন? —মলিনতার জন্য! স্বচ্ছ-দর্পণে যদি ক্রমাগতই কর্দ্দম নিক্ষেপ করা যায়, তবে তাহার দর্পণত্বই বা থাকে কেমন করিয়া? মলিন দর্পণকে যে যত পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করে, তাহা ততই স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হয়। যে দর্পণ যত পরিচ্ছন্ন ও নির্ম্মল তাহাতে ততই স্বরূপ পরিস্ফুটরূপে প্রতিবিম্বিত হয়।

জীব আপনাকে চিনে না, জানে না তবুও সে আর এক জনকে ভালবাসিতে চায় স্বরূপের স্বভাবে।—ভাল না বাসিলে সে বাঁচে না। যাহার কেহ নাই, সে কুকুর, বিড়াল বা পাখী পুষিয়াও তাহাকে ভালবাসে কেন?—কারণ ভালবাসাই যে তাহার স্বভাব।

সমধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থ পরস্পরকে আকর্ষণ করে, ইহাই প্রকৃতির ধর্ম্ম। এইজন্য পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবী হইতে দূরে যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত ফল পাকিলে পৃথিবীতে পড়ে। অতি বেগশালী গোলাগুলি শূন্যে নিক্ষেপ করিলে, তাহাও পৃথিবীতেই পড়িবে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সীমা অতিক্রম করিবার শক্তি এ পর্য্যন্ত নর-জীব লাভ করিতে পারে নাই।

আবার, মাধ্যাকর্ষণ বলে গ্রহোপগ্রহ, তারকা, চন্দ্র-সূর্য্য পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া শূন্যে অবস্থিত থাকিয়া নিরন্তর ভ্রাম্যমান্ রহিয়াছে। এই মহাকর্ষণের মূলেও ঐ সমধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থ সকলের পরস্পর আকর্ষণ। তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় তাহাদের প্রত্যেকের এক একটী শক্তি একটী আত্মার যোগসূত্রে সম্বদ্ধ।

জগতে কাহারই অন্য কেহ হইতে বিশ্লিষ্ট হইবার উপায় নাই। এক শক্তির বলে সকলেই পরিচালিত হইতেছে, সুতরাং সকলেই সমগুণবিশিষ্ট। আবার, সমধর্ম্মই পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কেননা প্রত্যেকের অন্তরে এক আত্মাই অনুস্যূত

আছেন। এই জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—মালিন্যদোষেই আমাদের এই স্বভাবজ ধর্ম্মের ব্যত্যয় ঘটে। আবার, আমরা যে যেমন করিয়াই ভালবাসিনা—যে ভাবেই আমরা এই ধর্ম্মের ব্যত্যয় ঘটাই না, একজন না একজনকে ভালবাসিয়া—অন্ততঃ একটা কিছুর উপর আমাদের ভালবাসা রাখিয়া যত অন্ধভাবেই চলিনা,—আমরা মূলতঃ ভালবাসি সেই মহামহীয়ান্, গরীয়ান্, অণোরণীয়ান্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই এক আত্মা— সর্ব্বতঃ পরমেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর অবাঙ্মনসোগোচর জ্যোতির্ম্ময় বিরাট ব্রহ্মকে।

ইহাই জীবের, জাগতিক পদার্থের,—অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

মানুষ জাগতিক জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা, দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালবাসা ও প্রীতি-প্রেম আছে,— তাহার পাপ-পুণ্য-বোধ, বিচার-বিবেক, কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মজ্ঞান আছে। বাঁচিতে হইলে কেমন করিয়া বাঁচিতে হইবে, সংসার করিতে হইলে কেমন অভিভূত সংসার করিতে হইবে, আহার-বিহারের রীতি-নীতি কি প্রকার হইলে তাহার জন্ম-কর্ম্ম সফল হইবে, সর্ব্বদা সে তাহাই অনুসন্ধান করিতেছে। এজন্য আদর্শ বাছিয়া—বিচার করিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ হইতেছে। পশুর মত পাশবিক বৃত্তির অনুসরণ তাহার বাঞ্ছনীয় নহে। তাহারা যখন মানুষ, তখন মানুষের মত— মানুষের উপযুক্ত দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালবাসা, প্রীতি-প্রেমের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া আনন্দের হাট বসাইতেই তাহারা চায়। মানুষমাত্রেরই উদ্দেশ্য আনন্দে কাল কাটায়। আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে আচারে-বিচারে, কর্ত্তব্যে-করণে সকলেই সুখ চায়। কিন্তু সুখের প্রয়োগ সকলে জানে না,—সুখাতিশয্যের চিন্তায় সুখের ব্যভিচারই করিয়া বসে। এইজন্যই জগতে যত অনর্থ। মানুষের জীবন-যাত্রার

মাত্রা নির্দ্ধারণ এবং অনর্থ নিবারণ জন্যই ভগবান্ কৃপা করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কারণ—মানুষ তাঁহার অতীব প্রিয়! মানুষকে ব্যভিচারী এবং দয়া-ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যে উদাসীন দেখিলে, তিনি মানুষ হইয়া আসিয়া মানুষের কর্ত্তব্য শিক্ষা দেন— দয়াধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করেন। মানুষের পাশবিক ব্যবহার তাহার সহ্য হয় না। দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া মানুষকে অন্যের উপর পাশবিক ব্যবহার করিতে দেখিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হয়েন এবং তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া সংসারের নীতি-ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করেন। এই জন্যই অসুর-বধ ও গোকুল-প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তন।

গোকুলের গোপীদিগের প্রেম তাহারই আদর্শ। কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, সেই ভালবাসায় ইহ-পরলোকের ইষ্টলাভ কেমন করিয়া হয়, তাহারই পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে,—স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভালবাস, আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাস, দেশ-দশকে ভালবাস,—ভালবাসার রীতি-নীতি, আদর্শ ও ধর্ম্ম রক্ষা কর। সেই ভালবাসায় আন্তরিকতা থাকিবার সীমা নির্দ্ধারণ জন্যই ভগবানের অবতার। কারণ মানুষ তাঁহার ন্যায় তেমন করিয়া আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারে না। সেই আদর্শ এত বড় উচ্চ যে, মানুষ তাহার নিকট পোঁছিতে পারে না। তাহা না পারিলেও সেই উচ্চ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া চলিলে সে যত দূরে পোঁছিতে পারে তাহাতেই তাহার জীবন সার্থক হইয়া যায়।

পতি-পত্নীই সংসারের মূল। এই দুই জনের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা—প্রীতি-প্রেমই ইহ-পরলোকের আনন্দের ভিত্তি। ইহাদের পরস্পরের যদি প্রীতি-প্রেম না থাকে, তবে সংসারের মূলই শিথিল হইয়া যায়! —তাহা হইলে আর সংসারই হয় না। ইহাদের প্রীতি-প্রেমেই সংসারের পরিবর্দ্ধন। পুত্র-কন্যাই সংসারের শোভা!

হিন্দুর ধর্ম্ম পশু-ধর্ম্ম নহে। হিন্দু স্ত্রীকে ইন্দ্রিয় চরিতার্থের যন্ত্র বলিয়া মনে করে না—সে ধর্ম্ম-পত্নী। ধর্ম্মলাভের জন্যই সে পত্নী

গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহার আশা—পুত্র-পিণ্ড প্রয়োজনম্। পত্নীতে পুত্রোৎপাদন ধর্ম্মলাভের জন্য। সর্ব্বধর্ম্মকর্ম্মের সহায়ক পত্নী— ইহ-পরকালের সঙ্গিনী—অর্দ্ধাঙ্গিনী—গৃহকর্ত্রী। আমাদের শাস্ত্রকারগণও বলিয়াছেন " গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" হিন্দুর গৃহ বলিলেই গৃহিণীকেই বুঝায়। তিনিই গৃহের আধার—গৃহ-সর্ব্বস্ব।

যিনি ধর্ম্ম-পত্নী, যাঁহাকে বিবাহের সময় বলিতে হয়, " তোমার হৃদয় আমার হৃদয় এক হউক—"যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব।" এমন যে ধর্ম্ম-পত্নী তাহাকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহাকে কেমন চক্ষে দেখিতে হয়, কেমন করিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করিতে হয়, তাহার সহযোগিতায় কেমন করিয়া ধর্ম্মার্জ্জন করিতে হয়,—তাহার শিক্ষা হিন্দু-শাস্ত্র-পুরাণে যেমন আছে, জগতের অন্যত্র তেমন কুত্রাপি নাই। হিন্দু শিক্ষা দিয়াছে,—" নার্য্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা " যেখানে নারীদিগের সম্মান ও পূজা হয়, তথায় দেবতা-গণ পরিতুষ্ট থাকেন। কিসে নারীদিগের সম্মান, পূজা হয়, তাহার বিচার-বুদ্ধি প্রণোদনাই শাস্ত্র। হিন্দুনারী স্বভাবতঃই ধর্ম্মপরায়ণা। তাহাদিগের সহযোগিতায় ধর্ম্মলাভের উপায় অন্বেষণই হিন্দু মনীষীর অনুসন্ধিৎসা। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন— " আহার-নিদ্রা-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্ণরানাম্। " আহার-নিদ্রা-মৈথুন — পাশবিক ধর্ম্ম। নরেও এ ধর্ম্মের ব্যতিক্রম নাই। যে সব নরে এই তিনটীমাত্র কার্য্য বর্ত্তমান, তাহারা পশুধর্ম্মাক্রান্ত বা নরপশু। এই পাশবিক ধর্ম্মকে অতিক্রম করাই মনুষ্যত্ব। নতুবা মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ কি ? পশুর বুদ্ধি-বিবেচনা বা বিচার-বুদ্ধি নাই—তাহার বিবেক নাই। সে আহার, নিদ্রা ও মৈথুনেই জীবন অতিবাহিত করে। জন্ম-কর্ম্ম-ধর্ম্ম ও ভগবান্ সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান নাই। বিবেকবিহীন বলিয়া কর্ম্মের ফলাফল তাহাকে ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু মানুষকে সদসৎকর্ম্মবিচারশীল ও বিবেকী বলিয়াই কর্ম্মের ফলাফল

ভোগ করিতে হয়। ভালমন্দ বিচারশক্তি যেখানে, সেইখানেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ম্মফলভোগ। পশুর সহিত মানবের পার্থক্য এইখানে। মানুষ বুদ্ধিবলে ও বিচারশক্তি দ্বারা পাশবিক আনন্দকে অতিক্রম করিয়া " ভূমানন্দের " সন্ধান পাইয়াছে। সে আনন্দ পাশবিকধর্ম্ম চরিতার্থের আনন্দ অপেক্ষা কত পবিত্র, কত মহান্ ও কত দেহ-মন-আত্মা পরিশুদ্ধি ও পবিত্রকারী, তাহা সেই আনন্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই বুঝেন; তজ্জন্য তাঁহারা জাগতিক পশুগুণাতিক্রম করিয়া অমর হয়েন।

হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও সংসার এই ভূমানন্দলাভেরই পথ প্রদর্শক। সে জানে, পশুধর্ম্মে সে আনন্দ নাই। তাই সর্ব্বপ্রকারে পাশবিক-ভাব বর্জ্জন করত কায়মনোবাক্যে আত্মশুদ্ধি করিয়া ভূমানন্দলাভের জন্য অনন্তের ধ্যানে নিমগ্ন হয়। সে জানে, জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্ম-মৃত্যুই জাগতিক জীবের অপরিহার্য্য ব্যাধি। পাশবিকভাবে ঐ ব্যাধি পরিহারের উপায় নাই। তাই সনাতন হিন্দু আহারে-বিহারে, বিচারে-ব্যবহারে, শয়নে-স্বপনে, আলাপে-বিলাপে, কথায় চিন্তায়, কল্পনা ও কার্য্যে ভূমানন্দ লাভের আশায় ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়া আপনাকে নিষ্কিঞ্চন, সর্ব্বপাপবিরহিত, শুদ্ধ স্বত্ত্ব ও ব্রহ্মচারী করিয়া জন্ম কর্ম্ম সফল করিবার জন্য সচেষ্ট হন। সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এইখানে। সে পার্থিব সুখ-সম্পত্তি চায় না, পাশবিক ধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়-সুখকে নরক বলিয়াই সর্ব্বথা অবধারণ করে। সে চায় কেমন করিয়া এই নরক যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, কেমন করিয়া জন্ম মরণের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, কেমন করিয়া ভূমানন্দের নায়ক ভূতভাবন পতিতপাবন ভগবানের করুণালাভ করিয়া ধন্য হওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যেই হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণ, বেদ-বেদান্ত, আচার ব্যবহার, রচিত ও নিয়মিত। হিন্দু পাশবিক বা ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম অতিক্রম বা নিয়মিত করিবার জন্য আজীবন

উচ্চলক্ষ্য লইয়া গন্তব্যপথে প্রধাবিত হয়।

আধুনিক শিক্ষায় ইহা বহুল পরিমাণে বিকৃত বা ব্যাহত হইলেও এখনও ইহার প্রভাব অক্ষুণ্ণই আছে। কারণ, আধুনিক-শিক্ষিত ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল বিপথে ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত, ব্যাধিগ্রস্ত ও অনুতপ্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বপুরুষগণের সনাতন পথে ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। পশ্চাত্য-শিক্ষিত এমন বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে অনুতপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। হিন্দুর মস্তিষ্কে যে সনাতন ধর্ম্মের বীজ নিহিত আছে, তাহা কোন প্রকারে অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ হারাইলেও তাহাতে অন্য কোনরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন বা তাহা রূপান্তরিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন, কার্ণিসে বীজ থাকিলেও সময়ে কার্ণিস ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাহা অঙ্কুরিত হইবেই।

ভাই! একবারও কি চিন্তা হয় না যে, তোমার মৃত্যু একদিন না একদিন হইবেই হইবে? জন্ম গ্রহণের পর শৈশব হইতে কৌমার ও যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছ; এবং যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্ব বা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছ; ক্রমে ক্রমে শরীরের তেজোবীর্য্য হ্রাস হইতেছে, যৌবনে যাহা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহার ক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে। কেশের পক্কতা, দন্তের পতন, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা তোমায় স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, তোমার আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী। তোমার প্রিয়তম প্রিয়তমা স্ত্রীপুত্রকন্যা আত্মীয়স্বজনও তোমার বার্দ্ধক্যদশা দেখিয়া দিন গণনা আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বিষয়-সম্পত্তি ধনরত্ন বুঝিয়া লইয়া তাহা হস্তগত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। কে কি প্রকারে লইবে, সেই চিন্তাতেই তাহারা নিমগ্ন! তুমি ত ধর্ম্মে বা অধর্ম্মে—যেন তেন প্রকারে অতুল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া গেলে—পুত্রদিকে অতুল সম্পত্তির অধিকারী করিলে! কিন্তু তোমার কি হইল?

যমরাজ যে তোমায় ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছেন, তাঁহার হস্ত যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া তোমার কেশাকর্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছে তাহা কি দেখিতেছ না? যাহাদিগের জন্য অতুল ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়াছ—যাহাদিগকে অতুল ধনের অধিকারী করিয়া গেলে তাহারা ত তাহা বেশ দেখিতেছে! কিন্তু তাহারা তোমার এই ভীষণ বিপদ দেখিয়া যমের হস্ত হইতে তোমায় রক্ষা করিবার কি কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছে? তুমি ত মায়ায় অন্ধ হইয়াছ; যমের হস্ত যে তোমার কেশাকর্ষণ জন্য অগ্রসর হইতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছ না! তোমার চৈতন্য কবে হইবে তাহারও স্থিরতা নাই। যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছ তাহা কি তোমায় রক্ষা করিবে?—অতিপ্রিয়-তম ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন হইতে কে যে বলপূর্ব্বক তোমায় বিচ্ছিন্ন করিয়া কোথায় লইয়া যাইবে তাহার সন্ধান জান কি? কোন অজ্ঞাত-প্রদেশে কোথায় কেমন করিয়া রাখিবে, কৃত-অপকর্ম্মের ফলদান জন্য যমরাজের কত কঠোর শাসন শাস্ত্রে যে উক্ত আছে তাহা জীবিত অবস্থায় মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ঋষিবাক্য কখনই মিথ্যা নহে, সবই সত্য। সেই অবস্থায় কে তোমার সহায়ক হইবে? সর্ব্বশাস্ত্রেই বলে, কর্ম্মই ফলদাতা;— ভাল-মন্দ কর্ম্মের ফল কর্ত্তাকেই ভোগ করিতে হয়। তাহা, যদি হয়, তবে চোর রত্নাকরের ন্যায় কেন অপকর্ম্ম কর? স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কেহ তোমার পাপের অংশ লইবে না, তাহার ফল তোমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব কাহার জন্য মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, জাল-জুয়াচুরি, চুরি-ডাকাতি? অর্থ সামর্থ্য বিষয়-সম্পত্তি কি শেষের দিনে তোমায় রক্ষা করিতে পারিবে? তাহারা কেহই সঙ্গে যাইবে না, পৃথিবীর ধন পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকিবে। মধ্য হইতে তুমি নিমিত্তের ভাগী হও কেন? অসদুপায়ে অর্জ্জিত ধন-রত্ন, বিষয়-সম্পত্তি কত দিনই বা তোমার উপভোগে লাগিবে? কোন দিন তোমার দেহান্ত হইবে তাহা কি তুমি

জান ? প্রাণ-পাখী কখন পলাইবে তাহার স্থিরতা যখন নাই তখন শেষের দিনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছ কি ? হায়! কি মোহমুগ্ধ জীব আমরা! দৈহিক-সুখের আশায় কত অনর্থ, কত অনাচার, কত মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু প্রকৃত সুখ কোথায়, তাহার কোন সন্ধানই লই না। যাহারা হা অর্থ হা অর্থ করিয়া চিরজীবন দুরাকাঙ্ক্ষা পূরণ জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনায় দেহ ঢালিয়া দেয়, তাহারা কি জীবনে কখনও সুখ পায় ? তাহাদের মনে প্রাণে কি কখনও শান্তি দেখা দেয় ? অর্থলাভের দুরাকাঙ্ক্ষায় যাহারা চিরজীবন জ্বলিয়া মরে, তাহারা কি সুখে জীবন ধারণ করে ? ইহ-কালে এই দুশ্চিন্তাময় অনন্ত দুঃখ !—আর পরকালে ?—তাহার ত কথাই নাই। তবুও মানুষ মোহের বশে সুখপিপাসা-মৃগতৃষ্ণিকার উৎকট প্রলোভনে, দুঃখ-মরুভূমির সুতপ্ত অপার বালুকারাশির মধ্যে পড়িয়া অহরহঃ প্রাণ হারাইতেছে! একবারও ভাবে নাই—শান্তি কোথায় এবং কিসে ? সুতপ্ত বালুকারাশির নিম্নেই যে সুশীতল বারি-রাশির অনন্ত-প্রবাহ, তাহা সে অনুসন্ধান করে না,—তাই মায়াবিনী মরীচিকার প্রলোভনে প্রাণ হারায়! যদি স্থির ভাবে বিচার কর, তবে দেখিবে অর্থে সুখ নাই,—বিষয় সম্পত্তিতে সুখ নাই,—ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থে সুখ নাই,—একমাত্র সুখ মনস্থৈর্য্যে! কিসে মনের স্থিরতা সম্পাদিত হয় ?—তাহা একমাত্র ভগবচ্চিন্তায়। ভগবানের নাম স্মরণ, তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গ ও সেবা, সৎগ্রন্থ পাঠ ও সদালাপই শান্তির একমাত্র উপায়। ভগবানের নাম কীর্ত্তন, তাহার স্মরণ-মনন, ধ্যান-ধারণা ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে চিত্তের স্থিরতা সম্পাদিত হয়। চিত্তের স্থিরতা সম্পাদিত হইলেই—অপার আনন্দ! এরাজ্যে কত সুখ তাহা মুনি-ঋষি, যোগী-সন্ন্যাসী, সাধু-সজ্জনগণই বিশেষরূপ অবগত আছেন। কত বিত্তসম্পত্তিশালী, কত রাজা মহারাজা এ সুখের সন্ধান পাইয়া বিত্তসম্পত্তি, স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন-পর্ব্বতকান্তারে

গমন করিয়া কৃচ্ছ সাধনে নিরত হয়েন এই জন্য। এ সুখের আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে তাহার নিকট ইন্দ্রিয় বা বিষয়-সুখ তুচ্ছাদপি-তুচ্ছ!

একবার যদি তুমি এ পথে অগ্রসর হও, দেখিবে কত অদৃশ্য-শক্তি কত প্রকারে তোমায় কত বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, কত প্রকারে কত আনন্দ দান করিয়া তোমায় ধীরে ধীরে আনন্দমার্গে অগ্রসর করাইয়া দিবেন। তোমার একটু নেশা জন্মিলেই দেখিবে কত অচিন্ত্যরূপ, কত অভাবনীয় মূর্ত্তি তোমায় দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন। এক একবার দর্শনে তোমার দেহ-মন পবিত্র ও কৃতার্থ ইহয়া যাইবে। সেই দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তোমার হৃদয় ভরিয়া যাইবে তাহার তুলনা পাইবে না। তোমার মন হইতে সর্ব্ব পাপ দূরীভূত হইবে এবং ক্রমশঃ তাহা অপার আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। হিংসা, দ্বেষ, প্রলোভন তোমার দেহরাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিবে; তুমি ক্রমশঃ ভগবান্ বা ইষ্টদেবের সম্মুখীন হইয়া কৃতকৃতার্থ হইবে। তোমারই অভিলষিতরূপে তোমার হৃদয়-মন মোহিত করিয়া অপূর্ব্ব শক্তি দান করত তোমার চক্ষের সমক্ষে আর্বিভূত হইয়া সর্ব্ব সংশয় ছেদন করিবেন,—তোমার লৌহের দেহ সোণা হইয়া যাইবে। তাঁহার দর্শনে তোমার সর্ব্ব কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন, তোমার সর্ব্ব কামনা—বাসনা দূরীভূত হইবে—তুমি ধন্য হইবে!

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

স্বর্ণকারগণ মাটীর মুছি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গলিত সোণা ঢালে। একবার স্বর্ণ ঢালিয়া বাঞ্ছিত মূর্ত্তি গড়া হইয়া গেলে তাহারা মুছি ফেলিয়া দেয়। তদ্রূপ তোমার এই দেহরূপ মুছিতে একবার তোমার বাঞ্ছিত সোণার মূর্ত্তিটী গড়িয়া লও। এই জন্যই তোমার এই দেহ। তাহার পর আর এই দেহ দ্বারা কোন কর্ম্ম হইবে না,

ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবনের জন্য তুমি কৃতার্থ হইবে।

কারণ, মনই সর্ব্ব সংকল্পের বীজ। মনেই সংকল্প-বীজ উপ্ত হইয়া মায়া মোহের প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপাদন করে। তখন এই সংকল্পবিকল্পাত্মক মনের নাশ হইয়া যাইবে। এই মনের নাশ হইলেই অপূর্ব্ব শান্তি! বিষয়াত্মক মন না থাকিলে পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমায় আর বৃথা উত্তেজিত করিয়া দুঃখ দান করিতে পারিবে না। তখন তুমি সুখদুঃখের অতীত হইয়া যাইবে। ইহা পণ্ডিতের বোধগম্য নহে। পাণ্ডিত্যে ইহার দিঙ্‌নির্ণয় চলে না। অন্তঃস্থ যোগীই এই অচিন্তনীয় অবস্থা লাভ করিয়া ধন্য হয়েন।

পরম ভাগবত রঘুনাথ দাস অতুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। অসূর্য্যম্পশ্যা অতুল রূপবতী যুবতী স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের পদাশ্রয় লাভ করত ধন্য হইয়াছিলেন। রূপযৌবন, বিষয়-সম্পত্তি তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। শ্রীরূপ সনাতন অতুল সম্পদের অধিকারী ও বাঙ্গলা দেশের সম্রাট তুল্যই ছিলেন। যাঁহাদের হীরকাঙ্গুরীয়ের মূল্যই ছিল আশি হাজার টাকা. তাঁহারাও সেই সমুদয়কে তৃণাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অদম্য আগ্রহে সংসারের অত্যুচ্চ সম্মান, শক্তি ও অধিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌপীনধারী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পদতলে আসিয়া লুণ্ঠিত হইলেন কেন? কারণ, রাজ্য সম্পত্তি, অধিকার, প্রভুত্ব, অহঙ্কারেরই নেশা—শান্তির আস্পদ নহে। তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় অহরহঃ জর্জ্জরিত হইতে হয়। এবং মন সর্ব্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকিলে তাহাতে কেমন করিয়া ভগবচ্চিন্তা হইতে পারে? ভগবচ্চিন্তাই যখন সর্ব্বশান্তির আকর এবং পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, তখন ভগবচ্চিন্তা করিতে হইলে মন হইতে অন্য সমুদয় চিন্তা দূরীভূত করা প্রয়োজন। এইজন্য ভাগ্যবান্ পুরুষ মন হইতে বৈষয়িক সমুদয় চিন্তা দূরীভূত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবান্ বা ইষ্ট চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। আর

ভগবচ্চিন্তা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রকারে আপনাকে নিঃস্ব করিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে জীবমাত্রেই নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। সাধারণতঃ যে ধনরত্ন, বিষয়-সম্পত্তি, বল-বুদ্ধি, অহঙ্কার, আত্মীয়-স্বজন আমায় পরকালের সম্বল দিতে পারে না, তাহাদের জন্য আমি প্রতিনিয়ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া মরি কেন? কারণ, ইহারা আমায় শান্তি না দিয়া বরং আমার রক্ত শোষণই করিয়া থাকে। সুতরাং জীব যে সর্ব্ব প্রকারে নিঃস্ব তাহাতে আর সন্দেহ নাই, অতএব এই নিঃস্ব-সহায় জীবের উপায় কি?—উপায়,—একমাত্র ভগবান্। যিনি আপনাকে সর্ব্ব প্রকারে নিঃস্ব ও নিঃসহায় করিয়া তাঁহার শরণ লইতে পারেন, তিনিই কৃতকৃতার্থ হয়েন,—তাঁহারই জন্ম কর্ম্ম সফল হয়—তখনই তিনি প্রকৃত বিষয়-সম্পত্তি, ধনরত্ন ও স্বজনলাভ করিয়া ধন্য হয়েন। কারণ, তাঁহাকে লাভ করিলে জীবের আর কোন কিছুরই অভাব থাকে না।

প্রশ্ন হইতে পারে বিত্ত-সম্পত্তিতে কি ভগবান্ লাভ হয় না? উত্তর—ধর্ম্মলাভ হইতে পারে, ভগবল্লাভ হয় না। কারণ ভগবল্লাভ করিতে হইলে নিঃস্ব ও নিঃসহায় হইতে হইবে। যেহেতু অভাব না হইলে আকাঙ্ক্ষা জাগে না। **অভাবের মাত্রা যত বেশী হইবে আকাঙ্ক্ষাও তত তীব্র হইবে।** এই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাই ভগবল্লাভের একমাত্র উপায়।—আমার কেহ নাই, একমাত্র তুমিই আমার সব, তোমাকে পাইলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব, আমার সর্ব্ব আশা—সর্ব্ব অভাব সম্পূরিত হইবে। তুমিই আমার দেহ, মন, প্রাণ, তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! তোমায় না দেখিলে আমি বাঁচি না, তোমার অদর্শনে—তোমার বিরহে আমি আত্মহারা হই! তোমার সেবায়, তোমার কথা প্রসঙ্গে আমার আনন্দ উথলিয়া উঠে!—ঠিক ঠিক এই ভাব হইলেই জীব ধন্য হয়! তখনই তিনি আত্মারামরূপে দর্শন দিয়া জীবকে কৃতকৃতার্থ করেন।

গোপীদিগের এই ভাব—তুমি ভিন্ন আমাদের আর কেহ নাই। তাই ঐকান্তিক চিত্তে গোপীবল্লভের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারা ধন্যা হইয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন আপনার কে, জীব তাহা জানে না বলিয়াই পার্থিব সম্বন্ধ ধরিয়া ঘর সংসার পাতিয়া লৌকিক ভাব লইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের বিষয়ীভূত হইয়া সচ্চিদানন্দ ভুলিয়া যায়!—লৌকিক আচারে আপনা বিস্মৃত হয়! জীবন সার্থকের মন্ত্র কি তাহার জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। কেমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিলে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় বা সংসারকে অমৃত সিন্ধুতে পরিণত করা যায়, জন্ম, কর্ম্ম ও জীবন সফল হয়, প্রাকৃত জীবকে তাহার সন্ধান দিয়া সহজ ভাবে সাধারণ বুদ্ধিতে প্রেমময়ে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া আপনা বিকাইয়া যোগীজনদুর্লভ মনচোরকে বাঁধিতে হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্যই বৃন্দাবনে গোপীপ্রেমের লীলা। এ প্রেম প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের পথ প্রদর্শক।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ—

—"ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধানা নহি বীজায় নেশতে।"

যেমন সিদ্ধ বা ভাজা ধানে আর অঙ্কুর হয় না, তদ্রূপ আমাতে যে প্রেম অর্পণ করে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেও অমৃত ভক্ষণ করিলে বস্তুশক্তির গুণে জীব অমর হইবেই হইবে।

শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ বলিয়া না জানিয়াও তাঁহাতে চিত্ত সমর্পিত হইলে বস্তুশক্তির গুণে অমৃতের ক্রিয়া হইবেই হইবে। অমৃতকে বিষ বোধে পান করিলে অমৃতের ক্রিয়া এবং বিষকে অমৃত বোধে পান করিলে বিষক্রিয়াই হয়।

ভগবান্‌কে কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয়, কেমন করিয়া দেহ মন প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয়, তাঁহার কথাপ্রসঙ্গে কি

রতির প্রয়োজন, সেই শিক্ষা দান জন্যই বৃন্দাবনলীলা।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

পরব্যসনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মষু।
তদেবাস্বাদয়াত্যন্তুর্ণবসঙ্গ-রসায়নম্ ॥

কুলটা রমণীগণ সর্ব্বদাই গৃহকার্য্যে বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া থাকে এইজন্য যে, তাহাদের অন্তরের ভাব বাহিরে প্রকাশ না পায়; অর্থাৎ কেহ বুঝিতে না পারে যে, তাহারা ব্যভিচারিনী। এই ভাব গোপন জন্য গৃহ-কার্য্যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেও অন্তরে সর্ব্বদাই উপপতির নবসঙ্গরূপ রসায়নই আস্বাদন করিয়া থাকে। গৃহের নানাকার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ও বাপৃত থাকিলেও তাহার অন্তরের সে ভাবের ব্যত্যয় ঘটে না। কেন?— নবসঙ্গরূপ রসায়ন আস্বাদনের নানা বাধা আছে বলিয়া।

যেমন স্রোতস্বিনীর মধ্যস্থলে বাঁধ দিয়া স্রোত আটকাইবার চেষ্টা করিলে তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ নানা বাধা পাইয়া অত্যন্ত আগ্রহশীলের আগ্রহ বা উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিতই হয়। এইজন্য পরব্যসনী নারীর নবসঙ্গরূপ রসায়ন আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা নানা বাধায় প্রতিহত হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়,— প্রশমিত হয় না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এইজন্য ভগবৎ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয় মধ্যে গুপ্ত রাখিয়া সাধনার পথে এইরূপে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন। গৃহের সর্ব্ব কর্ম্মই কর, কিন্তু মন রাখ সেই ভগবৎ-পাদ-পদ্মে। গৃহের নানা কার্য্যে তোমার সাধনা ব্যাহত হইলে তোমার আগ্রহাতিশয্য ক্ষুণ্ণ না হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইবে। কারণ, তাহাতে একটা মজা এই যে, নবসঙ্গ-রসায়নের আনন্দাকাঙ্ক্ষার পরিকল্পনাই গৃহকর্ম্ম সম্পাদনে অসুরের বল দান করে! গৃহ-কর্ম্ম সম্পাদনের আনন্দোদ্যমে নবসঙ্গ-রসায়নের প্রণোদনা অনুস্যূত থাকিয়া

ইষ্ট সাধনায় আবেগোন্মাদনার যে তীব্রতা সৃষ্টি করে, তাহাই তাহাদিগের সর্ব্বথা কাম্য। তাই সে গৃহ-কর্ম্ম সম্পাদন করে,—নবসঙ্গ-রসায়নানন্দ কল্পনায়।—সেই গৃহ-কর্ম্মের ভিতর দিয়া মনকে নানা বিষয়ে সংযুক্ত রাখিবার প্রয়াসের মধ্যেও মনের সেই যে নবসঙ্গ-রসায়ন-আনন্দস্পৃহা তাহা অদম্য ও পরিবর্দ্ধনশীল। সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যেই তাহার সেই আনন্দ রসাস্বাদনের স্পৃহা সর্ব্বদাই জাগরুক থাকে।

ভগবানকে ভালবাসিতে আর্য্য হিন্দুগণ যে উপায় বা পন্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, জগতে তেমন রীতি কুত্রাপি নাই। গৃহের নিত্য আস্বাদ্য ভাব বা রস সমূহের ভিতর দিয়াই ভগবৎ সাধনার যে সহজ পন্থা বিদ্যমান্, ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ ব্যতীত আর কেহই তাহা অবগত ছিলেন না।

জগতে সর্ব্ব জাতিই শান্ত-রসের উপাসক। শান্তরস গৃহের নিত্য আস্বাদ্য রসের অন্তর্ভূত নহে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই রসচতুষ্টয়ই গৃহের নিত্য আস্বাদ্য বস্তু। সেই রস-চতুষ্টয় কেমন করিয়া ভগবানে আরোপ করিতে হয়, ঋষিগণ তাহার কৌশল প্রদর্শন জন্যই ব্রজলীলার অবতারণা করিয়াছেন। সমুদয় জগতের লোকই ভগবানকে ভয়ের বস্তু করিয়া রাখিয়াছেন। সাধারণতঃ Awe বা ভয়মিশ্রিত ভক্তিই তাঁহাদের অতি উৎকৃষ্ট উপাসনার অঙ্গ। শান্ত-রসে কতকটা এই ভাব আছে। কিন্তু আমাদের ভগবান্ প্রভু, আমরা দাস;—আমাদের সেবার অধিকার আছে। আমাদের ভগবান্ সখা,—সমপ্রাণঃ সখামতঃ!—আমরা ভগবানের সহিত একপ্রাণ! তাঁহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী!—আমাদের পরস্পরের হৃদয়-বিনিময় হইয়া গিয়াছে—গোপনীয় কিছুই নাই। আমরা পরস্পর হাস্যালাপ ও ক্রীড়া করি—একত্র ভোজন, একত্র শয়ন ও একত্র ভ্রমণ করি। আমাদের ভগবান্ বলিয়াছেন:—

আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ চরিতামৃত।

যিনি আপনাকে বড় মনে করিয়া আমায় হীন ভাবিয়া পালন করেন ; যেমন নন্দ-যশোদা আমার মাতাপিতৃ স্থানীয় হইয়া আমার পালন, অল্পবুদ্ধি বালক জ্ঞানে কত আন্তরিকতায়, কত অপূর্ব্ব স্নেহে আকুল হইয়া আমাগত প্রাণে আমায় পালন করেন ; — এই ভাবে আমি তাঁহাদের অধীন হইয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিয়া চলিতে আনন্দানুভব করি। যাহারা আমায় সমান ভাবে, আমি তাহা-দেরও অধীন হইয়া চলিতে আনন্দ লাভ করি। সখা-সখীরা আমায় সমান ভাবিয়া তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ মনে করিয়া আমায় যে আজ্ঞা করে, আমার সহিত "ওরে, হাঁরে" করিয়া কথা কয়, আমাকে সখা, বন্ধু ভাবিয়া যে মন-প্রাণের—সুখ-দুঃখের কথা বলে, কিছুই গোপন না করিয়া সরল প্রাণে অন্তরের কথা জ্ঞাপন করে, আমার সঙ্গে খায়, আমার সঙ্গে খেলা করে, আমায় কাঁধে চড়ায়,—আমার কাঁধে চড়ে—এই ভাবেও আমি তাহাদের আজ্ঞাধীন হই।—এইভাবে আমাদের গৃহের নিত্য আস্বাদ্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের অপূর্ব্ব আদান প্রদান চলে।

আমাদের শাস্ত্রে আছে আত্মবৎ সেবা। ভগবান্‌কে—ইষ্টকে আত্মবৎ সেবা করিতে হয়। আমি যেমন আহার বিহার করি, আমি যেমন গ্রীষ্ম বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত বসন্তে ঋতু অনুযায়ী খাদ্য ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করি, সুখ স্বাস্থ্যানুসন্ধান করি, আমার ইষ্ট বা ভগবান্‌কেও তদ্রূপ সমভাবে খাদ্য ও পরিচ্ছদ দানে পরিতুষ্ট করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল হইব,—ইহাই আমাদের ভগবদারাধনা। আমার ভগ-বান্ আমার ভয়ের বস্তু নহেন—আমার শিশু সন্তান,—আমার সখা, আমার অন্তরঙ্গ প্রিয়বন্ধু!—আহা! কি আন্তরিকতা! কি মোহনীয় প্রেম!—তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি চলিবে না। বাৎসল্যে তোমায়,

কোলে না লইয়া নিদ্রা যাইতে পারি না,—কত সাবধানতায় তোমায় রক্ষা করি। সখ্যে একবারে নর্ম্মসখা—সমপ্রাণতা—তোমার সুখ দুঃখে আমার সুখ দুঃখ। আমরা পরস্পর ক্রীড়ার সঙ্গী,—একদণ্ড না দেখিলে বাঁচিনা! কত অমঙ্গল আশঙ্কা আসিয়া আমাদিগকে মুহ্যমান করিয়া ফেলে। আমরা পরস্পরের রক্ষক।

মাধুর্য্যে ত কথাই নাই! তুমি যে আমাদের প্রাণপ্রিয়,—তোমায় কেমন করিয়া কোথায় রাখিব, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারি না। সর্ব্বদাই চিন্তা আহারে-বিহারে, শয়নে-ভ্রমণে, তোমার বুঝি অস্বস্তি হইল! তোমায় আমাদের সর্ব্বস্ব দান করিয়াও আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারি না, তুমি যে আমাদের হৃদয় সর্ব্বস্ব! কমলগ্রথিত কোমল শয্যায় শয়ন করাইয়াও আশা মিটে না, মনে হয় কমলদল বুঝি তোমার সুকোমল অঙ্গে ব্যথা উৎপাদন করিল! তোমার ভোজন শয়নের চিন্তা সর্ব্বদাই আমাদের মনে জাগরুক রহিয়াছে, তুমি নয়নের অন্তরাল হইলে কত অমঙ্গল আশঙ্কায় হৃদয় ভরিয়া উঠে, কত ভয়ে আকুল হইয়া দণ্ডে শতবার "ঘর বাহির ও বাহির ঘর" করি, তাহার ইয়ত্তা নাই। তুমি আমাদের হৃদয়ারাম—প্রাণারাম! তুমি সুখী হইলেই আমরা সুখী—তোমার আনন্দেই আমাদের আনন্দ!—তুমি আমাদের হৃদয়ের হৃদয়—প্রাণের প্রাণ! তুমি আমাদের ইষ্ট—তুমি আমাদের ভগবান্!—আমরা তোমার দাসী—তোমার সখী! তোমাকে আনন্দ দানই আমাদের একমাত্র কাজ ও ও মন্ত্র!—আমরা আমাদের সুখ সুবিধা চাহি না, তুমি সুখী হও—সর্ব্ব প্রকারেই আমাদের তাহাই কামনা। আমরা কামিনী তুমিই আমাদের একমাত্র কাম্য বলিয়া।

এই যে ভগবৎ মাধুর্য্য আস্বাদন,—এই আস্বাদন,— মাধুর্য্যেই পূর্ণতমরূপে প্রকাশ!—আবার এই মাধুর্য্যের প্রতিমা গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই বরণীয়া। এই মাধুর্য্যরস কেমন করিয়া আস্বাদন

করিতে হয়, বৈষ্ণবগ্রন্থ সমূহে তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক প্রকরণ পরিস্ফুট রূপে বিবৃত রহিয়াছে। শ্রীরাধিকা মধুর রসের উপাসিকা। সেই রসের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে শ্রীরাধিকার আরাধনার রীতি-নীতি পাঠককে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। শ্রীরাধিকার প্রেমরস উপলব্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-সম্বরণ করিতে পারেন নাই! তাই তাহা পূর্ণ-রূপে আস্বাদন করিবার জন্য পরে শ্রীচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হয়েন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভাবের যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাই উদ্ধৃত করিলে পাঠক শ্রীরাধিকার আরা-ধনার সাত্ত্বিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ—

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটীগুণ রাধা প্রেমাস্বাদ॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়।
রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময়॥
রাধা প্রেমা বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥
যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত॥
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার॥

মর্ম্মার্থ ঃ—আমি স্বয়ং পূর্ণানন্দময় অর্থাৎ আমি রসো বৈ সঃ—আনন্দের পরিপূর্ণ রসস্বরূপ। অর্থাৎ আমাতে যে পরিপূর্ণ আনন্দ বর্ত্তমান, তাহা অপেক্ষা জগতে আর আনন্দ নাই। যেহেতু অভাব থাকিলেই তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু আমাতে আনন্দের কোন অভাবই নাই—আমি সর্ব্বদাই পরিপূর্ণানন্দ—অবিকার! তথাপিও রাধাপ্রেম আমার মধ্যে বিকার সৃষ্টি করিয়া আমাকে উন্মত্ত করায়। রাধাপ্রেমে যে কত অপূর্ব্ব বল আছে তাহা জানি না; কারণ তাহা সর্ব্বদাই আমায় প্রেমে বিহ্বল করিতেছে! রাধিকার প্রেম আমার গুরু স্বরূপ হইয়া আমাকে সর্ব্বদাই উদ্ভট রূপে নৃত্য করাইতেছে।

আমার নিজ প্রেমাস্বাদে যে আনন্দ হয়, রাধা প্রেমাস্বাদে যেন তাহা হইতে কোটীগুণ আনন্দ লাভ হয়। আমি যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকলের আশ্রয়—যথা নির্ব্বিকার ও স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বব্যাপী ও সুন্দর মূর্ত্তিমান, নিরপেক্ষ ও ভক্তপক্ষপাতী, আত্মারাম ও ভক্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষী ইত্যাদি; রাধা প্রেম সেইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মে পরিপূর্ণ;—যথা চরম মহাভাব অথচ সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল, প্রেমগৌরবে পূর্ণ অথচ গৌরব বিহীন, নির্ম্মল অথচ বাম্যাদি পূর্ণ।

রাধিকার অনুরাগ বিভু অর্থাৎ শেষসীমা বিশিষ্ট হইয়াও সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল, অত্যন্ত গুরু হইয়াও গৌরব বিহীন, বিশুদ্ধ নির্ম্মল হইয়াও মুহুর্মুহুঃ বক্রগতি বিশিষ্ট।

সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হইতে কোটীগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়।

কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥

মর্ম্মার্থ ঃ—যিনি প্রেম করেন তিনি প্রেমের আশ্রয়। যাঁহাকে প্রেম করা যায় তিনি প্রেমের বিষয়। রাধার প্রেমের আশ্রয় রাধিকা ও প্রেমের একমাত্র বিষয় কৃষ্ণ। আমি কৃষ্ণ, আমাতে যে সুখ আস্বাদিত হয় তাহা বিষয়-জাতীয় সুখ। কিন্তু আশ্রয়ে যে আনন্দ বা সুখ আছে তাহা আমার বিষয়-জাতীয় সুখ হইতে কোটীগুণ আনন্দময়। আশ্রয়-জাতীয় সুখ রাধিকাই উপভোগ করেন, আমি কৃষ্ণরূপে তাহা উপভোগ করিতে পারি না। যদি কখনও সেই প্রেমের আশ্রয় হইতে পারি, তবেই আশ্রয়-জাতীয় সুখরূপ পরমানন্দ উপভোগ করিব। আশ্রয়গত প্রেমাস্বাদের লোভই আমার কাম্য।

এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধকধকি॥
এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেম দ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্য্য নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥
মন্মাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥
কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন॥
এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন॥
কোটী নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুই॥
কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান্॥
কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ॥

—কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এমনই মোহনীয়তা যে, অন্যে পরে কা কথা তাহা কৃষ্ণকেই আকর্ষণ করে। সুতরাং সাধারণ তাহা দেখিয়া আত্ম-বিহ্বল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এমন কৃষ্ণের আকর্ষণ,—এমন অপরূপ রূপমাধুর্য্য—যে একবার নয়নে পান করে, তাহার কি আর আমার বলিতে কিছু থাকে? এইরূপ আস্বাদ করিবার জন্য কৃষ্ণও চঞ্চল হইয়া উঠিয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিচার করিতে

লাগিলেন', লোকে যে বলে এত রূপ, আমিও দেখিতেছি—রূপের অসীম মাধুর্য্য—ভাব-ভঙ্গী, ছন্দ ও লাবণ্য আমাকেও আকর্ষণ করিতেছে! কিন্তু আমি ত এদেহে ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। রাধিকা আমায় যেভাবে আস্বাদ করে, আমার ত সে ভাবে আস্বাদন করিবার শক্তি নাই; অতএব রাধার ভাব গ্রহণ না করিলে সে রসাস্বাদনের সম্ভাবনা নাই।" এই জন্যই শ্রীরাধাভাবাস্বাদনের প্রতীক স্বরূপ শ্রীচৈতন্যরূপে তাঁহার আবির্ভাব।

এখন দেখা যাউক, গোপীভাব বা রাধাপ্রেম কেমন?

গোপীগণের প্রেমের রূঢ়ভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা তাঁরে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥
লোক-ধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ-সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎ র্সন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
আত্মসুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৩২ অধ্যায় ২১ শ্লোক। রাসে—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ॥
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্যতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ কারণ॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥
আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটীগুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়॥

তাঁ সবার নাহি নিজসুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান !
গোপিকার সুখে কৃষ্ণ-সুখ পর্য্যবসান ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে, যার নাহিক সমতা ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপগুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে ॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে ॥
আর এক গোপী প্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধ হীন ॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হয়ে মহা তুষ্টি ॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাহা নাহি নিজ সুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥
নিরুপাধি প্রেম যাহা তাহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥

প্রীতির বিষয় যে কৃষ্ণ, তাঁহার যে আনন্দ, তাহাই অর্থাৎ সেই আনন্দের প্রীতির আশ্রয় যে গোপী,—তাহার আনন্দ। অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রীতিবাঞ্ছাকারিণী গোপী কৃষ্ণের আনন্দেই আনন্দিতা, কৃষ্ণ সুখী হইলেই তাহার সুখ।

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥

ইহাই নিষ্কাম ভক্তের লক্ষণ, তাহার নিজের সুখাভিলাষ আদৌ নাই।

মদ্গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ॥ ১০।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যহ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ১১।
সালোক্য সার্ষ্টি স্বরূপ্যসামীপৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনামৎসেবনং জনাঃ॥ ১২।

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ২৯। অধ্যায়।

আমার গুণ শ্রবণমাত্র, সর্ব্বচিত্ত নিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্র প্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় মনের যে অবিচ্ছিন্ন পবিত্র অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তম স্বরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা।—অহৈতুকী অর্থাৎ হেতুরহিতা স্বতঃ সিদ্ধা, অব্যবহিতা অর্থাৎ ব্যবধান বা অবান্তর ফলানুসন্ধান রহিতা। সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস) সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্য—সম্পত্তি) স্বারূপ্য (বিষ্ণু স্বরূপ চতুর্ভুজাকার) সামীপ্য (নৈকট্য লাভ) একত্ব সাযুজ্য বা অভেদগতি প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না। যেহেতু তাঁহাদের আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং
নেচ্ছন্তি সেবয়া পুর্ণাঃ কুতোহন্যাৎ কালবিপ্লুতং ॥ ৪৯

৯ম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায়। শ্রীমদ্ভাগবত।

আমার সেবা দ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় সমাগত হইলেও ভক্ত আমার সেবায় পূর্ণমনা হইয়া সে সমুদয় গ্রহণ করেন না। তখন মায়িকভোগ ও সাযুজ্য মুক্তি যাহা কালের দ্বারা অতি সত্বর নাশ হয়, তাহা কেন ইচ্ছা করিবেন? সাযুজ্য মুক্তি দ্বারা জীবের সত্তাকাল অপরাধ-কবলে পতিত হয়; অতএব ভুক্তি ও সাযুজ্যমুক্তি ইহাদের স্থায়ীত্ব নাই।

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী প্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী ॥
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটী ইষ্টসমীহিত ॥
সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতং।
জানন্তি গোপিকা পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥

আদি পুরাণ।

গোপীসকল আমার সর্ব্বস্ব, তাহারা আমার সহায় অর্থাৎ প্রিয়া, গুরু স্বরূপ ভক্তি করেন, শিষ্যার ন্যায় সেবা করেন এবং উপভোগ্য যোগ্যা।

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা ॥

পদ্মপুরাণ।

রাধা যেমন কৃষ্ণের প্রিয়তমা, রাধাকুণ্ডও তদ্রূপ তাঁহার প্রিয়-স্থান। গোপীবর্গের মধ্যে শ্রীরাধাই কৃষ্ণের অত্যন্তবল্লভা অর্থাৎ সর্ব্বাধিকা প্রিয়তমা।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম॥

আদি পুরাণ।

বৃন্দাবন ধাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ায় ত্রৈলোক্য ধন্য হইয়াছে। এবং গোপিকা সকলও ধন্যা, যেহেতু তন্মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয়া রাধা নাম্নী গোপিকা বর্ত্তমান।

রাধাসহ ক্রীড়া রস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণপ্রাণধন।
তাহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ॥
কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাং।
রাধামাধবায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী॥

গীত গোবিন্দ।

কংসারি শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ সার স্বরূপ রাসলীলাবাসনাবদ্ধা শ্রীরাধাকে হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

সেই রাধা ভাব লঞা চৈতন্যাবতার॥
শ্রীরাধায়া প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতোমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কড়চা।

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদ করেন তাহাই বা কিরূপ ? আমার মধুরিমার অনুভূতি

হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়? এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভ সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ রস স্বরূপ সবে কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন জন॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
কোটী কাম যিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর বংশীগীত আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্তপ্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥
এই মত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত॥

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥
পরস্পর বেণুগীত হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ॥
তাম্বুল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত॥
লীলা অন্তে সুখে ইহার অঙ্গের মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাশরি॥
দোঁহার যে সম রস ভরত মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে॥
অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা সুখে শত অধিকাই॥

নির্ধূতামৃত মাধুরী পরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্তৃং পঙ্কজসৌরভং কুহরিতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গশ্চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্য সর্ব্বস্বভাক্
ত্বমোস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে॥

ললিত মাধব পঞ্চম অঙ্ক ৫ শ্লোক।

হে কল্যাণি! অমৃতমাধুরী পরিমল বিজয়ী তোমার বিম্বাধর, পদ্মগন্ধযুক্ত তোমার মুখ, কোকিলধ্বনি তিরস্কারী তোমার বাক্য সকল, চন্দনের ন্যায় শীতল অঙ্গ ও সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধার স্বরূপ

তোমার শরীর। এতাদৃশী রূপগুণলীলাময়ী তোমাকে লাভ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণ পুনঃপুনঃ মহামোদ লাভ করিতেছে।

শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং—

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাং।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদগীর্ণ মহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং॥

কংসারি শ্রীকৃষ্ণরূপে লোভযুক্ত শ্রীরাধার নয়ন যুগল, স্পর্শে অতি হর্ষান্বিত তাঁহার ত্বগিন্দ্রিয়, বাক্য শ্রবণে উৎকুন্ঠিত শ্রুতি, অঙ্গগন্ধে প্রফুল্ল নাসাপুট, অধরামৃতবশীকৃত রসনা, সর্ব্বদা প্রফুল্ল মুখাব্জ, নম্রীভূত ধৈর্য্যনাশক উৎকট রোমাঞ্চাদি বিকার সমূহে ব্যস্ত অঙ্গ সমূহ লক্ষিত হইল।

তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখমাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥

রাধাভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥

চরিতামৃত।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বোক্ত পয়ার সমূহ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিলাম এইজন্য যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর কিরূপ প্রেমাকুল। এই আকুলতায় কে বড়, কে ছোট, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপমাধুর্য্যে আত্মহারা হইয়া শ্রীরাধিকা যে অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করেন, কৃষ্ণরূপে শ্রীরাধিকার সে সুখ উপলব্ধি করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই দেখিয়া কৃষ্ণ রাধিকার প্রণয়মহিমা, কৃষ্ণের অনুপম মাধুর্য্যপানে রাধিকার যে অপূর্ব্ব ভাবোপলব্ধি হয়, এবং সেই ভাবোপলব্ধি হইতে তাঁহার কি জাতীয় সুখের উদয় হয় তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ হইবার সংকল্প করিলেন। ইহাতে রাধিকারই ভাবাধিকারের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে ও স্পর্শনে শ্রীরাধিকার কি প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দ ও সাত্ত্বিক ভাববিকার হয়—যে আনন্দ ও ভাব-বিকার শ্রীকৃষ্ণেরও লোভনীয়, তাহা যে কত উচ্চ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার সাধ্য কাহার?

যিনি আত্মারাম, যাঁহার সৌন্দর্য্যে জগৎ মুগ্ধ, যিনি মূহূর্ত্তে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারেন, জগতে যাঁহাকে মোহিত করিবার কেহ বা কোন কিছু নাই, যিনি একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রজধামে থাকিয়াই ব্রজলীলা শেষ করিয়া মথুরায় গমন করেন, যিনি পরিপূর্ণ যোগৈশ্বর্য্য-শালী, যাঁহার কোন বিষয়ে কোনপ্রকার অভাব নাই, যিনি সর্ব্বশক্তি-মান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান্, তিনি শ্রীরাধিকার—কৃষ্ণরূপদর্শনের—মোহনীয়তায়—শ্রীরাধিকার ভাবাতিশয্যে সাত্ত্বিক বিকার লক্ষ্য করিয়া সেই ভাবোপলব্ধ সুখোপভোগ কামনায় আপনাকে রাধিকার স্থানাধি-কার দানে উন্মুখ। ইহা ভগবানের ভক্তপ্রিয়তারই লক্ষণ। তিনি ভক্তকে

সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভিখারী হইতে সর্ব্বদাই ইচ্ছুক। ভগবানের এই ভক্তপ্রিয়তাই ভক্তকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া থাকে। ভক্ত ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব দিয়া কাঙ্গাল হইয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে মোহাবিষ্ট হয়!

তবে কথা এই যে, শ্রীরাধিকা যে সেই আত্মারাম পরমপুরুষেরই শক্তি। আধার ব্যতীত অগ্নি যেমন আত্ম প্রকাশ করিতে পারে না, এবং আধার ও অগ্নি যেমন অভিন্ন, দুগ্ধ ও তাহার ধবলত্বে যেমন প্রভেদ নাই, তদ্রূপ শ্রীরাধিকাও যে পরম পুরুষের অভিন্নাত্মা এবং সর্ব্বজগৎকর্ত্রী, বিধাত্রী, পালয়িত্রী, সর্ব্বশক্তি সম্পন্না, সর্ব্বজ্ঞা এবং সর্ব্বত্র বিরাজমানা। কেবল লীলার জন্যই নরলোকে তাঁহাদের দ্বিধা প্রকাশ। শক্তি ও শক্তিমান্ একই। একেই দুই এবং বহু হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন লীলার জন্য। লীলার উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। নরলোক তাঁহার বড়ই প্রিয়। সেই নরলোকের মধ্যে ভারতবর্ষই তাঁহার অধিকতর প্রিয় ও লীলাক্ষেত্র। কারণ ভারতবর্ষ ধর্ম্মক্ষেত্র; সুতরাং আস্তিক্য বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন। জড়বাদীর দেশে তাঁহার মোহন লীলা হয় না। কারণ তাহারা তাহা বুঝিতে পারেনা।

আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

এ ভাব জড়বাদীদের ধারণার অতীত। ভগবান্‌কে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, আপনার পুত্র, সখা ও প্রিয়রূপে কেমন করিয়া স্নেহ মমতা দিয়া পোষণ করিতে হয়—এভাবের অনুভূতি জড়বাদীদের মধ্যে আদৌ সম্ভব নহে। আবার ভগবান্ বলিতেছেন, যাঁহারা আপনাকে বড় মানিয়া আমাকে ছোট দেখে, আমাকে পুত্রবৎ ভাবিয়া বাৎসল্যের আতিশয্যে লালন পালন করিতে যত্ন করেন, আমি তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হই। যাহারা আমাকে সখা ভাবিয়া আমার সখা বা সখী হয়, তাহাতে আমাতে সমান বিবেচনা করিয়া সমভাবেই আমার সহিত

হৃদয়ের আদান প্রদান করে,—গোপন কিছুই রাখে না ; হাসি তামাসা আহার বিহার, সুখ দুঃখ সরল হৃদয়ে ব্যক্ত করে, তাহাতে আমাতে প্রভেদ কিছুই রাখে না, সম্ভ্রমের ত্রিসীমা স্পর্শ করে না, "তুই" বলিয়া কথা কয়—"ওরে হারে কিরে জাতীয় স্বভাব। কিন্তু অন্তরেতে ওর বড়ই ভক্তি ভাব॥"—সম বয়সীর স্বভাবই "ওরে, হাঁরে কিরে!" এঁটো খায়, এঁটো খাওয়ায়—না খেয়ে মুখে গুঁজে দেয়,—বলে, দেখ্ দেখ্—খেয়ে দেখ্ কেমন মিষ্টি"!—আন্তরিকতার এতটুকুও ত্রুটি নাই! শরীর অসুস্থ হ'লে গায় পায় হাত বুলায়, বুকে চেপে ধরে, বাহ্যে প্রস্রাবের জন্য সরা ধরে! একটুও বিরক্তি নাই—ঘৃণা নাই! ইহাই সখ্য! সাধারণ মানুষের এই যে সখ্য—আন্তরিকতা,—ভগবান্ বলিতে-ছেন যে আমাতে ইহা আরোপ করিয়া তাহার সাধারণ সখা বা বন্ধুর মত আমাকে সখা বা বন্ধু করিতে পারে, আমি তাহার সেই প্রকার বন্ধুই হই। ভগবানের ঐ কথা সত্য! সত্য! সত্য!—শুধু কথায় নয়, কাজে যে তাঁহার বন্ধুত্ব করে, সেই তাঁহাকে একবারে অন্তরঙ্গ-বন্ধুরূপেই পায়।

আমাদের ভগবান্ এত ছোট—এত খাটো! জড়বাদীরা ইহা ধারণা করিতে পারে না, পারিবে না! এই জন্যই ভগবান্ বুঝি তাহাদিগকে এ ভাব দেন না। এভাব গ্রহণ করিতে হইলে তাহাদিগকে হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

ভগবান্‌কে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়—কেমন করিয়া আপ-নার করিতে হয়,—তাঁহাতে আমাতে কোন প্রভেদ নাই, তিনি যে কত আপনার হইতেও আপনার, তাহা ব্রজভাবেই শিক্ষা দিয়াছেন। ব্রজের ভাব মাধুর্য্যের তুলনা জগতে নাই।

কাহাকেও পিতা মাতা, কাহাকেও সখা সখী, কাহাকেও আত্মীয় স্বজন সাজাইয়া জাগতিক ভাবে মানুষের প্রীতি প্রেম শ্রদ্ধায়—ব্রজে অপূর্ব্ব লীলায়—মানুষকে ভগবদারাধনার ক্রম শিক্ষা দিয়াছেন।

এখনও সেই শিক্ষা, সেই ক্রম—সেই প্রীতি প্রেম শ্রদ্ধা বর্ত্তমান আছে। যে সেই ক্রম—সেই প্রীতি প্রেম লইয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে চায়—এখনও সে সেই ভাবেই তাঁহাকে সখা সখী বা পুত্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আকুল হয়!

কামাদ্দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদগতিং গতাঃ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যুয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ৭।১।২৯।৩০।
শ্রীমদ্ভাগবত।

দেবর্ষি নারদ বলিলেন হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! বৈধী ভক্তিতে ঈশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিয়া পাপাদি নাশ হইলে যেমন সদগতি লাভ হয়, তদ্রূপ কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহ দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্টচিত্ত বা তন্ময় হইলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া অনেকেই তদগতি লাভ করেন। তজ্জন্য গোপীগণ কাম দ্বারা, কংস ভয় দ্বারা, শিশুপালাদি বিদ্বেষ হেতু, এবং বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধবুদ্ধিতে কৃষ্ণে আবিষ্টচিত্ত হইয়া যেরূপ কৃষ্ণোন্মাদনার ফললাভ করিয়াছে, তোমরা স্নেহাবিষ্ট হইয়া যেরূপ কৃষ্ণগতি লাভ করিয়াছ, আমরা ঋষিগণ বৈধীভক্তি দ্বারা কৃষ্ণে চিত্তাবেশ পূর্ব্বক তদ্রূপই কৃষ্ণগতি লাভ করি।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও একটু না বলিয়া প্রস্তাবনা শেষ করিতে পারিতেছিনা। গোকুলে গোপীগণ যে কে তাহা পদ্মপুরাণে উক্ত আছে ঃ—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্টা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমিচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্না সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততোমুক্ত ভবার্ণবাৎ॥

পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ নয়নাভিরাম শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন

করিয়া তাঁহাকে মধুরভাবে উপাসনা করিতে প্রার্থনা করেন। শ্রীরামচন্দ্রের বর প্রভাবে তজ্জন্য তাঁহারা দ্বাপরযুগে গোকুলে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রেম সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হয়েন।

ইহাই তাহাদের পূর্ব্বজন্মলব্ধ সংস্কার ও শ্রীহরির অঙ্গীকার। এইজন্য ইঁহাদের এমন সহজ সাধনা।

ক্ষান্তিরব্যর্থ কালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচি॥
আশক্তি তৎগুণাখ্যানে প্রীতিতৎবসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাস্যুর্জ্জাত ভাবাঙ্কুরে জনে॥

যাঁহার হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর হইয়াছে তিনি ক্ষান্তি অর্থাৎ প্রতিকারের ক্ষমতা সত্তেও ক্ষমা করেন। অব্যর্থ কালত্ব অর্থাৎ বৃথা সময় নষ্ট করেন না। আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা—ভগবল্লাভ বিষয়ে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসী ও তাঁহাকে পাইবার জন্য সমধিক উৎকণ্ঠাকুল, তাঁহার নাম গানে সর্ব্বদাই রুচি—অর্থাৎ আগ্রহশীল, গুণকথনে আসক্তি প্রকাশ এবং তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতি স্থাপন করেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে—তপস্যার মহিমায় গোপীগণ কৃষ্ণের গুণ কথনে শত সহস্রমুখ, তাঁহার চালচলন, আহার বিহার, হেলালীলায় তাহারা মজগুল! তাহাদের এই আত্মদান, এই ত্যাগ, এই প্রীতি, এই আত্যন্তিক অনুরক্তি, এই সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা—সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার ফল! সেই সংস্কারবশে গোপীদিগের এই ভোগেচ্ছা ব্রত! তাই আজ তাঁহাদের—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্‌দৃষ্টি পরাবরে॥

সেই পরাৎপরের দর্শনে হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ মায়াজাল দূরীভূত, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন এবং সর্ব্বপ্রকার প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে

তাই তাহারা আজ তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুই কামনীয় নাই জানিয়া তাঁহাতে ভিন্ন আর কিছুতেই মনঃসংযম করিতে পারিতেছেন না—যাঁহাদের সর্ব্ব সংশয় দূরীভূত ও দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়াছে এমন যে গোপী, তাঁহাদের হৃদয়ে প্রাকৃত ভোগের কলুষিত ভাব থাকিতে পারে না। যিনি আত্মারাম, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ তাঁহার আবার অভাব বা আকাঙ্ক্ষা কি? অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদিগের এই যে মুগ্ধভাব, ইহা জীবের কল্যাণের জন্যই লীলারূপে প্রকাশ।

সর্ব্বপ্রকারে আত্ম বা স্বার্থত্যাগ করিয়া জীব কেমন করিয়া তাহার ইষ্ট বা ভগবান্‌কে ভালবাসিবে তাহারই জীবন্ত উদাহরণ প্রদর্শন। ভগবানের সহিত ক্রীড়া করা কি সাধারণ জীবের কর্ম্ম? তিনি সচ্চিদানন্দ!—কলুষের নাম মাত্র নাই। কত শক্তি, কত সাধনা থাকিলে তবে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ হয়। সেই ভগবানের অঙ্গাঙ্গী হৃদ্যতা লাভ কি সহজ সাধনার ফল? ভগবান্ ভক্তপ্রাণ! ভক্তের জন্য তিনি সবই করেন—সবই হন। ভক্তের জন্য তিনি কতদূর কি হইতে পারেন, আপনাকে কত ছোট, কত খাটো করিতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্যই তাঁহার এই ব্রজলীলা!

যাঁহাকে দেখিলেই কামতৃষ্ণা দূরীভূত হয়, তাঁহার আবার সম্ভোগবাসনা কি? সুতরাং যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করেন তাঁহাদেরও হৃদ্রোগ তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়। অতএব প্রাকৃত কামের কোন কিছুই ইহাদের মধ্যে নাই বা থাকিতে পারে না। দিব্যভাবে কেবলমাত্র সেই কামের দ্যোতনা প্রদর্শন পূর্ব্বক মধুরভাবে ঈশ্বরের ভজনার ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। কামের কুৎসিত কার্য্য নাই, কিন্তু ভাবের মাধুর্য্য আছে এবং তাহা তৎস্থানাধিকার করিয়া আনন্দ দান করে।

আমাদের শাস্ত্রে অসিধার-ব্রতের কথা আছে।

যুবা যুবত্যা সার্দ্ধং যন্মুগ্ধাভর্ত্তৃবদাচরেৎ।
অন্তর্নিবৃত্তসঙ্গঃ স্যাদসিধারা ব্রতং হি তৎ॥

যুবক যুবতী অতিমুগ্ধ প্রেমিক প্রেমিকার ন্যায় একত্র অবস্থান করিয়াও অন্তর্নিবৃত্তসঙ্গ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দমন পূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া ভগবৎ সাধনায় নিরত হইলে তাহাকে অসিধার-ব্রত বলে।

মনই সুখ দুঃখের আধার। মনই বন্ধনমুক্তির হেতু। কাম ক্রোধাদি মনেরই রোগ। মন বিষয় বিশেষে গাঢ় নিবিষ্ট বা একনিষ্ঠ হইলে ইন্দ্রিয়গণ তাহারই আনুগত্য করে। এজন্য আমাদের যোগশাস্ত্রে প্রথমেই মন জয়ের পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় ত দূরের কথা, মন ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন হইলে দেহজ্ঞানও থাকে না। মনঃসংযম হইলে অনায়াসেই ইন্দ্রিয় জয় করা যায়। এবং ইন্দ্রিয় জিত হইলে তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ জানিলে আর তাহাদের কুহকের ভয় থাকে না। মন বন্য ঘোটকের ন্যায় দুর্দ্দান্ত;—সহসা কিছুতেই বশীভূত হয় না। কিন্তু তাহাকে শিক্ষিত করিয়া লইলে সে প্রবলবেগে দৌড়িয়া আরোহীকে স্বর্গাতীত অমৃতময় স্থানে লইয়া যায়।

মন ইন্দ্রিয়গণের রাজা সুতরাং সে বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়গণ মনের মননীভূত বিষয় প্রাপ্তির সহায়তাকল্পে কৃতদাসের কার্য্য করে। আবার ভগবদ্ধ্যানে যখন মনের নাশ হয়, ধ্যাতা ধ্যেয়, জ্ঞাতা জ্ঞেয় এক হইয়া যায়, তখন জীবাত্মা যে অমৃতের সন্ধান পায়—যে চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া যায়, তাহা হইতে সে আর ফিরিতে চায় না—তেমন আনন্দের ন্যায় উপভোগ্য বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে আর খুঁজিয়া পায় না। তাই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় পার্থিব ভোগ্যবস্তুকে ন্যক্কারজনক হেয়জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া তাহাতেই মজিয়া যায়! এই যে অপূর্ব্ব সুখাস্বাদ, এই আস্বাদনের প্রলোভনের নিকট ইন্দ্রিয় সুখাস্বাদ নিরোধক অসিধার ব্রতও অতি তুচ্ছ! ইহা অপেক্ষা অতি কঠোর ব্রতও যদি কিছু থাকে, তাহাও সেই অপূর্ব্ব সুখাস্বাদ প্রলোভনের ঐকান্তিকতার তুলনায় ভাস্করের নিকট খদ্যোতের ন্যায় প্রতীয়মান্ হয়।

কারণ মানুষ সুখ চায়। বড় সুখ পাইলে ছোট সুখকে আনায়াসে

পরিত্যাগ করে। যাঁহারা সুখ পায় নাই তাহারাই অসিধার-ব্রতকে ভীষণ বলিয়া মনে করে। যাহারা ভগবদ্ধ্যানানন্দের আস্বাদ পান, তাঁহাদের নিকট ইন্দ্রিয় সুখ অতি তুচ্ছ—ঘৃণ্য পশুধর্ম্ম বলিয়া অনুমিত হয়। তাহারা স্ত্রীপুরুষ ভেদ জ্ঞান রহিত। তখন তাঁহারা ভালবাসার জন্যই পরস্পরকে ভালবাসেন! তখন তাঁহারা "না সো রমণ, না হাম রমণী" হইয়া যান।—তখন বাহ্যেন্দ্রিয় জ্ঞানই থাকে না। তখন মন সচ্চিদানন্দের জ্যোতিঃসাগরে ডুবিয়া আনন্দে গলিয়া তাহাতে মিশিয়া যায়! (মৎপ্রণীত কমলাক্ষী দেখুন)

গোপীগণ এমনই বিশুদ্ধ ও আনন্দময়! ত্যাগের চরমোৎকর্ষের উপর এই প্রেমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। গোপীর আপনার সুখবাঞ্ছা কিছুমাত্র নাই—প্রিয়তমের আনন্দবর্দ্ধনই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। আপনা ভুলিয়া প্রিয়তমের সেবাই তাহাদের ধ্যান জ্ঞান। কথায় নহে; পাঠক, কার্য্যে তাহার পরিচয় লউন। গোপী কি এবং কেমন তাহা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া সহজ চক্ষেই অবধারণ করুন।

জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

———(০)———



শ্রীরাধা।

প্রথমোল্লাস।

ব্রজে আনন্দের স্রোত!

নন্দ-গোকুলে যশোদানন্দন গোপাল অপূর্ব্ব কান্তিতে গৃহ উদ্ভাসিত করিয়া নন্দ যশোদা সহিত গোপনারীদিগকে অপূর্ব্ব আনন্দ দান করিতেছেন। গোপাল মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া স্তন্যপান করিতে করিতে গোপনারীদিগের প্রতি চাহিয়া মৃদুমন্দ হাসির সহিত পদ্মপলাশ-লোচনের অপূর্ব্ব চাহনিতে তাহাদের প্রাণ কাড়িয়া লইতেছেন। তাহারা গোপালের বালক্রীড়াবিজৃম্ভিত সেই অপূর্ব্ব বক্রদৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া অতি সরল সহজ আন্তরিক উচ্চহাস্যের সহিত আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করত কি যেন কি এক অপূর্ব্বভাবে ডুবিয়া যাইতেছে! কত রঙ্গভঙ্গী করিয়া বালকের আবার সেই অপূর্ব্ব চাহনি দেখিতে চাহিতেছে! বালকের অপূর্ব্ব রূপে তাহাদের অন্তর গলিয়া গিয়াছে! মর্ত্ত্যে এমন রূপ তাহারা কখনও দেখে নাই!— চক্ষু যেন সে রূপসুধা পান হইতে বিরত হইতে চাহিতেছে না। যশোদার ক্রোড় হইতে লইয়া হাসিমুখে তাঁহার সহিত কত কথা কহিতেছে! ফুলের মালা লইয়া জনে জনে তাহার গলায় দিয়া রূপসম্ভোগের আশায় ক্রোড় হইতে ক্রোড়ান্তরে গ্রহণ করিতেছে। মুখ, চোখ, নাক, কান, হাত, পা পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া কুসুম-পেলব স্থূলকায়া পুনঃপুনঃ বক্ষেঃ

রাখিয়া আলিঙ্গন করত অজস্র চুম্বনেও যেন আশা মিটাইতে পারিতেছে না!—কি অপূর্ব্ব মাধুরী! বক্ষে করিলে সর্ব্ব শরীরে যেন কি উন্মাদনা জাগাইয়া অপূর্ব্ব শৈত্যে ডুবাইয়া দিতেছে! যেন কি অপূর্ব্ব মোহে জীব-চৈতন্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে! একজন তাহা উপভোগ করিয়া সেই অপূর্ব্ব উপলব্ধি অন্যকে বলিলে সেও তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ক্রোড়ে লইতে লাগিল। এইরূপে গোপাল প্রতিদিন ক্রোড়ে ক্রোড়ে ব্রজময় গৃহে গৃহে উপনীত হইতে লাগিলেন। গোপালের অপূর্ব্ব রূপ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ব্রজ-রমণীগণ নবনীত, মাখন, ছানা-চিনির কত সুকোমল খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিত। গোপাল না আসিলে তাহারা তাহা লইয়া নন্দ গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে না খাওয়াইলে যেন প্রাণে বাঁচিত না।

এইরূপে গোপাল ব্রজময় সকলেরই পরিচিত হইয়া উঠিলেন। কোলে কোলে ফিরিয়া ক্রমশঃ তিনি অন্তরঙ্গ বাড়াইতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৃহে তাঁহার সখা-সখীও জুটিতে লাগিল।

অনতিবিলম্বেই গোপাল হাঁটিতে শিখিলেন। তাঁহাকে ঘরে রাখা দায় হইয়া উঠিল! বালকের চাঞ্চল্যে মাতার সহিত ব্রজ-রমণীরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন;—চোখে চোখে রাখিয়া সংবাদ আদান প্রদান চলিতে লাগিল। নীলমণিকে না দেখিয়া যশোদা কাতর হইয়া উঠিলেন এবং কেমন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করা যায় তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ব্রজে নানা উৎপাত আরম্ভ হইল!—আর যত উৎপাতই কি বালকের উপর! পুতনা রাক্ষসীর কার্য্য স্মরণ করিয়া মা যশোদা সদা সন্ত্রস্ত ছিলেন। দুষ্টু ছেলের দুষ্টুমির জন্য বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়াস করিয়া নিজে যে কষ্টে তাঁহাকে উদূখলে বাঁধিয়াছিলেন; এবং যমলার্জ্জুন মূলোৎপাটিত হইয়া পড়িয়া গিয়া উদূখল সহিত নীলমণিকে চাপা দিয়াছিল আর কি! বহুভাগ্যে গুরুবলে গোপাল রক্ষা পাইয়াছিল—

তাহা ভাবিলে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত! তাই— সর্ব্বদাই তাঁহার চিন্তা কেমন করিয়া চঞ্চল বালককে রক্ষা করা যায়।

দেখিতে দেখিতে বালক বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল! তাহার দুষ্টুমির জ্বালায় ব্রজের নর-নারী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল! এখন আর গোপাল কাহারই অপরিচিত রহিল না। গোপাল এখন অন্যের সাহায্য ব্যতীত ব্রজের গৃহে গৃহে অলক্ষ্যে গমন করিতে লাগিল এবং দুষ্টুমির সুযোগ অন্বেষণে যদি দেখিল কাহারও সন্তান নিদ্রা যাইতেছে, গোপাল অমনি ধীরে ধীরে গিয়া সেই শিশুর গায়ে চিমটি কাটিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া দিয়া অলক্ষ্যে পলায়ন করিল। গৃহকর্ম্মে রত তাহার পিতা মাতা বা আত্মীয় স্বজন সন্তানের চীৎকার শুনিয়া কর্ম্ম ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিল। গোপাল গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়া কাহারও শিকাস্থ নবনীতের হাঁড়ির তলায় ছিদ্র করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া নবনীত খাইয়া পলায়ন করিল। আবার তথা হইতে অন্যত্র গিয়া গোময়-প্রলিপ্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থান দেখিয়া তথায় মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! কাহারও দধি দুগ্ধের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া অন্যত্র পলায়ন করিল—দধি দুগ্ধে ঘর ভাসিল! কাহারও গৃহে প্রবেশ করিয়া, ননী-মাখন শিকা হইতে পাড়িয়া বানরগণকে দিয়া দ্রুতবেগে দৌড় দিল! কেহ শিব পূজার নৈবেদ্য লইয়া যাইতেছে দেখিয়া আড়াল হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিল! কুমারীরা "হায় কি হইল" বলিয়া রোদন করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যশোদার নীলমণির গুণের কথা সকলের নিকট প্রচার করিল। কেহ দেবতাদের জন্য নানা প্রকার মিষ্টান্ন ও লাড়ু আদি প্রস্তুত করিয়া পবিত্র স্থানে তাহা রাখিয়া গৃহকর্ম্মে সামান্য স্থানান্তর হইলে গোপাল স্থালী সমেত তাহা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল! কেহ পুষ্প চয়ন করিয়া দেবতার জন্য মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছে, গোপাল তাহার সন্ধান পাইয়া তাহা লইয়া চম্পট দিলেন! কাহারও হস্ত হইতে আচম্বিতে মালা কাড়িয়া লইয়া

নিজ গলে পরিলেন! হয় ত বা পুষ্পগুচ্ছ লইয়া সুকুঞ্চিত মনোরম কেশে গুঁজিয়া হাসিতে লাগিলেন! বালকেরা হয় ত গোষ্ঠে যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া খাদ্য লইয়া চলিয়াছে এমন সময় গোপাল কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের মধ্যে পড়িয়া খাদ্য লইয়া নিজ বদনে ও তাহাদের মুখে দিয়া এবং বানরগণকে খাওয়াইয়া হাসিতে লাগিলেন! বালকগণ কৃষ্ণের মোহনীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল! এইরূপে ব্রজময় কৃষ্ণের অত্যাচারের সহিত তাঁহার নাম জাহির হইয়া পড়িতে লাগিল!

কিন্তু এত অত্যাচারেও কি জানি বুঝি কেমন একটা আনন্দ হইত, তাই বালকবালিকাগণ খাদ্য লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা কৃষ্ণকে খাওয়াইবে। কৃষ্ণ যে তাহাদের খাদ্য লুঠপাট করিয়া খায়, তাহাতে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না! কৃষ্ণের মোহন রূপ, অপরূপ চালচলন, অমিয়মাখা কথা, সরল সহজ আন্তরিকতায় তাহারা মুগ্ধ হইয়া যাইত! কৃষ্ণ বলিত "মা আমাকে বড় তাড়না করে, তোরা আমাকে তোদের সঙ্গে গোচারণে নিয়ে যাবি?—তোদের সঙ্গে খেলা করব, হাসব, বেড়াব, ছুটব, তোদিকে আমার বড় ভাল লাগে!" এই কথা বলিতে বলিতে চঞ্চল কৃষ্ণ দেখিল দূরে কয়েকজন কুমারী শিবপূজার জন্য গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছে, তাহাদের হাতে নৈবেদ্য, ফুলের মালা ও চন্দনাদি, অমনি তাহাদের দিকে দৌড় দিলে তাহারা কৃষ্ণ আসিতেছে দেখিয়া সাবধান হইয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ তাহাদের নিকট গিয়া কিছু খাদ্য বা মিষ্টান্ন প্রার্থনা করিল। তাহারা বালকের নধর শরীর ও অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া দেবতার নৈবেদ্য পূজার পূর্ব্বে কেমন করিয়া দিবে তাহার চিন্তায় মগ্ন হইয়া কৃষ্ণরূপের মোহে তাহা বিস্মৃত হইয়া—আনমনে কোনরূপ ওজর আপত্তি না করিয়া ছানা চিনি তাহার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল! কৃষ্ণ মিষ্টান্ন খাইয়া বলিল মালাটা আমার গলায় দাও, আমি ফুলের মালা

পরিয়া মাকে গিয়া দেখাইব যে, তোমরা আমার পূজা করিয়াছ। তাহারা হাসিয়া জনে জনে তাহার গলায় মালা দিয়া চলিয়া গেল!

এইরূপে গোপাল ব্রজের রাস্তাঘাটে, গোঠে মাঠে যাতায়াত আরম্ভ করিয়া সকলকেই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যতই অত্যাচার বাড়িতে লাগিল, গোপালও ততই সকলের আপনার হইতে আপনার হইয়া উঠিল! গোপাল যে এত অত্যাচার করিতেছে, তথাপি গোপালকে না দেখিলে তাহাদের যেন প্রাণ বাঁচেনা! গোপাল আবার আসুক, আবার অত্যাচার করুক, ইহাই তাহাদের কামনা হইয়া দাঁড়াইল! সেই অত্যাচারের মধ্যে গোপালের যে কি মোহনীয়তা তাহা তাহারাও ঠিক করিতে পারিল না, গোপাল কেমন করিয়া তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিতেছে, চিন্তা করিয়াও তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া ভাবিল—"গোপাল অত্যাচার করে, গোপাল ক্ষতি করে, কিন্তু অভাব ত হয় না! গোপাল যে গৃহে যায় সে গৃহে দুধ ঘি যেন উথলিয়া উঠে, মা লক্ষ্মী যেন নানা জাতীয় খাদ্যে সে গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখেন! গোপালের আগমনে রোগ, শোক যেন কোথায় পলায়ন করিয়াছে, জরামৃত্যু যেন দেশছাড়া হইয়াছে,—সর্ব্বত্রই যেন নন্দনকানন—মধুমাসের মধূৎসব! গাভী প্রচুর দুধ দিতেছে, ক্ষেত্রে অজস্র শস্য, বনকাননে গভীর প্রচুর খাদ্য! যমুনার অগাধ জলরাশি কাচস্বচ্ছ ও সুধাময়! গোপালের অত্যচারে ব্রজময় যেন কি এক অপূর্ব্ব উন্নতির অদ্ভুত সাড়া পড়িয়া গিয়াছে!—গোপাল যে গৃহে যায়, সেই গৃহই যেন ধনধান্যে ভরিয়া উঠে! গোপালের আগমনে গৃহ যেন সজীব হইয়া উঠে! পশু পক্ষী বানরগণও যেন তাহার আগমনে আনন্দোৎফুল্ল হয়, আকাশ বাতাসও যেন হর্ষে কম্পিত হইয়া উঠে!"

গোপালকে দেখিয়া ব্রজের গোপালবৃন্দ তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না! গোচারণ হইতে আসিয়া বনজাত কত ফলমূল গোপালের জন্য আনিয়া তাহাকে খাওয়াই যেন কত তৃপ্তি লাভ করে! গোপালও

ব্রজগোপালবৃন্দের আত্যন্তিক অনুরক্তিতে ঘরে আর থাকিতে চায় না। গোচারণে তাহাদের সঙ্গে গিয়া খেলা করিবার বাহনা ধরিয়া মা যশোদাকে উত্যক্ত করিতে লাগিল! গোপালগতপ্রাণ মা যশোদা গোপালকে চক্ষের আড়াল করিয়া কেমন করিয়া প্রাণে বাঁচিবেন, তাহা যেন চিন্তা করিতেও পারিলেন না, নীলমণিকে নানারূপে ভুলাইয়া কোনরূপে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রূপমাধুর্য্যে গোপাল যেন সকলেরই অঞ্চলের নিধি হইয়া উঠিল। মাধুর্য্য ও স্নেহাধিক্যের আকর্ষণে ব্রজবালকগণেরও যেন আর অবসর সহিল না, তাহারা গোপালকে সঙ্গে লইয়া আনন্দ করিবার জন্য অতি প্রত্যূষে যশোদার গৃহে উপস্থিত হইয়া গোষ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল! গোপাল পাইয়া বসিল। মাকে ছাড়িয়া পিতা নন্দের নিকট আবদার ধরিলেন। মহারাজ নন্দ গোপালের আগ্রহে বহুকষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া গোপালের রক্ষকরূপে কয়েকজনকে সঙ্গে দিয়া প্রভূত খাদ্যাদি সহিত ব্রজগোপাল নীলমণিকে রাখালগণের সঙ্গে গোচারণে পাঠাইয়া দিলেন!

গোপালকে সঙ্গে পাইয়া আজ রাখালগণের আনন্দের আর সীমা নাই! তাহারা গোপালকে মধ্যে রাখিয়া গমন করিতে লাগিল। গোপাল মধুর স্বরে বংশীধ্বনি করিলে বৎস্য সহিত গোবৃন্দ ঊর্দ্ধপুচ্ছে গোবিন্দের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং যেন তাহার বংশীধ্বনির মাধুর্য্যে তাহারা আনন্দে বনপ্রদেশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে গোসমুহকে পরিচালনার উৎকৃষ্ট উপায় অবগত হইয়া রাখালগণ অপূর্ব্ব আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল। আরও দেখিল, গোসমুহ বন প্রদেশের বহু নিভৃতস্থানে গমন করিলেও গোপালের বংশীধ্বনি শুনিয়া তাহারা সত্বর দৌড়িয়া আসে; ইহাতে তাহাদের বিস্ময়েরও সীমা রহিল না।

রাখালগণ বাড়ীতে আসিয়া স্ব স্ব পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে

কৃষ্ণের অপূর্ব্ব বংশীধ্বনির অদ্ভুত আকর্ষণের কথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল! তাহারা বলিল কৃষ্ণকে না লইয়া আর আমরা গোচারণে যাইব না। কৃষ্ণের বংশীস্বর শুনিয়া গো সমূহ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে এবং বহু দূর প্রদেশে গমন করিলেও বংশীধ্বনি শুনিয়া প্রবল বেগে দৌড়িয়া আসিয়া কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়। কৃষ্ণের বংশী-ধ্বনির ইঙ্গিত তাঁহারা যেন সুন্দররূপে অবগত হইয়া কৃষ্ণের ইচ্ছানু-সারেই ইতস্ততঃ বিচরণ করে ও যথাকালে সমাগত হয়। মা! কৃষ্ণ অতি শিশু হইলেও কি অদ্ভুত বুদ্ধিবলে গোচারণে গো সমূহকে পরিচালিত করে, আমাদের সঙ্গে এমন অপূর্ব্ব খেলা করে, যা আমরা কখনও হয় ত স্বপ্নেও জানি না। হ্যাঁ মা! এমন খেলা কৃষ্ণ কোথা হইতে শিখিল? তাহার পিতামাতার প্রেরিত সমুদয় মিষ্টান্ন নবনীতাদি আমা-দের সকলকে খাওয়ায়। তাহার শক্তিও কম নয়! আমাদিকে কাঁধে লইয়া দৌড়ে। অত নরম দেহ ওতে এমন শক্তি কেমন করে হ'ল মা? যেদিন হ'তে কৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে গিয়াছে, সে দিন হ'তে যেন আর আমাদের কোন ভয় নাই। কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের এত সাহস বাড়িয়াছে যে, আমরা একা একা বহু দূর বনেও অনায়াসে যেতে পারি। কৃষ্ণ ত অত বালক, তবুও আমাদের এত সাহস কেমন ক'রে হল মা? আমাদের আর কোন ভয় নাই। আমরা গো সমূহকে ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণের সহিত খেলা করি। তাহারা দূর বনে চলিয়া গেলেও কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া দৌড়িয়া আমাদের নিকটে আসে। কৃষ্ণ আমাদের নিকটে থাকিলে আমাদের আর কোন ভয় থাকে না। কৃষ্ণ আমাদের চেয়ে কত ছোট, ওর এত বুদ্ধি কেমন ক'রে হল মা? রাজার ছেলে হলে কি গায়ে জোর আর বুদ্ধি বেশী হয়?

মা বলিলেন—কৃষ্ণ কি আপনাকে রাজার ছেলে ব'লে বলে? বালক বলিল,—না মা, কৃষ্ণ সে সব কথা কিছু বলে না। তার কাছে আমরাই যেন রাজার ছেলের মত আদর পাই—নন্দ মহারাজের ছেলে

বলে, তাই বলচি। সে আমাদিকে কত যত্ন করে খাওয়ায়, আমাদের সঙ্গে খেলা করে, বাঁশী বাজিয়ে গান করে, যমুনার তীরে তীরে আমাদের সঙ্গে বেড়ায়।

মা বলিলেন আমরাও দেখ্‌ছি কৃষ্ণের সঙ্গে কি এক দেবতা আছেন, তিনি কৃষ্ণকে রক্ষা করেন ; তিনিই কৃষ্ণের শরীরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে কৃষ্ণের শক্তি বাড়িয়ে দেন বা কৃষ্ণরূপেই কাজ করেন। কৃষ্ণ বড় সুলক্ষণে ছেলে,—জন্ম সময়ের গুণে যারা সুসময়ে জন্মগ্রহণ করে তাদিকে গ্রহ ও দেবতারা রক্ষা করেন, বল বুদ্ধি ভরসা দেন। তোমাদের বহুভাগ্য যে, তোমরা কৃষ্ণকে সঙ্গী পেয়েছ। কৃষ্ণ তোমাদের সঙ্গী হওয়াতে আমরাও সকল বিষয়ে নির্ভয় হয়েছি। কৃষ্ণসঙ্গগুণে তোমাদের সর্ব্ব বিঘ্ন বিপদ নাশ হবে। তোমরা বাবা! কৃষ্ণকে খুব যত্ন করো, কৃষ্ণের আদেশ পালন করো। কৃষ্ণের মধুর মূর্ত্তি দেখলে আমাদেরই ইচ্ছে হয়, সর্ব্বদা তাকে বুকে ক'রে রাখি। মা যশোদা কৃষ্ণকে তোমাদের সঙ্গে বনে পাঠিয়ে কেমন ক'রে যে বুক ধ'রে থাকে, তা আমরাও যেন চিন্তা করতে পারিনি। কিন্তু কৃষ্ণের আগ্রহে, যশোদা পাছে কৃষ্ণের মনে কোন কষ্ট হয়, এইজন্যে তাকে বনে পাঠিয়ে কৃষ্ণ-সুখ পোষণ করেন। শীঘ্রই ব্রজবৃন্দাবন কৃষ্ণময় হয়ে উঠবে। কৃষ্ণ-সুখবাঞ্ছা ভিন্ন এখানে যেন আর কিছু নাই। কৃষ্ণ যাতে সুখী হয়, এই ইচ্ছে সকলেরই। কৃষ্ণের জন্যে প্রাণ দিতেও যেন কারও দ্বিধা নাই। ধনরত্ন, খাদ্য পানীয়, বিষয় সম্পত্তির ত কথাই নাই,—কৃষ্ণকে অদেয় ব্রজে কারো কিছু নাই। কৃষ্ণের রূপেগুণে মুগ্ধ হয় না, এমন কেহ জগতে আছে বলে মনে হয় না। এমন সর্ব্বজনপ্রিয় ছেলে জগতে জন্মে ব'লে কেহ ধারণা করতেও পারেনা। তোমরা কৃষ্ণের সেবা করতে ভুলো না।

মায়ের মুখে কৃষ্ণের গুণ কথা শুনিতে শুনিতে বালক ঘুমাইয়া পড়িল।

এইরূপে কৃষ্ণ গোচারণে ওস্তাদ হইয়া উঠিলেন। বহু বহু দূর বনেও গো সমূহ বিচরণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ প্রতিদিন যে সমস্ত কার্য্য করিতেন, রাখালগণ বাড়ী আসিয়া জননীগণের নিকট তাহাই বর্ণনা করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিত; এবং তাহাদের বর্ণনা গৃহস্থ সকলেই সমবেত হইয়া শ্রবণ করিতেন।

একদিন তাহারা আসিয়া বলিল, আজ আমরা অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম—আকাশ হইতে কত অপূর্ব্ব ধরণের মানুষ নামিয়া আসিয়া হাতযোড় করিয়া কৃষ্ণের কাছে কত কি বলিতে লাগিল। কেহ অগ্নি-বর্ণ চতুর্ম্মুখ, কেহ দুগ্ধবর্ণ পঞ্চমুখ, কেহ অরুণ-বর্ণা দশভুজা, কেহ চতুর্ভুজা, কেহ সিন্দুরবর্ণ হস্তীশুঁড়, কেহ স্বর্ণবর্ণ ময়ূর-চড়া, কেহ সহস্রচক্ষু বজ্র-হস্ত; তাহাদের দেহ-জ্যোতিঃতে বনপ্রদেশ আলোকিত হইয়া উঠে। এমন কত মানুষ প্রত্যহ আসে। কেহ মায়ের মত কৃষ্ণকে কোলে লইয়া চুম খায়, কেহ হাতযোড় করিয়া হাঁটু গাড়িয়া কি সব বলে। এইরূপে প্রত্যহ আকাশ হইতে কত রঙ্গের কত অপূর্ব্ব সুন্দর সুন্দরীরা উড়িয়া আসিয়া কৃষ্ণকে কত কি বলে কত কাকুতি মিনতি করে।

রাখাল বালকগণ জনক-জননী ও আত্মীয়-স্বজনগণের নিকট কৃষ্ণ সম্বন্ধে অলৌকিক ঘটনার বিষয় বলায় তাহা ক্রমশঃ ব্রজময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল! পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণ সম্বন্ধে কত অলৌকিক তথ্যে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ ছিল, তাহার উপর রাখাল বালকগণের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া কৃষ্ণের উপর ব্রজ-নরনারীর অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও প্রীতি-প্রেম পরি-বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যতই তাহারা ঐরূপ কথা শুনিতে লাগিল, ততই তাহারা প্রগাঢ় অনুরক্তিবশে কৃষ্ণ দর্শনে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার রূপ দর্শন করিয়া মনে মনে তাঁহার অলৌকিক কার্য্য সমুদয়ের সমা-লোচনা করিতে লাগিল; এবং ভাবিল, এত শিশু, এমন কুসুম-কোমল শরীর, ইনি মানব-শিশু হইলে ইঁহার এ সব কার্য্য করিবার

শক্তি কোথায় ?—ইনি মানব নহেন—প্রচ্ছন্ন দেবতা! কোন দেবতা প্রচ্ছন্ন-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন; নতুবা মানব-শিশু ত দূরের কথা, অতি পরাক্রমশালী যুবকও একা কেন, শত সহস্র একত্র হইয়া যাহা সম্পন্ন করিতে স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারে না, এই শিশু অনায়াসেই তাহা সম্পন্ন করিতেছেন! যতই এই সব ভাবিতে-ছেন, ততই তাঁহার প্রতি প্রীতি-প্রেম আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপে কৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে ব্রজের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের অলৌকিক কীর্ত্তিও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গোচারণে গমন করিয়া দূর বন-প্রদেশে ক্রমশঃ তাঁহাকে বহু শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইল।

সমুদ্রগর্ভস্থ চুম্বক-পর্ব্বত যেমন বহুদূর হইতে অয়স্তরণীকে আকর্ষণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করে, ব্রজবাসীরা জানিতেন না যে, তেমনই পৃথিবীর সনাতন-ধর্ম্মের শত্রু অসুরগণকে আকর্ষণ করিয়া সংহার করিবার জন্যই কৃষ্ণ ব্রজ-বালকের ছদ্মবেশে গোকুলে অবস্থান করিতেছেন!

সকলেই অবগত আছেন যে, মথুরার রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংসাসুর ভগিনী দেবকীর বিবাহে বড়ই আনন্দে বর-কন্যাকে অশ্ব-যানে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং অশ্ববল্গা ধারণ করত যাইতেছিল, এমন সময়, অর্দ্ধপথে আকাশবাণী হইল, "কংস তুমি আনন্দ করিতেছ কি?—তোমার এই ভগিনী দেবকীর অষ্টম-গর্ব্ভের সন্তান তোমার প্রাণ সংহার করিবে।" —যেমন এই আকাশবাণী কংসের কর্ণগোচর হইল, অমনি কংস অশ্ব-যান থামাইয়া তদ্দণ্ডেই অসি লইয়া ভগিনীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে কাটিতে উদ্যত হইলে, নবোঢ়া ভগিনী সহসা স্নেহময় ভ্রাতাকে রাক্ষস-মূর্ত্তিতে প্রাণ সংহারের জন্য অসি নিষ্কাসিত করিতে দেখিয়া ভয়ে প্রাণ-পতি বসুদেবকে জড়াইয়া ধরিলেন।

বসুদেব কংসকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কংস দৈব-বাণীর কথা বলিলেন। তাহাতে বসুদেব বলিলেন, ' দেবকীর অষ্টম-গর্ব্ভের সন্তানই যদি তোমার প্রাণ সংহারক, তখন তাহা হইতেই তোমার ভয়ের কারণ ; তুমি বীর বলিয়া বিখ্যাত ; বিশেষতঃ দেবকী তোমার ভগিনী —নারী। নারী—অশস্ত্রা, অসহায়া,— তাহাকে বধ করিলে, তোমার বীর-খ্যাতি বিনষ্ট, নারীবধের পাপ এবং ভগিনীবধেরও নিন্দা হইবে। তবে আমি সত্যবদ্ধ হইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, তোমার ভগিনী দেবকীর গর্ব্ভস্থ সমুদয় সন্তানকে তোমায় দান করিব। তাহা হইলে তোমার জীবনের আশঙ্কা দূর হইবে !

বসুদেবকে জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ও পরম ধর্ম্ম-পরায়ণ জানিয়া কংস অগত্যা লোক-লজ্জার ভয়েও দেবকী হত্যায় ক্ষান্ত হইল !

পরে যথাকালে পাপাত্মা কংস একে একে দেবকীর সমুদয় সন্তানকে হত্যা করিয়া অষ্টমগর্ব্ভের সন্তান বলিয়া যোগমায়াকে পাষাণে আছাড়িয়া হত্যা করিবার জন্য নিক্ষেপ করিলে তখন যোগমায়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া অষ্টভুজ ধারণ করত বলিয়া গেলেন, " রে কংস ! প্রাণভয়ে যাহাকে সংহার করিবার বাসনা করিয়াছিস্ তিনি গোকুলে নন্দালয়ে অবস্থান করিতেছেন। "

এই সংবাদ শুনিয়া কংস পুতনাদি রাক্ষসী ও অঘাদি অসুরকে ব্রজে পাঠাইয়া কৃষ্ণের প্রাণ সংহারের চেষ্টা করিতে লাগিল।

নন্দ মহারাজ রাজকর লইয়া মথুরায় কংস-দরবারে উপস্থিত হইলে বসুদেব ইঙ্গিতে নন্দমহারাজকে সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন। নন্দ কংসকে কর প্রদান করিয়া সত্বর গোকুলে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, বসুদেবের কথা সত্য ; —গোকুলে উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে অমঙ্গলের চিন্তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান্ ছিল,—শকট ভঞ্জন, তাহার উপর পুতনার বিড়ম্বনা ! শিশুর উপর উপদেবতা ও কংসাদি রাক্ষসগণেরও দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহা বুঝিতে

পারিলেন। তজ্জন্য শিশুরক্ষার নিমিত্ত বড়ই চিন্তিত হইয়া দিনরাত কেবল নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া ভয়ে ভয়ে কালযাপন করিতে করিতে লাগিলেন! এদিকে উৎপাতের উৎপাত অতি কোমল শিশুটি বিশ্ব-রাজ্যের উৎপাত আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে একে একে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

মৎপ্রণীত শ্রীকৃষ্ণ (ব্রজ-মথুরা লীলা) নামক পুস্তকে ঐ সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তজ্জন্য তাহা আর এখানে উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের বিস্তৃতিসাধনে বিরত রহিলাম। এ গ্রন্থে সে সমুদয়ের যতটুকু সম্বন্ধ কেবল তাহাই বিবৃত হইবে।

যাহাহউক, তৃণাবর্ত্ত বধ ও যমলার্জ্জুন ভঙ্গ আদি উৎপীড়নের প্রাবল্য দেখিয়া মহারাজ নন্দ উপনন্দাদি গোষ্ঠীসহ বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতে করিলেন এইজন্য যে, তথায় উৎপাত কমই হইবে। কিন্তু ফলে তাহার উল্টাই হইল। বৃন্দাবনে অসুরগণ নানারূপ মূর্ত্তি ধরিয়া নন্দ-নন্দন কৃষ্ণকে হত্যা করিবার চেষ্টা কবিতে লাগিল।

রামকৃষ্ণ-কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, গোবৎস চারণ আরম্ভ করিলেন। এই সুযোগে অসুরগণও বৃন্দাবনের বনে উৎপাত আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, ধেনুকাসুর, প্রলম্বাসুর বধ, কালিয় দমন এবং দাবাগ্নি ভক্ষণ করিলেন। এই সকল সংবাদ, ঘটনার অব্যবহিত পরেই ব্রজময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে লাগিল। রাখালগণ বাড়ীতে আসিয়া কৃষ্ণের এই সব অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-কাহিনী বিবৃত করিয়া প্রকারান্তরে ব্রজবাসী নর-নারীকে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। বিশেষ বিশেষ ঘটনা ব্রজবাসী নরনারীগণ স্বয়ংও প্রত্যক্ষ করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে আকর্ষণের প্রবল মোহে কৃষ্ণের প্রতি সকলেরই প্রীতি-শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা আসিয়া পড়িল। তাঁহারা বুঝিলেন কৃষ্ণ বালক বা মানব নহেন— প্রচ্ছন্ন দেবতা। ব্রজবাসীদের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি বালক-মূর্ত্তিতে ব্রজে

আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহা ভাবিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণও কৃষ্ণকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, আমরা কৃষ্ণকে কি রক্ষা করিব, কৃষ্ণই আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে এবং ভবিষ্যতে রক্ষা করিবে—কৃষ্ণ আমাদের রক্ষক, আমাদের স্বজন, আমাদের পূজ্য, আমাদের বন্ধু, আমাদের জীবন-সর্ব্বস্ব। কৃষ্ণের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। এইরূপে তাঁহারা কৃষ্ণময় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ এখন আর নন্দ যশোদার কৃষ্ণ নহেন, ব্রজবাসী নর-নারীর কৃষ্ণ। কৃষ্ণের সুখ-স্বচ্ছন্দতা— কৃষ্ণের নির্ব্বিঘ্নতার চিন্তা এখন তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িল। কৃষ্ণকে ক্ষণমাত্রও দর্শন না করিলে, যেন তাঁহাদের প্রাণ বাঁচে না।

কৃষ্ণ এইরূপে প্রীতি পাইয়া যেন তাঁহাদের গৃহে গৃহে বিরাজ করিবার জন্য আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন। সে উপায় কি ?—ব্রহ্ম-সম্মোহন।

একদিন ব্রহ্মার মনে সন্দেহ হইল যে, কৃষ্ণ যদি জগৎপতি নারায়ণ, তবে এমন বালকবেশে ব্রজরাখালী করিতেছেন কেন ? যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্—সর্ব্বশক্তিমান্—যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতে পারে, যিনি আপ্তকাম—আত্মারাম, তিনি এত ছোট হইয়া এমন নীচ-বৃত্তি অবলম্বন করিবেন কেন ? অতএব পরীক্ষা করা যউক। ইহা ভাবিয়া ব্রহ্মা একদিন গোবৎস সহিত রাখালগণকে দূর বন-প্রদেশে লইয়া গিয়া, এক পর্ব্বত-গুহায় তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখিলেন। ভাবিলেন, দেখা যাউক, কৃষ্ণ এখন কি করেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কৃষ্ণ রাখালগণকে ডাকিয়া উত্তর পাইলেন না। বংশীধ্বনি করাতেও রাখালগণ ও ধেনুবৎস সমুদয় উপস্থিত হইল না, কেবলমাত্র ধেনুগণ সবেগে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার পরীক্ষার বিষয় অবগত হইলেন, এবং মৃদুহাসি হাসিয়া তন্মূহূর্ত্তেই কৃষ্ণ স্বয়ং সমপরিমিত

গোবৎস সহিত রাখালবৃন্দ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। এক নন্দ-নন্দন যশোদার নীলমণি আজ গো-বৎস ও গোপবালক রাখাল হইয়া গৃহে গৃহে বিরাজিত হইলেন। —ধেনুগণের বৎস-প্রীতি ও রাখাল-জননী-গণের সন্তান-স্নেহ যেন শত সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এত স্নেহ-প্রীতি কেন বাড়িল, তাহা জননীগণ অবধারণ করিতে পারিলেন না। যশোমতীর ন্যায় সন্তানগণে না দেখিয়া জননীগণ অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন! ব্রজ আজ কৃষ্ণময় হইয়া উঠিল! কৃষ্ণ দর্শন কৃষ্ণ স্পর্শন, কৃষ্ণ-কথা চিন্তন ভিন্ন ব্রজ আজ আন-কথা, আন-কাজে মন দিতে পারে না। —কৃষ্ণ আজ ব্রজ-বৃন্দাবন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন! কৃষ্ণের ভাবে, — কৃষ্ণের মাধুর্য্যে,—কৃষ্ণের শৌর্য্য-বীর্য্যে,—কৃষ্ণের সেবা-পরিচর্য্যায় ব্রজে আজ এমন অপূর্ব্ব প্রেম-তরঙ্গ কেন উঠিল, সে চিন্তা করিবার আর কেহ রহিল না! যে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মদিরা পান করে, তাহারা মাতাল বলিবে কাহাকে?

ব্রজের আকাশ-বাতাস, জল-স্থল, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম আজ কৃষ্ণভাবে পূর্ণ—কৃষ্ণপ্রাণ! সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা কৃষ্ণকথালোচনা ভিন্ন আর যেন তাহাদের কোন কাজ নাই। শয়নে, স্বপনে, আহারে-বিহারে, কৃষ্ণই তাহাদের ধ্যান-জ্ঞান! কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের অমা-নুষিক কার্য্য—ব্রজের নারীর চিত্ত অধিকার করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণময় কৃষ্ণময়ী করিয়া ফেলিল। কৃষ্ণ বালক হইলেও সর্ব্বকার্য্যেই তাহারা কৃষ্ণের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ও উপদেশের অনুসরণ করিতে লাগিল। এই-রূপে ব্রজ কৃষ্ণভাবে বিভোর হইয়া উঠিল! কিন্তু গৃহে গৃহে কৃষ্ণের আবির্ভাব হওয়ায় আর কোন জননীই যশোদা-নন্দন কৃষ্ণের দর্শন জন্য আগ্রহশীলা না হইয়া আপন আপন সন্তান-স্নেহেই আকুল হইয়া উঠিলেন! গৃহের কুমার কৃষ্ণ হওয়ায়, গৃহে গৃহে কুমারীগণ কৃষ্ণ-স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া উঠিল! আবার সেই সেই কৃষ্ণের মুখে যশোদানন্দন কৃষ্ণের গুণগান শুনিয়া তাহাদের কৃষ্ণপ্রেম সাগর-

তরঙ্গের ন্যায় বাধারূপ বাঁধ অতিক্রম করিয়া চলিল। কৃষ্ণের প্রতি তাহাদের প্রেমাকাঙ্ক্ষা প্রতি গৃহস্থ-কুমাররূপী-কৃষ্ণ যেন শতগুণ বাড়াইয়া দিতে লাগিল। এইরূপ আনন্দে সম্বৎসর কাটিল। সম্বৎসর পূর্ণ হইলে, ব্রহ্মার কৌতূহল জাগিল,—ব্রজে কৃষ্ণ কি করিতেছেন দেখা যাউক। আসিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণলীলা পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। তিনি যত রাখাল ও গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন, সেই সংখ্যা পূর্ণই আছে। তখন তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক নিজ ত্রুটির উল্লেখ করিয়া স্তব-স্তুতির দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর পর্ব্বতগুহা হইতে রাখালবালক ও গোবৎসগণকে বাহির করিয়া আনিয়া কৃষ্ণকে প্রদান পূর্ব্বক ভ্রান্তির জন্য ত্রুটি স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আনুগত্য জানাইলেন।

কৃষ্ণ সহাস্যে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া নিজের পূর্ব্বরূপ সংহরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে লইয়া আনন্দে ব্রজে গমন করিলেন! এদিকে সেইদিন হইতে ব্রজবাসিনী জননী, নর-নারী, কুমার-কুমারীগণের আকর্ষণ আর নিজ নিজ গৃহে আবদ্ধ না থাকিয়া, আবার যশোদা-নন্দন কৃষ্ণের উপর পড়িল। যশোদা-নন্দন কৃষ্ণকে না দেখিলে তাহাদের প্রাণ বাঁচে না। সেই দিন হইতে আবার তাহারা কৃষ্ণের জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন ও খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়া কৃষ্ণদর্শনে যশোদার গৃহে উপস্থিত হইতে লাগিল। বহুদিন পরে আবার তাহাদিগকে দর্শন করিয়া যশোদা তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। আবার নন্দ-গৃহ ব্রজবাসীগণের আনন্দ-ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। কত কত ব্রজনারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কৃষ্ণের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিতে যশোমতীর গৃহে উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনিও অতি সমাদরে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া যথোচিত সম্মান দানপূর্ব্বক তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করত মিষ্টান্নাদি পাকের দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ব্রজের কুমার-কুমারীরাও আবার যশোদা-নন্দন কৃষ্ণকে দর্শন জন্য পূর্ব্বের ন্যায় আসিতে লাগিল। কেহ ফুল, কেহ ফল, কেহ সর, কেহ ক্ষীর, কেহ নবনীত, কেহ ছানা, কেহ মাখন, কেহ লাড়ু, কেহ কেহ মিষ্টান্নাদি আনিয়া কৃষ্ণের মুখে বা হাতে দিয়া আলাপ ও আনন্দ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বয়োকনিষ্ঠ হইলেও তাঁহাকে সর্ব্ব বিষয়ে প্রাধান্য দানই তাহাদের কার্য্য ও চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। কৃষ্ণ যাহা বলিবে তাহা পালনই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই জ্ঞানই সর্ব্বদা তাহাদিগকে পরিচালিত করিত। আরও তাহারা দেখিত,—কৃষ্ণের বুদ্ধি, কৃষ্ণের বিদ্যা, কৃষ্ণের জ্ঞান ও কৃষ্ণের কার্য্য সর্ব্বদা—সর্ব্বথা সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণ যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই হয়। বিদ্যা-বুদ্ধিতে কাহাকেও কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় দেখা যায় না। কৃষ্ণ নাচে, গানে, হাস্যালাপে ও ক্রীড়ায় যেমন মনোরঞ্জন করে, আর কেহ সেরূপ পারে না। এজন্য কৃষ্ণই তাহাদের একমাত্র নেতা। কুমারীরা কৃষ্ণের লাবণ্য ও অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে যে কত প্রশংসা করিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহারা স্বহস্তে কৃষ্ণকে খাওয়াইয়া এত সুখ পাইত যে, অতি ক্ষুধায় আকণ্ঠ-ভোজন করিয়াও তাহাদের তত তৃপ্তি হইত না। কৃষ্ণ-গুণগানে তাহারা সর্ব্বদাই মুখরিত থাকিত। কৃষ্ণকে গান শুনাইত, কৃষ্ণের গান শুনিত। কৃষ্ণের মুখে হাসি দেখিলে, তাহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। কৃষ্ণ যখন গোচারণে যাইতেন, তখন তাহারা একত্র হইয়া কৃষ্ণ-লীলার অভিনয় করিত। কৃষ্ণের গোচারণ, কৃষ্ণের গান, কৃষ্ণের নাচ, কৃষ্ণের হাসি, কৃষ্ণের চাহনি, কৃষ্ণের বেশভূষা, কৃষ্ণের ননী মাখন চুরি ইত্যাদি তাহাদের অভিনয়ের অঙ্গ হইতে লাগিল। এইরূপে তাহারা কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া যথাতথা কৃষ্ণ-লীলাভিনয় ক্রীড়া করিতে লাগিল। তাহাদের ক্রীড়া দেখিবার জন্য অন্তঃপুরচারিনী বধূগণও আনন্দে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া অভিনয় দর্শন পূর্ব্বক আমোদ উপভোগ করিতে লাগিল। এইরূপে শিশু কৃষ্ণ দূর পল্লী-

প্রদেশেও জনবহুল অভিনয়ের মধ্য দিয়াও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও কৃষ্ণ-রূপ-গুণ শ্রবণ করিয়া, অট্টালিকার চূড়ায় উঠিয়া, কৃষ্ণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এইরূপে কৃষ্ণ-দর্শনের আকুলতা চারিদিকেই বাড়িয়া উঠিল! কেহ কেহ কত ছলে যশোমতীর গৃহে উপস্থিত হইয়া সুযোগমত কৃষ্ণ-দর্শন করিয়াও যাইতে লাগিলেন।

কর্ষতীতি—কৃষ্ণ। যিনি জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সকলকেই আকর্ষণ করেন—তিনিই কৃষ্ণ। তিনি সকলকেই আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সান্নিধ্য-লাভের জন্য আহ্বান করিতেছেন। যাঁহারা ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতী,—তাহারাই সেই আকর্ষণ অনুভব করিয়া, সরল রাস্তায় — সহজ-পথে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জন্ম-কর্ম্ম সফল করিতেন। যাঁহারা দুর্ভাগ্য তাঁহারাই পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে!—তাহারাও যাইবে তবে বিলম্বে।

কৃষ্ণের আকর্ষণে চুরাশী ক্রোশ ব্রজের আর কেহ বাকী রহিল না, একে একে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যে ব্রজবালাগণ এমনই মুগ্ধ হইল যে, তাহারা কেমন করিয়া কৃষ্ণকে আত্মসাৎ করা যায়, তদ্বিষয়েই মন্ত্রণা করিতে লাগিল। নারী— পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু, সকলকেই ভালবাসে বটে, কিন্তু স্বামী বা পতিকে যেমন আপনার বলিয়া ভাবে, জগতে তেমন আর দ্বিতীয় নাই। মনোমত পতিলাভের জন্য বাল্যকাল হইতেই তাহারা শিবপূজা করে এই জন্য যে, আশুতোষের ন্যায় এমন সহজ বরদাতা আর কেহ নাই। নারীর প্রধান কর্ত্তব্যই যেন বরান্বেষণ। তা স্বতঃ পরতঃ যে দিক দিয়াই হউক, সে যেন তদন্বেষণে নিরত থাকে। ইহা নারীর স্বভাব,— জন্মগত অনুপ্রেরণা। তাহার উপর কৃষ্ণের আকর্ষণ। সে আকর্ষণ প্রতিরোধ করা জগতে কাহার সাধ্য? কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিবার সাধ্য যে ব্রজ-বালকদের নাই, কৃষ্ণই যে

তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক, কৃষ্ণের রূপে মুগ্ধ হইয়া, কেমন করিয়া তাহাদের কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ঘটে, সেই চিন্তায় সকলে সমবেত হইয়া, এক উপায় স্থির করিল। এই উপায় স্থির করিল যে, কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত তাহাদের জীবন বৃথা।

যুবক-যুবতী মধুরভাবে, বালক-বালিকা ক্রীড়াসঙ্গীরূপে কৃষ্ণ-সম্ভোগ বাসনায় যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কেবল পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল, কেমন করিয়া কিভাবে কৃষ্ণসেবা করা যায়। নর অপেক্ষা নারীগণ ভাব-প্রবণা বেশী—ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। কুমারগণ তাঁহার সখা এবং কুমারীগণ তাঁহার সখীত্বের সেবা-বাসনায় মনে মনে আত্মোৎ-সর্গ করিল। সখাগণ সহজেই তাহার সান্নিধ্যলাভ করিয়া, শয়ন, ভ্রমণ, ভোজন ও আলাপে বাসনা চরিতার্থ করিতে লাগিল। কুমারীগণ মুস্কিলে পড়িল,—কেমন করিয়া তাহাদের বাসনা সফল হয়। কৃষ্ণ অষ্টম বর্ষের বালক; লোকতঃ তাহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া, আলাপ ও ক্রীড়াদিতে কোন বাধা নাই বটে, কিন্তু ভাব-প্রবণা ব্রজবালাগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। যেহেতু তাহারা বুঝিয়াছিল,—কৃষ্ণ মানব-শিশু নহেন। কৃষ্ণ ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান্—পরম পুরুষ! তাই—বালকোচিত আলাপ-পরিচয় ও ক্রীড়াদিতে তাহাদের প্রীতি জন্মে নাই। তাহাদের প্রীতি জন্মিয়াছিল—আত্মদানের আগ্রহে! এমন সরল সহজ, পরম-পুরুষকে, আপনাদের অন্তরঙ্গরূপে পাইয়া, পরম-পুরুষার্থে বঞ্চিত থাকিব? জন্ম-কর্ম্ম সফল করিতে কে না সচেষ্ট হয়? ভগবানে আত্মদানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোগ,—ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। তাহারা সেই উপায় অবলম্বন জন্য, মাতা কাত্যায়নীর শরণাপন্ন হইলেন। তদনুযায়ী শত শত গোপ কুমারী মন্ত্রণা করিয়া অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিবস হইতেই যমুনা পুলিনে সমাগত হইয়া, বালির দ্বারা মা কাত্যায়নীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, ব্রতা-

চরণ পূর্ব্বক পূজারম্ভ করিল।

ভারতের বৈশিষ্ট্য এইখানে। পরম-পুরুষকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় ধর্ম্মাচারিনী কুমারীগণ, মহামায়ার মহাশক্তির উপাসনায় নিরত হইল,—ধর্ম্মলাভ জন্য। ইহারা যে সরল—সহজভাবে অনুপ্রাণিত, কোন দ্বিধা, কোন কুভাব নাই, কাত্যায়নী ব্রতই তাহার প্রমাণ। কেহ ব্রত করিয়া, পরমেশ্বরী জগন্মাতার উপাসনা করত পাপবাঞ্ছা-পূরণের কল্পনাও করে না। ভগবান্ ভগবতীকে সকলেই সর্ব্বপাপের শাস্তিদাতা বলিয়াই জানে। সুতরাং কেহ তাঁহাদিগের উপাসনা করিয়া তাঁহাদিগকে পাপকার্য্যের সহায়তা করার কল্পনার সাহস করিতে পারে না। তাহার উপর—একজন, দুইজন, দশজন, বিশজন নহে,—শতে শতে, সহস্রে সহস্রে, দলবদ্ধ হইয়া একজনকে প্রাপ্তির উপাসনা,—নিজ-স্বার্থ সংসাধনের অনুপ্রাণনা নহে। সেই সংগোপন-ব্রত কেবল-মাত্র কুমারী ব্রজ-গোপীদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। মা কাত্যায়নীকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহারা তাহাদের মনের বাসনা জানায় নাই।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধিশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥

ইহাই তাহাদের একমাত্র কাম্য মন্ত্র। তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা নন্দগোপসুত কৃষ্ণকেই তাহাদের পতি করিয়া দাও।

সহস্রে সহস্রে মিলিয়া একজনকে যাহারা পতি কামনা করিতেছে, নিশ্চয়ই তাহারা তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়াই জানে। পাপ-কলুষিত-চিত্ত কখনই তাহার কাম্যকে অন্যকে প্রদান করিতে পারে না। কারণ,—তাহার স্বার্থ,—তাহাকে সে পুরামাত্রায় সম্ভোগ করিবে, অন্যে তাহার প্রার্থী হইলে তাহার সম্ভোগের ব্যাঘাত ঘটিবে। কিন্তু ভগবান্‌কে সম্ভোগে কাহারও বাধা নাই বা কেহ বাধা দিতে পারে না। সহস্রে সহস্রে কেন, কোটিতে কোটিতে একত্র হইয়াও তাঁহাকে সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিত্যই জানাইতেছে। আবার,—যেখানে ভগবান্,

সেখানে পাপ তিষ্ঠিতে পারে না।

এইরূপে একের পর এক করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের ত্রিশটী দিন গোপ-কুমারীগণ হবিষ্যান্নাদির দ্বারা সংযত থাকিয়া মহামায়া কাত্যায়নীর পূজা শেষ করিলেন। সংক্রান্তির দিনই তাহাদের ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। এই দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সকলে যমুনাপুলিনে সমাগত হইলেন এবং ঐকান্তিক ভক্তিভরে মহাযোগিনীর অধিশ্বরী জগন্মাতা পার্ব্বতীর পূজা করিয়া ব্রতফল-কামনায় সর্ব্বান্তঃকরণে দেবীর করুণা ভিক্ষা করত নানা রঙ্গের সহস্র সহস্র পরিহিত বস্ত্র তীরে রাখিয়া, নগ্নাবস্থায় সকলেই যমুনাসলিলে অবগাহন পূর্ব্বক জল-ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। যমুনার জল যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! অপূর্ব্ব-সুন্দরী সহস্র সহস্র কুমারীর আনন্দোচ্ছ্বাসে যমুনা মুখরিত হইয়া উঠিল! মহামায়ার প্রীতি-স্তবে যমুনা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সম্মিলিত কণ্ঠের অপূর্ব্ব সঙ্গীতে বৃন্দাবনে আনন্দরোল উঠিল! যমুনার কাচ-স্বচ্ছ সুশীতল সলিলে কুমারীগণ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া, ভ্রমর-পরিবেষ্টিত পদ্মের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত হইল। আনন্দের আবেগে ক্ষণে ক্ষণে, উল্লম্ফন দ্বারা সলিল হইতে আকোটি উত্থিত হইতে লাগিল! মনে হইল যেন সহস্র সহস্র চন্দ্র কুর্ম্ম-মৎস্যাদি জলচরদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষার্থ উল্লম্ফন করিয়া পলায়ন করিতেছে! অথবা সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত এক চন্দ্রকে লজ্জা দিবার জন্য যমুনা-মন্থনে সহস্র সহস্র চন্দ্রের উদ্ভব হইতেছে! ভ্রমর-গুঞ্জিত, কুঞ্চিত সুচিক্কণ কেশকলাপ যমুনা সলিলে সমুদ্ভাসিত হইয়া বদন-রূপ পূর্ণিমার নবোদিত চন্দ্রের অপূর্ব্ব শান্ত-জ্যোতিঃ-সাগরে, বায়ুচঞ্চল শৈবাল সমাচ্ছন্ন কুমুদিনীর ন্যায় ক্রীড়া করিতেছিল।

সে উল্লম্ফন, সে হাস্য-পরিহাস, সে গান, সে চঞ্চলতা, সে আনন্দ, সে উচ্ছ্বাস—অপূর্ব্ব! অনাস্বাদিতপূর্ব্ব!! তাহাতে তাহারা আত্মহারা! যেন কি এক অপূর্ব্ব—অভূতপূর্ব্ব আনন্দে নিমগ্ন!

এই প্রকার আনন্দোচ্ছ্বাসে কত সময় অতীত হইয়াছে, সে জ্ঞান তাহাদের নাই। তাহাদের এই প্রকার আনন্দ-বিহ্বলতার মধ্যে সপ্তম-বর্ষীয় বালক শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণের সহিত আসিয়া যমুনা পুলিনে সংরক্ষিত গোপকুমারীদিগের বস্ত্র সমুদয় হরণ করিয়া, কেলিকদম্ববৃক্ষে আরোহণ করত শাখায় শাখায় তাহা স্থাপন করিলেন। গোপকন্যাগণ এতই উল্লাসমত্ত ও পরস্পর কথোপকথনে নিরত যে তাহাও দেখিতে পাইলেন না।

বস্ত্রহরণ।

অনন্তর কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষ হইতে বাঁশী বাজাইলে, তাহাদের দৃষ্টি সে-দিকে আকৃষ্ট হইল। তখন তাহারা দেখিল,—কদম্ববৃক্ষে নানা রঙ্গের বস্ত্র সুশোভিত হইয়াছে। যমুনা পুলিনে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের বস্ত্র সমুদয় তথায় নাই, তাহা দেখিয়া তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিল! শিশু-কৃষ্ণকে বৃক্ষে সমারূঢ় দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করত অপূর্ব্ব হাস্যের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সকলেই যমুনা-সলিলে নিমগ্ন হইয়া তাহার বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিল। কৃষ্ণ তাহাদের ভাব দেখিয়া তাহাদের লজ্জাশীলতার অর্থ অবধারণ করত তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— "হে কুমারিগণ! তোমরা ব্রতাচরণ করিয়া উলঙ্গ হইয়া সলিলে অবগাহন করত ব্রত-নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছ, তজ্জন্য বরুণদেব রুষ্ট হইয়াছেন। তোমাদিগকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অতএব সলিল হইতে তীরে উত্থিত হইয়া আমার দিকে সম্মুখ করত সংযুক্ত-করদ্বয় ললাট স্পর্শ করাইয়া বরুণ-দেবকে প্রণাম কর।

তাহা শুনিয়া গোপকন্যাগণ বলিল, "এ কি কথা! আমরা উলঙ্গ হইয়া কেমন করিয়া সলিল হইতে গাত্রোত্থান করিব? তুমি আমাদের বস্ত্র দাও,—আমরা বিবস্ত্রা হইয়া তীরে উঠিতে পারিব না। তোমার এ অত্যাচার কেন? তুমি নন্দ মহারাজের স্নেহাতিশয্যে বড়ই অত্যাচারী

হইয়া উঠিয়াছ,—চৌর্য্য তোমার স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে! রাখাল-গণের সহায়তায়, দুষ্কর্ম্মে নির্ভয় ও অতিশয় পটু হইয়া পড়িয়াছ। নন্দ মহারাজ তোমায় শাসন করিয়া উঠিতে না পারিলে, আমরা মহা-রাজ কংসের নিকট আমাদের অভিযোগ উপস্থাপিত করিব।”

কৃষ্ণ বলিলেন— আচ্ছা, তাহাই হউক ; আমি রাখালগণকে ডাকিয়া, সমুদয় বস্ত্র লইয়া চলিলাম,—তোমরা কংসের নিকট অভি-যোগ করিতে যাও।

ইহা বলিয়া—তিনি বস্ত্র আহরণ করিতে আরম্ভ করিলে, গোপকন্যা-গণ চিন্তিত হইয়া বলিল, “ না না,—আমরা তাহা বলিতেছি না,— বলিতেছি এই যে, তুমি নন্দ-নন্দন রাজপুত্র! সর্ব্ববিষয়েই তোমার আদর্শতার প্রয়োজন। তুমি হীন আদর্শ হইলে লজ্জা ত তোমার পিতা মাতারই! একদিন তুমিও রাজা হইবে। রাজার কর্ত্তব্য প্রজারঞ্জন। তুমি এমন দুষ্ট রাজা হইলে, আমাদিগকে ব্রজ ত্যাগ করিয়া কংসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা ত তাহা চাহি না। আমরা চাই, —তুমি সভ্য-ভব্য হইয়া, আমাদের মনোরঞ্জন কর এবং আমরাও আমাদের রাজার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রেম-প্রীতি উপহার দিয়া কর্ত্তব্য পালন করি।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “ অয়ি! মনোরমে প্রকৃতিবর্গ! আমায় যদি তদ্রূপই মনে করিয়া থাক, তবে অবিলম্বে আমার আদেশ পালন কর। আমি যখন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তখন তোমরা আমার আদেশ পালন না করিলে, আমি তোমাদিগের যে কোন শাস্তি বিধান করিতে পারি।

তাহা শুনিয়া ব্রজ-কুমারীগণ বলিল, “ রক্ষা কর! তুমি— স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়, অজ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান্। তোমার আদেশ জগতের জল-স্থল, বায়ু-অগ্নি, সকলেই নতমস্তকে পালন করে, আমরা ত কোন ছার! আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা কুল-রমণী, আমাদিগকে যে আদেশ করিতেছ, তাহা আমাদের কুল-শীল ও

লজ্জার প্রতিকূল ! তুমিই বল আমাদের কর্ত্তব্য কি ?

কৃষ্ণ বলিলেন—' হে ব্রতাচারিণিগণ ! তোমাদের ব্রতের উদ্দেশ্য আমি অবগত হইয়াছি। আমি যে আদেশ করিতেছি অবশ্যই তাহার হেতু আছে। তোমাদের ব্রতের শেষ ফলদান জন্যই আমি উপস্থিত হইয়াছি। তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে গ্রহণ করাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা সর্ব্বপ্রকারে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় যাহাতে ভগবৎসেবার উপযোগী হও, ইহাই আমার ইচ্ছা। ভগবান্‌কে লোকে যাহা দান করে, তাহা সর্ব্ব প্রকারেই অক্ষুণ্ণ ! খুঁতযুক্ত বা দূষিত পদার্থ কেহই ভগবান্‌কে দান করে না। তোমরা বাস্তবিকই তদ্রূপ অক্ষুণ্ণ হইয়া ভগবান্‌কে আত্ম-সমর্পণ করিতেছ কি না তাহার পরীক্ষাও প্রয়োজন। আরও দেখ,—আমি যাহাদিগকে গ্রহণ করি, তাহাদের কোন খুঁত বা দোষ রাখি না। ভগবান্ লাভ করিতে হইলে পাশ বিমুক্ত হওয়া চাই। লজ্জাও অষ্ট পাশের এক পাশ। তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ কর। ভগবানে আত্ম-সমর্পণ না করিলে কামনার সাফল্যলাভ হয় না। তোমরা সর্ব্বপাশ বিমুক্ত হইলেও এখনও লজ্জাপাশ তোমাদিগকে ম্রিয়মান্ করিয়া রাখিয়াছে। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদ্রষ্টা হইলেও ভক্তকে বাহ্য পরীক্ষা দান করিতে হয়। যাহাকে ভগবান্ দয়া করেন তাহার প্রতি সকলেরই কৃপা হয়। তজ্জন্য ভগবানের উদ্দেশ্যেই কৃতাঞ্জলিপুটহস্ত ললাট স্পর্শ করাইয়া কৃতপাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর।

কৃষ্ণগুণগানকারিনী লজ্জাশীলা ব্রজকুমারীগণ কৃষ্ণের কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কলের পুতুলের ন্যায় কৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহাই করিতে লাগিল। (মৎপ্রণীত শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত ব্রজমথুরা-লীলার বস্ত্রহরণ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

তদ্রূপ করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে শুদ্ধাচারিণী জানিয়া প্রসন্ন

বদনে বলিলেন হে কুমারিগণ! তোমাদের ব্রতের উদ্দেশ্য আমি অবগত আছি। তোমাদের ব্রত পূর্ণ হইয়াছে। আগামী শরৎকালে তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে। তোমরা লজ্জা প্রযুক্ত তাহা না বলিলেও আমি তাহা জানি ও স্বীকৃত হইলাম। এক্ষণে তোমরা ব্রজে গমন কর।

কৃষ্ণ বাক্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহারা তাঁহার পদদ্বয় ধ্যান করিতে করিতে স্ব স্ব বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন।

গোবর্দ্ধন ধারণ।

বস্ত্র হরণের পর ব্রজবালাগণ কৃষ্ণের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়া দিন গণনায় আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের রুদ্ধ প্রেমস্রোত কোন পথ দিয়া কেমন করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মসাগরে প্রবাহিত করিবে, কেবল তাহারই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। চিন্তার প্রাখর্য্যে তাহাদের চাপল্য কতকটা সংযত হইলে তাহারা গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ পূর্ব্বক দধি, দুগ্ধ মন্থন ও দুগ্ধ, ক্ষীর ও ছানাজাত নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত শিক্ষা করিতে লাগিল। যতই তাহারা উত্তম হইতে অত্যুত্তম খাদ্য প্রস্তুত শিক্ষা করিতে লাগিল, ততই তাহাদের কৃষ্ণকে তাহা ভক্ষণ করাইবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। কৃষ্ণ আসিয়া কেমন করিয়া তাহাদের দুগ্ধজাত মিষ্টান্নাদি কাড়িয়া খায় তাহার সুযোগ করিয়া দিতে আগ্রহান্বিত হইল।

ঝড়ের পূর্ব্বে বায়ু স্থির হয়। তাহাতে ঝড় যে সন্নিকট, তাহাই সূচিত করে।।

এইরূপে ব্রজে কৃষ্ণ-নীতি, কৃষ্ণ-গীতি ও কৃষ্ণ-প্রীতির বন্যা বহিয়া

যাইতে লাগিল। ব্রজ-বালকগণ গৃহে গৃহে কৃষ্ণের শয়ন, ভ্রমণ, ক্রীড়া, ব্রীড়া, গোচারণ, গোপালন, গোদহন, বৃক্ষারোহণ, পর্ব্বতগুহাপ্রবেশ, একত্র ভোজন, ননীমাখন চুরি, যমুনায় জলক্রীড়া, ব্রজবাসীদের গৃহে উৎপাত ও ব্রজ-কুমারীদিগের উৎপীড়ন প্রভৃতির অভিনয় করিতে লাগিল। ব্রজময় যখন এইরূপ কৃষ্ণ-মহোৎসব চলিতেছে, তখন একদিন নন্দ-মহারাজ ব্রজবাসীদিগকে আদেশ দিলেন যে, সকলেই স্ব স্ব গৃহ হইতে দুগ্ধ, দধি, ছানা, মাখন, নবনীত, ক্ষীর, ফলমূল অক্ষত শর্করা, মিষ্টান্ন ও পুষ্পাদি লইয়া ইন্দ্রপূজার জন্য উপস্থিত হও। আদেশ শুনিয়া সকলেই যথাবিধি উপায়ন লইয়া উপস্থিত হইলে নানাবিধ বাদ্যোৎসবে প্রান্তর-প্রদেশ পরিপূর্ণ হইল।

তাহা শুনিয়া বলদেব সহ কৃষ্ণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া ব্রজবাসী নরনারী, কুমার-কুমারীদের আনন্দের সীমা রহিল না। কৃষ্ণ বালক—অপূর্ব্ব বেশ, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি—যেন আনন্দ-সিন্ধু কেন্দ্রীভূত ও অক্ষিতে সীমাবদ্ধ হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে! কৃষ্ণ উপস্থিত হইলেই চতুর্দ্দিক হইতে সকলেই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল! যেন কৃষ্ণ পূজার জন্যই উপায়ন লইয়া আজ সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে! যেন কৃষ্ণ একবার ইঙ্গিত করিলে অমনই সকলে সমস্ত উপহার তাঁহার পদ-কমলে ঢালিয়া দিয়া কৃতকৃতার্থ হয়!

বালক কৃষ্ণ শত সহস্র ব্রজ-নরনারী কর্ত্তৃক সমানীত নৈবেদ্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া হাসিতে হাসিতে পিতা নন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা! আজ কিসের মহোৎসব?' নন্দ বলিলেন—'আজ ইন্দ্রপূজা মহোৎসব!'

কৃষ্ণ—'ইন্দ্রপূজা করিলে কি হয়?'

নন্দ—'ইন্দ্র মেঘের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তাঁহার পূজা করিলে সুবৃষ্টি হয়! তাহাতে উত্তম শস্য জন্মে। বন-জঙ্গল তৃণ-গুল্ম লতায়

পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহা ভক্ষণ করিয়া আমাদের গবাদি জীবন ধারণ করে। গোধনই আমাদের একমাত্র সম্বল।

কৃষ্ণ—তাহা যদি হয় তবে গোবৰ্দ্ধন পর্ব্বতের পূজা করাই শ্রেয়ঃ। কারণ গোবৰ্দ্ধনই আমাদের গবাদির সম্বৎসরের খাদ্য যোগাইয়া থাকে। আরও, ইন্দ্রাদেশে মেঘ বারি বর্ষণ করে বলিয়া কে বলিল? ভগবানের নিয়মে মেঘ বৃষ্টি বা বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। আরও এক কথা—ইন্দ্রের পূজা করিলে ইন্দ্র কি সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া পূজোপহার গ্রহণ করেন?

নন্দ—না, তাহা নহে। তবে ইন্দ্রপূজা আমাদের কৌলিক ব্রত। এই জন্যই আমরা পূর্ব্বাপর ইহা করিয়া আসিতেছি।

কৃষ্ণ—যে দেবতা সাক্ষাৎ দর্শন দেন না, সে দেবতার পূজার আবশ্যক নাই। তিনি যদি নৈবেদ্য ভক্ষণ না করেন, তবে তাঁহার পূজা ঠিক হইল কি না তাহাও জানা যায় না, এজন্য গোবৰ্দ্ধনের পূজাই আমাদের কর্ত্তব্য। গোবৰ্দ্ধন স্বয়ং দর্শন দিয়া নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। অতএব গোবৰ্দ্ধনের পূজার জন্যই সকলে যাত্রা করুন।

বালক কৃষ্ণের মুখে কৃষ্ণগত-প্রাণ পিতা নন্দ গোবৰ্দ্ধনের পূজার প্রশংসা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সকলেই গোবৰ্দ্ধন পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া মহামহোৎসবে পূজা আরম্ভ করিলেন। বলির দ্রব্য সমূহ স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল।

পূজা সমাপ্ত হইলে গোবৰ্দ্ধন বিশেষ প্রীত হইয়া আকাশস্পর্শী বিরাটরূপে দর্শন দিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করত নৈবেদ্য সমুদয় উদরস্থ করিতে লাগিলেন। ব্রজনরনারীগণ আনন্দে উথলিয়া উঠিয়া গোবৰ্দ্ধন-রূপী কৃষ্ণকে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, নানাবিধ ভোজ্য প্রদান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে লাগিলেন। ভোজন সমাপনান্তে গোবৰ্দ্ধন অদৃশ্য হইলে সকলে গৃহে আগমনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়

ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সম্বর্ত্তক নামক মেঘদিগকে আদেশ দিলেন—এখনই প্রচুর বারি বর্ষণে ব্রজভূমিকে জলরাশিতে ভাসাইয়া দাও।

আদেশ প্রাপ্তি মাত্রেই মেঘজাল সহসা আকাশে উদিত হইয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল। নন্দ মহারাজ ইন্দ্রের ক্রোধ দেখিয়া ভীত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভয় নাই, সমুদয় ব্রজনরনারীকেই গোবর্দ্ধন রক্ষা করিবেন। ইহা বলিয়া তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উৎপাটন পূর্ব্বক বাম হস্তে ধারণ করিলেন। ব্রজনরনারীগণ পুত্র কন্যাদিসহ সেই গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র সাত দিন সাত রাত্রি মুষলধারে বারিপাত করিয়া ব্রজভূমি ডুবাইয়া দিলেন। মুহুর্ম্মুহুঃ অশনিপাতে ব্রজবাসীদিগকে আকুল করিয়া তুলিল। বালক কৃষ্ণ একাদিক্রমে সাত দিন সাত রাত্রি অনায়াসে অক্লেশে ছত্রকের ন্যায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় ইন্দ্র প্রচুর শক্তি প্রয়োগ করিয়াও যখন কিছুই করিতে পারিল না, তখন তাঁহার চৈতন্য হইল! তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম জানিয়া নতজানু হইয়া তাঁহার স্তব করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করত পলায়ন করিলেন।

কৃষ্ণ দেখাইলেন—ব্রজবৃন্দাবনে কৃষ্ণ ব্যতীত ব্রজবাসীদের আর কেহই উপাস্য নাই। সর্ব্বদেবদেব কৃষ্ণই তাহাদের সর্ব্বস্ব! কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহই তাহাদের ভজনের বস্তু নহে। আর এক কাণ্ড ঘটিল—চক্ষের সমক্ষে এতবড় এক অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া তাহারা সকলেই বুঝিল, কৃষ্ণ ব্যতীত তাহাদের উপাস্য যেমন অন্য কেহ নাই, তদ্রূপ কৃষ্ণের উপরও আর কেহ বড় দেবতা নাই। কৃষ্ণ ইচ্ছাময়—সর্ব্বশক্তিমান্। ইঁহার শৈশব, কৌমার্য্য, যৌবন বলিয়া কিছুই নাই। ইঁহার যাহা ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ ইনি তাহাই হইতে পারেন। নতুবা মানুষের কি সাধ্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উৎপাটন করিয়া সাতদিন সাতরাত্রি বামহস্তে ধারণ করে? কৃষ্ণের স্বরূপ অবগত হইয়া আজ আমরা

ধন্য হইলাম। কৃষ্ণকে দুষ্ট বালক জ্ঞানে মন্দ বলিয়া কত অপরাধ করিয়াছি। কৃষ্ণ!—আজ তুমি তোমার অজ্ঞান অপরাধীদিগকে ক্ষমা কর! আজ হইতে আমরা তোমার। আমাদের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তোমার দাসদাসী হইলাম। তুমি যে কি বিরাট— তাহা গোবর্দ্ধনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখাইয়াছ। আবার তুমি কত ক্ষুদ্র, তাহা ব্রজের কৃষ্ণ রূপেই প্রদর্শন করিতেছ। আর ত আমরা অপেক্ষা করিতে পারি না, —তুমি আগুন্তমধ্যরহিত বিরাট পুরুষ। আমরা তোমার সান্নিধ্য পাইয়া আর হেলায় তোমার সেবা পরিত্যাগ করিব না। এখন হইতে আমরা সকলে তোমার হইলাম। রূপ-যৌবন, ধন-জন, সকলই তোমায় দিলাম। সকলই তোমার জানিয়া তৎসমুদয় তোমায় অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

সকলেই একান্তমনে ভয়-ভক্তি ও প্রীতিতে আকুল হইয়া মনে মনে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতেছেন, এমন সময় মেঘ কাটিয়া গেল। প্রখর রৌদ্রে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে ব্রজবাসী নরনারীগণ গোবৎসাদির সহিত পর্ব্বত গুহা হইতে বহির্গত হইয়া, ব্রজে স্ব স্ব গৃহে আগমন করিলেন। তাঁহারা বহির্গত হইলে কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া পিতার সহিত ব্রজে আগমন করিলেন।

সেই দিন হইতেই কৃষ্ণ ব্রজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন ; অর্থাৎ কৃষ্ণের ইচ্ছার উপর কথা কহিবার আর কেহ রহিল না। কৃষ্ণপূজার ধূম পড়িয়া গেল! কিন্তু কৃষ্ণের মায়ায় তাঁহারা কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া গেলেন। তবে কৃষ্ণই ব্রজের রক্ষক, এ জ্ঞান পরিস্ফুট হইল ; অর্থাৎ যখন কৃষ্ণ তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিলেন, তখন সকলেরই কৃষ্ণ সম্ভোগের বাসনা জন্মিল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা; যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, সকলেরই মনে কৃষ্ণসেবার স্পৃহা জন্মিল। সেই দিন হইতেই কৃষ্ণ ব্রজের দুলাল হইয়া গৃহে গৃহে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রাণপ্রতিম আত্মজরূপে বিরাজিত হইয়া নিদ্রিত ও জাগরিত হইতে লাগিলেন! এখনও ব্রজবাসী বৃদ্ধা

রমণী উঠান ঝাঁট দিতে দিতে সরল সহজ প্রেমে বলিয়া উঠেন,—'দুলাল! ভোর হইয়াছে, এখনও শুইয়া আছ? উঠ, মুখ ধোও,—রুটি-মিষ্টান্ন ঢাকা আছে, লইয়া খাও!' —কি সরল সহজ বিশ্বাস! এখনও তাঁহাদের গৃহে কৃষ্ণ সেই দুলালরূপেই বিরাজিত!

পূর্ব্বরাগ।

নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ ব্রজবাসীদের জীবন। আবাল-বৃদ্ধ বনিতার প্রাণের সহিত ব্রজ-গোপাল কৃষ্ণের প্রাণের কি যে অপূর্ব্ব সংযোগ তাহা ব্রজবাসী নরনারী যেমন বুঝিত, বালক কৃষ্ণও তেমনই বুঝিতেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, যুবক-যুবতী বালক কৃষ্ণের জন্য কত উপহার লইয়া, নন্দরাজ-গৃহে উপস্থিত হইতেন। মাতা যশোদা, পিতা নন্দ, বালককে ক্রোড়ে লইয়া কত আনন্দে তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া সসম্মানে উপহার গ্রহণ করত বালকের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেন। বালকও যেন তাহাতে উৎফুল্ল হইয়া তাহাদের কোলে কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। তাহারা অত্যধিক সমাদরে কৃষ্ণকে কোলে লইয়া নবনীত কোমল কৃষ্ণগণ্ডে আত্যন্তিক অনুরক্তির সহিত চুম্বন করিয়া যেন কি অমৃতের আস্বাদ পাইয়া ভাবে অবশ হইয়া যাইতেন! সে নেশা তাহাদিগকে এমনই মজগুল করিয়া তুলিয়াছিল যে, দিনান্তে একবারও কৃষ্ণমুখ চুম্বন না করিলে যেন তাহাদের গাত্রে দাহ উপস্থিত হইত। তাহাদের সহিত বালক বালিকাগণও কৃষ্ণ দর্শনে আসিত। কৃষ্ণ তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়া তাহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহারাও বাড়ী হইতে আসিবার সময় কৃষ্ণের জন্য কত ফুল, কত ফল আনিত। কেহ কেহ কৃষ্ণকে ফল খাওয়াইত, কৃষ্ণও তাহাদিগকে ফল খাওয়াইত, প্রীতি প্রেমের সে

আদান প্রদান কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ব্রজে মহানন্দের রোল তুলিয়াছিল!

কেহ কেহ অত্যধিক প্রীতিভরে কৃষ্ণকে বক্ষেঃ চাপিয়া ধরিয়া কি অপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদ পাইত, তাহা তাহারা ভিন্ন অন্যের অজ্ঞাত ছিল। এই দলে ছিল ব্রজকুমারীগণ, বয়োসন্ধির মধ্যস্থা অনুদগত-যৌবনা কুমারীগণ বালক কৃষ্ণকে বক্ষেঃ ধারণ করিয়া মনে মনে যেন কি প্রার্থনা করিত। কৃষ্ণের দৈনন্দিন অসম্ভব কার্য্য অসুর বিনাশাদি বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, গো ও রাখালগণকে ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষার অপূর্ব্ব চাতুরী বা কৌশল, অমিত বল ও নির্ভীকতার বিষয় রাখাল-গণের মুখে শুনিয়া কুমারীগণ আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। সেই সব অমানুষিক কার্য্যই তাহাদিগকে কাত্যায়নী পূজায় প্রণোদনা দান করিয়াছিল। তাহারা বালক কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া শত শত প্রগাঢ় চুম্বনেও আর পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। তাহারা বুঝিল কৃষ্ণ ইচ্ছাময়। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সব হয়। ভক্তানুগ্রহায় মানুষীং তনু-মাশ্রিতম্। —তাহার শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য নাই,—কৃষ্ণ চিরযুবা। কৃষ্ণকে কোলে লইলে ইচ্ছামতীর ইচ্ছা পূর্ণ হয় বলিয়া তাহারা কোন কোন ইচ্ছামতীর নিকট শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিল! তাহারাও নানা ছলে নন্দগৃহে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে লইয়া মনে মনে অসম্ভব বাসনা পূরণের নিবেদন জানাইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহারা এতই অধীর হইয়া উঠিল যে—কৃষ্ণের হাস্য—লাস্য ও চাহনি আদি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইয়া একত্র সমবেত হইয়া অভিনয়চ্ছলে কৃষ্ণপূজায় নিরত হইল। বনপুষ্প, পত্র, ফল তুলিয়া আনিয়া কোন কুমারীকে কৃষ্ণ সাজাইয়া তাহার পূজা করিয়া কৌমার্য্য-চাঞ্চল্যে অপাঙ্গ চাহনি প্রভৃতি দ্বারা প্রীতির অভিনয় করিতে লাগিল। যতই তাহাদের এই ভাব প্রগাঢ় হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে ততই তাহাদের লজ্জানুভব হইতে লাগিল। লজ্জার অগ্রগতি দেখিয়া তাহারা

নিজেরাই বেশ বুঝিল বয়ঃসন্ধির বন্ধন লজ্জা কাটিয়া দিতেছে। লজ্জা তাহাদিগকে যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ-সাগরে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে! তজ্জন্য তাহারা ক্রমশঃ ঘনীভূতভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে দূরে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল; কারণ তাহাদের মনে হইতে লাগিল, কি জানি হয় ত কখন কোন সূত্রে কি নির্লজ্জ ব্যবহার করিয়া ফেলিব!

এইরূপই হয়। মন যতই উদ্দিষ্ট প্রেমাস্পদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে, ততই নানা সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মনে হয়, কোন সূত্রে কেহ বুঝি মনের কথা জানিয়া ফেলিল। আবার, প্রেমাস্পদও বুঝি কোন বেহায়ামি জানিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিল। কোন সূত্রে কেমন করিয়া সযত্নপোষিত বাসনা পাছে আকাঙ্ক্ষিত বিষয় লাভে বিঘ্ন ঘটায়, এই সঙ্কোচে সরমে হৃদয় তখন ভরিয়া উঠে। এই জন্যই সাবধানতা, এই জন্যই দূরে দূরে অবস্থান।

যাহাকে না দেখিলে বাঁচি না, তাহাকে দেখিতেও হইবে, আবার সেই দেখার অন্তরায় হইতে আত্মরক্ষাও করিতে হইবে। যখন এমনই লজ্জা, সরম, ভয় ও সঙ্কোচে হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তখন আকাঙ্ক্ষিতকে পাইবার আশাও তীব্রতর হইয়া উঠিল!—কারণ অভাবই আকাঙ্ক্ষা বাড়ায়। যেহেতু সহজপ্রাপ্য দ্রব্য বা বিষয়ে লোকের আকাঙ্ক্ষা তেমন জাগে না বা তদ্বিষয়ে চিন্তাও আদৌ হয় না। এইহেতু সরমের বাঁধ যখন আকাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তিতে বাধা জন্মাইল, তখন আকাঙ্ক্ষার স্রোত বাঁধ অতিক্রম করিবার জন্য ঘনীভূত হইয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে লাগিল। এইজন্য সকলে মিলিয়া স্থির করিল আর সহ্য হয় না, উপায় অন্বেষণ করিতেই হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সে উপায় কাত্যায়নী ব্রত। ব্রত সমাপ্ত হইলে উদ্দিষ্ট প্রেমাস্পদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে শুদ্ধাচারিণি কুমারিগণ! তোমাদের ব্রতের উদ্দেশ্য আমি

অবগত আছি। আগামী শরৎকালে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তোমরা ভাবের ঘোরে লজ্জাশীলা হইয়া আর আমায় বক্ষেঃ লইয়া চুম্বন করনা, দূরে দূরে অবস্থান কর। সহসা তোমাদের এ লজ্জা আসিল কোথা হইতে? লজ্জা সেবাধর্ম্মের অন্তরায়। এজন্য বসন হরণ করিয়া লজ্জাপাশ দূর করিয়াছি। এখন তোমরা সরমের বাধা অতিক্রম করিয়া তোমাদের বাঞ্ছিতের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে সচেষ্ট হও।

কৃষ্ণ বলপূর্ব্বক কুমারীগণের বসন হরণ করিলেন। যাহারা ভগবল্লাভ প্রয়াসী, ভগবান্ তাহাদের অষ্টপাশ মোচন করেন। কুমারীগণ কৃষ্ণকে বল্লভরূপে লাভ করিবার জন্য আত্মসমর্পণ-প্রয়াসিনী হইয়া ঐকান্তিকচিত্তে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ বা নিবেদন করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহারা সে নিবেদনের অর্থ জানিত না। সুতরাং তাহার মধ্যে নিজস্ব কিছু থাকিলে তিনি তাহা খণ্ডন করিয়া দেন। এই জন্যই গোপ-কুমারীদিগের অলক্ষ্য সঞ্চিত লজ্জাকেও হরণ করিয়া তিনি তাহা-দিগকে অষ্টপাশ মুক্ত করত ভগবৎ-সেবার উপযোগিনী করিলেন।

যাহাকে দেহ সর্ব্বস্ব অর্পণ করা যায় তাহাকে অদেয় কিছু থাকে কি? গোপনীয় বলিয়াই বা কিছু গোপন রাখা যায় কি? তবে কুল-শীলপ্রভবস্য লজ্জার ব্যত্যয় ঘটান বড়ই দুর্ঘট, সেই হিসাবে কুলশীল-সম্পন্না কুমারীদিগের লজ্জা রক্ত মাংসের সহিত জড়িত, তাহা হরণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। আরও রমণীর লজ্জা যদি গেল ত রহিল কি? লজ্জাই যে রমণীর ভূষণ। লজ্জাহীনা রমণীর কুলশীল থাকে না, তাহারা নীচকুলোদ্ভবার সমতুল্য হইয়া যায়। এইজন্য কুলশীলসম্পন্না বংশীয়ার লজ্জাই তাহার বংশ পরিচয়ের গৌরব। তজ্জন্য রমণী সব দিতে পারে, লজ্জা দিতে পারে না। লজ্জা দেওয়া তাহাদের মৃত্যুরও অধিক। কিন্তু যাহাকে লজ্জা দিল, তাহাকে আর অদেয়ও কিছু রহিল না।

এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের আত্ম-সমর্পণের অসম্পূর্ণতার ত্রুটি সংশোধন করাইয়া তাহা সম্পূর্ণ করাইয়া দিলেন। অর্থাৎ সর্ব্ব দোষ ত্রুটি রহিত করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। আর যেমন গ্রহণ অমনই নাড়ীর যোগ অর্থাৎ "তোমার হইলাম" বলিয়া আত্মসমর্পণ। অমনই কৃষ্ণ চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। নন্দনন্দনকে চক্ষের দেখা দেখিয়া যে আনন্দ উপভোগ হইত, সে আনন্দে ভাল মন্দের চিন্তা বা দায়ীত্ব ছিল না। তাহাতে চক্ষের দেখা দেখিলাম, আনন্দোপভোগ করিলাম, গৃহে আসিয়া আহার করিয়া নিদ্রিত হইলাম; আবার দেখার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিলে আবার গিয়া দেখিয়া খানিক আনন্দ করিলাম এই মাত্র ছিল। এখন আর তাহা নাই আমার হইলে তাহার ভাল মন্দের চিন্তা আসিয়াও হৃদয় অধিকার করে। আবার যাহাকে বেশী করিয়া ভালবাসা যায় তাহার অমঙ্গল চিন্তা বেশী করিয়াই মন অধিকার করিয়া বসে।

পরের জন্য পরের চিন্তা হয় কি? পরের ছেলে যখন আপনার হয়, তখনই তাহার ভালমন্দের চিন্তা আসিয়া মন অধিকার করিয়া বসে। যতদিন নন্দনন্দন নন্দ-নন্দন ছিলেন, ততদিন তাঁহার ভালমন্দের চিন্তা এমন করিয়া কুমারীগণের হৃদয়-স্পর্শ করে নাই। কারণ সে পরের ছেলে, তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? তাহার ভালমন্দ ভাবিবার লোক আছে। কিন্তু যাই আমার হইল, আমি তাহার হইলাম, তখন ত আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। স্বতঃই সে চিন্তা আসিয়া মন অধিকার করে।

এখন ব্রজ-কুমারীদিগের চিন্তা-স্রোত পরিবর্ত্তিত ও দৃষ্টি ভিন্নপথে প্রধাবিত হইল। এখন তাহারা কৃষ্ণ-চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল! আকুলতা বাড়িল এই জন্য যে, কৃষ্ণ আপনার হইয়াও হইল না। এক বৎসর অপেক্ষা,—কেমন করিয়া সহা যায়? চিন্তা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই পরস্পরে একত্র হইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

যত দিন যাইতে লাগিল, ততই চিন্তাতিশয্যে আর অন্য পথও দেখিতে পাইল না—পথ না পাইয়া আকুলতা আরও বাড়িতে লাগিল। আবার কখনও কখনও কৃষ্ণপ্রেমে হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিল এই ভাবিয়া যে, কৃষ্ণ ত বালক, সে প্রেমের কি জানে? রাখাল বালকদিগের মুখে কৃষ্ণের অলৌকিক গুণের কথা শুনিয়াছি বটে, আমরা চক্ষে তেমন কি দেখিয়াছি?—আমাদের ব্রত কি বৃথা হইল? কৃষ্ণের কথায় ভুলিয়া আমরা আত্ম-সর্ব্বনাশ করিয়াছি। যেমন এই হতাশভাব অমনই কৃষ্ণ দর্শনের প্রবল আশায় গমনোদ্যোগ! এবং নানা ছলে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া আবার নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার! এইরূপ আকুল চিন্তায় দিন কাটিতে লাগিল! কৃষ্ণ তাহাদিগের হৃদয়ে বল দান জন্য সমুদয় ব্রজ নরনারী আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে একত্র করিয়া গোবর্দ্ধন ধারণ করিলেন। সাত দিন ব্রজ নরনারী সন্তান সন্ততিসহ কৃষ্ণসান্নিধ্যে বাস করিয়া অসীম তৃপ্তিতে কালযাপন করিল। সাত বৎসরের বালকের অশ্রুতপূর্ব্ব শৌর্য্য-বীর্য্য দেখিয়া ভয়, ভক্তি ও প্রেমে আকুল হইয়া সকলেই কৃষ্ণ-পদে নত হইয়া পড়িল।

কৃষ্ণ প্রেয়সী কুমারীগণ কৃষ্ণের অলৌকিক কার্য্য-দর্শন করিয়া নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করত অসীম ধৈর্য্যে কালক্ষেপণের বাসনা করিল,—চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইয়া গেল। কৃষ্ণসান্নিধ্যে সাত দিন অহর্নিশ বাসে তাহাদের হৃদয় অসীম বলে বলীয়ান্ অপূর্ব্ব প্রেমে আকুল হইয়া উঠিল। বুঝিল কৃষ্ণ ইচ্ছাময়, ভগবান্, সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি জরাবার্দ্ধক্য রহিত। শৈশব তাঁহার একটা ছলনামাত্র। তিনি চিরযৌবন-সম্পন্ন। যেন তাহাদিগের হৃদয়ে বলদান জন্যই কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ লীলা।

আধার অনুসারে যোগ ধ্যানের বিকাশ লাভ হয়। ব্রজকুমারীগণ গোবর্দ্ধন ধারণ সময়ে কৃষ্ণের অসীম বীর্য্যবত্তা দর্শনে যেমন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল, তেমনই তাঁহার অপরিসীমরূপ, অপূর্ব্ব চাহনি,

অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্রজপ্রেম দেখিয়া মনে মনে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার পাদ-পদ্মে পুনঃপুনঃ আত্মদান করিয়াও যেন তাহাদের পরিতৃপ্তি হইল না ; তাহাদের মনে হইতে লাগিল—কেমন করিয়া তাঁহার তৃপ্তিসাধন করা যায় ! আত্মদান অপেক্ষাও যদি আরও কিছু থাকে, যাহা দিয়া কৃষ্ণের তৃপ্তির সাধন করা যায়, আমাদের তেমন আর কি আছে ? আমরা যদি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছি তবে আমরা এখনও লোকলজ্জায় ম্রিয়মানা কেন ? অতএব আমরা সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছি বলি কেমন করিয়া ?

তাহাদের মনের ভাব বুঝিয়া কৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, কি আছে আমার মুখে দাও। আমি ত পর্ব্বত ছাড়িতে পারি না, সমুদয় মনোযোগ পর্ব্বত ধারণে নিয়োগ করিয়াছি। অবশ্য দক্ষিণ হস্তে আমি খাইতে পারি বটে, কিন্তু হস্ত চালনায় হয় ত মনো-যোগের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। কারণ আহারের সময় কোনটার পর কি খাইব, কোথায় গিয়া মনোযোগ পড়িবে, আবার মনোযোগের শৈথিল্যে পর্ব্বত হস্তচ্যুত হইয়া সমুদয় ব্রজবাসী ও আমাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

তাহা শুনিয়া কুমারীগণ ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বলিল, না না তাহার প্রয়োজন নাই। তোমায় ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, একথা শুনিতেও মর্ম্মাহত হই, আমরা এত সহস্র আছি, আমরা সকলেই মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, আমরা উপর্য্যুপরি শয়ন করিয়া স্তম্ভ সদৃশ হই, তুমি আমাদের উপর পর্ব্বত রাখিয়া খানিক বিশ্রাম কর, তোমার এ কষ্ট আমরা দেখিতে পারিতেছি না। শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন হে সুমুখিগণ ! তোমরা আমার ব্যথানুভব করিয়া যে ব্যথা পাইতেছ তজ্জন্য আমারও হৃদয়ে তোমাদের ব্যথার ব্যথা লাগিতেছে। এজন্য তোমাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ। তোমরা যে প্রাণ দিয়া পর্ব্বত ধারণের কথা বলিতেছ, তাহাতেও কুলাইবে না ; তোমাদের কোটী কোটী—অসংখ্য কোমলাঙ্গী একত্র হইয়াও পর্ব্বত ধারণে সমর্থ হইবে না। পর্ব্বত-ধারণের এ

মন্ত্র তোমাদের জানা নাই। গুরু-কৃপায় আমি এ মন্ত্র জানি, তাই ছত্রকের ন্যায় অনায়াসে বাম হস্তে ধারণ করিয়া আছি। এ মন্ত্রের বিষয় আমার গুরু সান্দীপনী মুনি মহোদয়ের পত্নী শ্রীমতী যোগমায়া দেবী কতক কতক অবগত আছেন। তোমরা ইহা জানিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিও।

তাহা যাহাই হউক, এখন তোমরা আমায় খাবার দাও আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। তাহা শুনিয়া তাহারা যশোদা ও রোহিণীর নিকট গিয়া ছানা, মাখন, ক্ষীর, সন্দেশ, চিনি লাড়ু, বিবিধ মিষ্টান্ন, লুচি, মোহনভোগ, দুগ্ধ দধি, ফল-মূল রাশি রাশি আনিয়া উপস্থিত করিল। শুধু উপস্থিত নহে, আনিয়াই তাহা তাঁহার বদনে দিতে লাগিল। কুমারীগণের আজ আর আনন্দের সীমা রহিল না; যেন আজ তাঁহাদের জীবন কৃতকৃত্য ও সার্থক হইল এই জন্য যে, প্রাণাধিক প্রিয়তম কৃষ্ণ তাহাদের হাতে আহার করিতেছেন! কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যেই তাহাদের খাদ্য সব ফুরাইল! এ ভীষণ দুর্য্যোগে তাহা আর কোথায়ই বা পাওয়া যাইবে? কৃষ্ণ তখন বদন ব্যাদান করিয়া দাও দাও বলিতেছেন, কুমারীগণ দুঃখিত হইয়া নন্দগৃহিণীকে সমুদয় নিবেদন করিয়া খাদ্য চাহিলেন, তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, কৈ আর ত কিছুই নাই, তবে আমার স্তন্য আছে, বাছা আমার কয়েক দিন স্তন্য পান করে নাই, আমিও বিষম বিপদের আশঙ্কায় ভুলিয়া গিয়াছি! চল চল, আহা! বাছার আমার কতই কষ্ট হইতেছে!

যশোদা বাৎসল্য-স্নেহে অবশ হইয়া ত্বরিত আসিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক যেমন শ্রীকৃষ্ণের মুখে স্তন দিলেন অমনই তাঁহার ক্ষুধার শান্তি হইল, তিনিও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাতার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রজকুমারীগণ মুখে কাপড় দিয়া মিটি মিটি হাসিতে লাগিল। মাতা স্তন্য দান করিয়া

গোপালের মুখে সহস্র চুম্বন পূর্ব্বক তাঁহার জন্য ভোজ্য প্রস্তুত করিতে গমন করিলে কুমারাগণ বলিলেন, কৈ পর্ব্বত ত বামহস্ত হইতে পড়িল না! প্রবল মাতৃভক্ত সন্তানের ন্যায় মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আত্যান্তক অনুরক্তি প্রকাশ করিলে! মা একবার চুম্বন করাতেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল! আমাদের কাছে কেবল খাই-খাই! আমরা আহার যোগাইতে না পারিয়া অপ্রস্তুত! এই যে ভারে ভারে এত খাদ্য মুখে দিলাম তাহা গেল কোথায়? পেট ত এক বিঘৎ!

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন সখিগণ! তোমাদের অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য! আমাকে যে যেমন ভাবে ভালবাসে আমি তাহার নিকট সেইরূপ! আমি যে মায়ের বাল-গোপাল! তাই মায়ের এক চুম্বনেই আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল! তোমরা যে আমায় এত খাওয়াইলে তাহা গেল কোথায়, তাহা ভাবিয়াছ কি? আর এই যে এত বড় পর্ব্বত ধরিয়া রহিয়াছি ইহাতেও কি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে না? লোক-লজ্জা ভাল। আজ হইতে আমি তোমাদের সেবা গ্রহণ করিলাম। তোমরা স্থির হও—অধীরা হইও না। পিতা মাতা গুরুজনদিগের নিকট সংযত থাকিও, হৃদয়ের ভাব কাহাকেও জানিতে দিও না। আজই গোবর্দ্ধন-ধারণের শেষ দিন; তোমাদের জন্যই আমার ইচ্ছায় ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তোমরা সংগোপনে সেই মিলন দিনের জন্য অপেক্ষা কর। তোমাদের ইচ্ছাতেই আমার নবঘনশ্যাম নবীন নটবর বেশ পরিস্ফুট হইবে। তোমরা এখন নিজ নিজ কার্য্যে রত থাকিও।

বস্ত্র হরণ ও গোবর্দ্ধন ধারণের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের এ সমুদয় কথা, এখন তাহাদের মনে হইতেছে! আর মনে হইতেছে নব-সঙ্গ-রসায়নের কত কি অদ্ভুত কল্পনা!—যেন আর অপেক্ষা চলেনা। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি চলিয়া যাইতেছে; মনে হইতেছে দিন যেন আর ফুরায় না—রাত্রি যেন প্রভাত হইতে চায় না!—বুঝি বিপদের দিন এমনই দীর্ঘ হইয়া থাকে। কুমারীগণ প্রভাতের অপেক্ষায় উদগ্রীব

হইয়া উঠেন। রাত্রি তিন দণ্ড থাকিতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক যমুনায় স্নানার্থ সমবেত হন। যমুনা সৈকতে গিয়া বালি দ্বারা কাত্যায়নী মূর্ত্তি প্রস্তুত করত স্নানান্তে পূজা করিয়া তাঁহার অর্ঘ্য লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বিশেষরূপে সজ্জিত হইয়া কৃষ্ণের গোষ্ঠ গমন দর্শন জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে কুমারীগণ গৃহে আসিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধনের পূজার জন্য পুষ্প চয়ন পূর্ব্বক মাল্য রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালকগণসহ গোধন লইয়া গোষ্ঠে গমন করিলে তাহারা অলক্ষ্য হইতে তাহা দর্শনান্তর প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বৃষভানুনন্দিনীর গৃহে গমন করিয়া গোবর্দ্ধন পূজায় নিরত হয়েন। পূজায় কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না। যথাবিধি নৈবেদ্য, শঙ্খঘণ্টাদির বাদ্য ও প্রসাদ বিতরণাদি চলিত। তবে এ পূজায় পূজক বা তন্ত্রধারক অন্য কেহই ছিল না। শ্রীরাধা-সখী ললিতা বিশাখাই পূজা করিতেন, কৃষ্ণা নৈবেদ্য প্রস্তুত, চিত্রলেখা ইন্দুরেখা সংগৃহীত পুষ্পের মাল্য প্রস্তুত ও চন্দ্রাবলী প্রভৃতি শঙ্খ ঘণ্টাদি বাদন করিতে লাগিলেন। আর শ্রীরাধা ধূপ, ধূনা ও পঞ্চ-নীরাজনাদির ব্যবস্থা করিতেন। প্রসাদের লোভে বহু বালক বালিকা শ্রীরাধার গৃহে একত্র হইয়া চব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্যে উদর পূর্ণ করিতে লাগিল। প্রত্যহই উক্ত পূজা উপলক্ষে মহা মহোৎসব হইতে লাগিল। পিতা বৃষভানু কন্যার গোবর্দ্ধন পূজার যথেষ্ট আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। তাহার উৎসাহে দুগ্ধ দধি, ক্ষীর, পায়স, ছানা, ঘৃত ও মিষ্টান্নাদি রাশি রাশি সংগৃহীত ও প্রস্তুত হইয়া কন্যার আনন্দ বর্দ্ধন জন্য নিমন্ত্রিতগণে ভোজন করাইতে লাগিলেন। ঐ নিমন্ত্রণে নন্দ, যশোদা, রোহিণী গোষ্ঠীসহিত পুত্রাদি লইয়া আসিয়া ভূরিভোজনে আনন্দোপভোগ করিয়া যাইতেন। শ্রীরাধার স্বামী অভিমন্যু বা আয়ান, তাঁহার মাতা ও ভগিনী জটিলা কুটিলাও আগমন করিয়া আনন্দোপভোগ করিতেন।

শ্রীরাধার পিতা বৃষভানু মহারাজ নন্দের সখা। তাঁহারও গোধন ও ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। নন্দের অনুরোধে তিনিও বৃন্দাবনের সান্নিধ্যে গোকুলে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেন। বৃন্দাবন হইতে বর্ষাণও অধিক দূর নহে। মহা প্রতাপশালী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী শ্রীরাধার স্বামী অভিমন্যুর রাজপ্রাসাদ বর্ষাণে।

অভিমন্যু পরম শিবভক্ত। শিব পূজায় তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। স্থানে স্থানে শিব মন্দির স্থাপনও তাঁহার আগ্রহাতিশয্যের ফল। আবার যাহারা শিবোপাসক তাঁহারা শক্তিরও পরম ভক্ত। তাঁহাদের ধারণা শক্তিযুক্ত হইয়াই শিব শক্তিশালী। অভিমন্যুও অতুল গোধনের অধিকারী। দধি দুগ্ধ, ছানা, মাখন, ঘৃত নবনীত তাঁহার গৃহে অপরিসীম। প্রত্যহ দলে দলে কত সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার গৃহে সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিতেন। অহরহঃ শিবস্তোত্র উচ্চৈঃস্বরে তালমানলয়ে গীত হইত। হোম ও যজ্ঞাদির আড়ম্বরও বেশ ছিল। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে শিবোৎসবে মহাসমারোহে গোকুল বৃন্দাবন ও বর্ষাণের আবাল বৃদ্ধ বনিতা নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে যোগদান ও ভুরি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইতেন। কৃষ্ণও পিতা মাতার সহিত আসিয়া আয়ান গৃহে শিবভক্তগণে বড়ই উত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিতেন। কাহারও হাড়ের মালা, কাহারও রুদ্রাক্ষ মালা, কাহারও ত্রিশূল, কাহারও শৃঙ্গা, কাহারও বাঘছাল, কাহারও কৌপীন, কাহারও আশাবাড়ী লইয়া কোথায় ফেলিয়া দিতেন। কাহারও প্রলম্বিত জটা কাটিয়া লইতেন, কাহারও ঝোলা লুকাইয়া রাখিতেন, কাহারও বিভূতির পুটলী সংগোপনে দূরে নিক্ষেপ করিতেন। হর হর ব্যোম ব্যোম শব্দ অধিক হইলে বংশীধ্বনি করিয়া তাহাদিগকে চমৎকৃত ও নীরব করিতেন।

বালকের অপূর্ব্ব সৌমমূর্ত্তি ও সঙ্গীতের অসীম শক্তি দেখিয়া সন্ন্যাসীবৃন্দ তাঁহার সমুদয় উৎপাতকে উপেক্ষা করিয়া সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণে স্তব্ধ, মুগ্ধ ও বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও যজ্ঞকুণ্ডে প্রসাব করিয়াও দিতেন। কিন্তু যাজ্ঞিক সন্ন্যাসীবৃন্দ বালকের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া পুনরায় অন্যস্থানে যজ্ঞ করিতেন।

নন্দ যশোদা পুত্রের এই সকল উৎপাতের বিষয় অবগত হইয়া অতি সাবধানে পুত্রকে অভিমন্যু সদনে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তাহা হইত না। নন্দ যশোদা অভিমন্যু গৃহে গমন করিয়া উৎসবের এমন সব কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন যে, নন্দনের সংবাদ লইবার অবসর পাইতেন না।

এদিকে জটিলা কুটিলা ও অভিমন্যুর কর্ণেও কৃষ্ণের অত্যাচারের কাহিনী পৌঁছিত। বালক বোধে অভিমন্যু তাহা উপেক্ষা করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত বা উৎপাত পীড়িত সন্ন্যাসীদিগকে সান্ত্বনা দিয়া প্রচুর ধন দানে সেই সেই দ্রব্য প্রদান করিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত করিতেন। কিন্তু জটিলা কুটিলার ক্রোধ হইত। নানা অমঙ্গল আশঙ্কার ভাণ করিয়া অভিমন্যুকে উত্তেজিত করিয়া বলিত আর নন্দকে নিমন্ত্রণ করিও না। নিমন্ত্রণ করিলেই ঐ "কেলে ছোঁড়াটা" আসিয়া উৎপাত ও অমঙ্গল করিবে। যজ্ঞকুণ্ডে প্রসাব কি কম অমঙ্গলের কথা? আবার শুনিতেছি বৃষভানুর গৃহে বধূ যে উৎসব করে তাহাতেও সে গিয়া নানা উৎপাত করে। বৌ নাকি স্বয়ং তাহাকে নানাবিধ খাদ্য খাওয়ায় এবং তাহারই মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করে, বাহিরে প্রকাশ যে গোবর্দ্ধনের পূজা করিতেছে! ছোঁড়াটা বড় দুষ্টু গো বড় দুষ্টু! দেখ নাই অতটুকু ছেলে অত বড় পর্ব্বতকে সাত দিন বাঁ হাতে ধরিয়া রহিল! ও ছেলেকে কি বিশ্বাস আছে? কখন কি বিপদ

করিয়া বসিবে। কুমারীগণ শিবপূজা করিতে গেলে তাহাদিগকে পথে ঘিরিয়া শিব-নৈবেদ্য কাড়িয়া খায়। শিবের ফুলের মালা কাড়িয়া লইয়া নিজের গলায় দেয়। রাখাল বালকদিগকে সঙ্গে আনিয়া এক যোগে উৎপাত করে। কুমারীদের শিবপূজা দায় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা অতি সঙ্গোপনে শিব পূজায় যায়। সাত বৎসরের ছেলে ইতিমধ্যেই এমন অত্যাচারী হইয়া উঠিল, বয়স হইলে কি "দস্যি" হইয়া উঠিবে তা কে জানে! শুধু গোকুল বৃন্দাবনে নয়,— চুরাশী ক্রোশ জ্বালাচ্চে! এখন বৌকে তার বাপের বাড়ী থেকে এখানে এনে রাখ, —ওকে বিশ্বাস নেই"।

অভিমন্যু হাসিয়া বলিলেন উৎসবের সময় গোলযোগ করিও না। নন্দ মহারাজ ধনে মানে আমাদের সকলের অপেক্ষা বড়। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ না করিয়া কিরূপে উৎসব করা যায়? আরও, বালক কোথায় কি করিল তাহা লক্ষ্য করা বা মনে করা কর্ত্তব্য নহে। বালক ভগবৎ তুল্য! যজ্ঞকুণ্ডে প্রসাব করিলে তাহার নিজেরও অমঙ্গল হয়, এজ্ঞান তাহার থাকিলে কি প্রস্রাব করে? বালকের এজ্ঞান নাই বলিয়া তাহার পাপ নাই এবং দেবতাও তাহাতে রুষ্ট হন না। আরও দেখ, কৃষ্ণ যতই অত্যাচার করুক, যতই দুষ্ট হউক, তাহাকে দেখিলে কাহার না মন-প্রাণ আনন্দিত হয়? তাহাকে কোলে করিতে, তাহাকে ভোজন করাইতে কাহার না প্রবৃত্তি জন্মে?—তাহাকে কোলে করিতে বা ভোজন করাইতে যাহার প্রবৃত্তি হয় সেই ধন্য! তোমরা ও সব কিছু মনে করিও না। ও চির দিন আমাদের এখানে আসিয়া এইরূপ উৎপাত করুক, আমরা সহ্য করিয়া ধন্য হই।

তাহা শুনিয়া জটিলা কুটিলা ক্রোধে "গর-গর" করিয়া বলিল, ছেলেটাকে দেখলে রাগে আমাদের গা জ্বালা করে, আর তোমার দেহ এত ঠাণ্ডা হয়—আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে? দেখছি তুমিই সর্ব্বনাশ করবে। "বালক বালক" করছ, ও বালক নয়। বৌ তার মূর্ত্তি গড়ে

পূজো করছে। তার জন্য স্বহস্তে নাড়ু তৈয়ের করে তাকে খাওয়ায়। বৌটা যেমন মজেছে তুমিও তেমনি মজেছ দেখছি। যে ছেলে অত বড় পর্ব্বতকে সাত দিন হাতে ধরে থাকে সে কি ছেলে?

অভিমন্যু বলিলেন, সে ছেলে নয় ভগবান্! ভগবান্ ভিন্ন কার শক্তি অমন করে পর্ব্বত ধ'রে থাকে? সেই ভগবান্ যদি আমাদের কৃপা করেন, আমাদিগকে পরমাত্মীয় ভাবিয়া এইরূপ উৎপাত করেন, তবে তাহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি আছে? ভগবান্‌কে কে না ভালবাসিতে চায়? তাঁহার কৃপা লাভ করিবার জন্য কাহার না আকাঙ্ক্ষা হয়? একদিন এমন সময় আসিতে পারে, যেদিন সেই ভগবানের উৎপাতকে অসীম সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইবে।

জটিলা বলিল, সর্ব্বনাশ হল, আর মান সম্ভ্রম থাকবে না। বৌয়ের মতন তুমি সেই কেলে ছোঁড়ার আনন্দে গদগদ হয়ে উঠলে! তোমরা স্ত্রী-পুরুষে তাই কর, আমরা না হয় অন্যত্র চলে যাই। আমরা অমন "অসৈরণ" দেখতে পারব না

কুটিলা বলিল—তাই তাই তাই! এই তিন তালি,—আমরা সরেই যাব, নন্দের বেটা ভগবান্! ঐ ভগবান্‌কে নিয়েই তোমরা থাক, বংশ উজ্জ্বল হবে!

অভিমন্যু বলিলেন—বেশ ত তোমাদের বৌকে লইয়া আসিয়া গৃহে রাখ, তোমাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুল!

একদিন শুভক্ষণে মহা সমারোহে বধূ পিত্রালয় হইতে স্বামী গৃহে আগমন করিলেন। বধূর আগমনে বর্ষাণে অভিমন্যু গৃহে মহা মহোৎসব হইল। কিন্তু এবার আর নন্দের নিমন্ত্রণ হইল না। ব্রজ মথুরার সকলেই আসিল—নন্দ যশোদা আসিলেন না। অভিমন্যু জটিলা কুটিলার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াই মহারাজ নন্দকে নিমন্ত্রণ করিলেন না।

শ্রীরাধাও বৃন্দাবনের সান্নিধ্যে আসিবার কামনা করিতেছিলেন, তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। তিনি কতকটা স্বস্থ হইলেন বটে, কিন্তু

নন্দ যশোদার দর্শনের অন্তবায় বুঝিয়া চিন্তিত হইলেন। এমন মহোৎসব, আনন্দরোলে গগন পবন কম্পিত, দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে প্রাসাদে আনন্দস্রোত বহিতেছে, ব্রজ, গোকুল, বৃন্দাবন, বর্ষাণ এমন কি মথুরা হইতেও সহস্র সহস্র জন আসিয়া আনন্দোপভোগ করিতেছে; কিন্তু নন্দনন্দন সহিত নন্দযশোদা আসিলেন না কেন? নিমন্ত্রণ নাই বা হইল, আমরা ত তাঁহাদের আত্মীয়, সেই হিসাবেও ত তাঁহারা আসিতে পারিতেন? বাবাই বা কেমন? বাবাও ত তাঁহাদের না দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন। নন্দ মহারাজ মহামাননীয়। ধনে মানে তাঁহার তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী কে? শুধু তাহাই নহে, এই যে ইন্দ্র সর্ব্বনাশকর উৎপাত ও বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দেশকে ধ্বংস করিবার আয়োজন করিয়াছিল, তাহা হইতে কে রক্ষা করিয়াছিল? সে কৃতজ্ঞাও কি নাই? জানি না সর্ব্বদর্শী ভগবান্ কি করেন! ব্রজ বৃন্দাবনে নন্দনন্দন অপেক্ষা শক্তিশালী আর কে আছে? তিনি ব্যতীত এ রাজ্যে আর দেবতাই বা কে? তিনি সকলকে আত্মসাৎ করিবার জন্য অন্য কোন দেবতার উপাসনা সহ্য করিতে পারেন না। গোবর্দ্ধনরূপে তিনি যে দৃশ্য দেখাইলেন, তাহাতেও মোহমুগ্ধদিগের চৈতন্য হয় না! তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিলে কত আনন্দ তাহা এখনও ইহাদের বোধগম্য হয় নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে তিনি আর কোন দেবতাকে এখানে স্থান দিবেন না। ব্রজ বৃন্দাবনের সকলেই তাঁহার আপন জন। বালক বোধে অবজ্ঞা আর অধিক দিন থাকিবে না। যাহা হউক, আমার গোবর্দ্ধন পূজার কি ব্যবস্থা করা যায়? ইহারা শৈব, গোবর্দ্ধন পূজায় সম্মতি দান করিবে না। এখন অগত্যা শিব পূজারই ভাণ প্রয়োজন। সখিদের সঙ্গে শিব পূজার আয়োজনে মধ্যে মধ্যে মহোৎসব করিলে নন্দযশোদার সহিত নন্দনন্দনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে। ইহা চিন্তা করিয়া শ্রীরাধা নির্জ্জন কক্ষে পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিলেন।

চারিদিকে মহা মহোৎসবের আনন্দ। বধূ দর্শনে অসংখ্য লোকের আগ্রহ। জটিলা কুটিলা বধূকে অন্বেষণ করিয়া এক নির্জ্জন কক্ষে তাঁহার দর্শন পাইয়া বলিল "ওমা! এ কি গো! এত আনন্দ, লোকে বৌ দেখবার জন্যে এত আগ্রহে আকুল, আর বৌ কিনা একটী কোণে লুকাইয়া বসিয়া আছে! মুখে হাসি নাই, যেন কি চিন্তায় বিভোর! এ কি! কি অদৃষ্ট! আজ কত আনন্দে বৌ আনন্দ করবে, না একেবারে নির্জ্জন বাস! কারো সঙ্গে কথা নাই! কত লোকে বৌয়ের সঙ্গে কথা ক'য়ে আনন্দ করবে বলে এসেচে, ওমা এ কি গো! বৌ বাপের বাড়ীতে উৎসবে কত আনন্দ করত, আর এখানে একবারে বোবা!

বধূ বলিলেন আপনারা কি করিতে বলেন?

কুটিলা—লোক জনের সঙ্গে কথা কও, আনন্দ কর।

বধূ—বধূর কি উচিত অন্য লোকের সঙ্গে কথা কহা?

"বহুড়ীকে ভালা চুপই" কি নীতি নহে?

জটিলা—যারা তোমাকে দেখে আনন্দ কত্তে এসেচে, তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইলে তারা কত আনন্দিত হয়!

বধূ—বৌ কি যেখানে সেখানে গিয়ে যার তার সঙ্গে কথা কইবে?

কুটিলা—হাঁ তা সত্য। বৌ কি সদরের জিনিস? বৌ অন্দরের জিনিস। অন্দরের লোকেরাই অন্দরে আসিয়া কথা কহিবে, আমি সব ডেকে আন্‌চি।

বধূ—আমার শরীর খারাপ, কারো সঙ্গে কথা কইতে পারব না।

জটিলা—বাপের বাড়ীতে কইতে, এখানে পারবে না কেন?

বধূ—এ যে শ্বশুর বাড়ী।

কুটিলা—দেশের গুর্ব্বিনীরা এসেচেন তোমায় আশীর্ব্বাদ করবার জন্যে। তোমার মুখে হাসি দেখলে তাঁদের প্রাণে আনন্দ হবে। তাঁদের আশীর্ব্বাদে তোমার স্বামীর মঙ্গল হবে।

বধূ—আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে কাহারা? আপনাদের অপেক্ষা মাননীয় কাহারা?

কুটিলা—ও বাবা! এতটুকু বৌয়ের কথায় ছিরি দেখ! যশোদা না এলে কি আশীর্ব্বাদ করবার কেউ নেই? যশোদার ছেলেটা এসে যজ্ঞকুণ্ডে মুতে দিয়ে গেছে। সন্ন্যাসীর জটা কাটে, কৌপীন ফেলে দেয়, জপের মালা নর্দ্দমায় ফেলে, ত্রিশূল চুরি করে, পূজোর ফুলচন্দন অপবিত্র করে,—এমন হতচ্ছাড়া ছেলে ভূভারতে নেই! সেইজন্যে যশোদাকে নেমতন্ন করিনি। যশোদা তোমার বাপের যেমন আপনার লোক আমাদেরও তেমনি। কত দুঃখে নেমতন্ন বন্ধ কত্তে হয়েচে তার সীমা নেই;—কেবল ঐ হতচ্ছাড়ার জন্যে। সে এলে কি লোক জনের স্বোয়াস্তি থাকত! সেইটে মনে করে বুঝি তোমার রাগ হয়েচে?

বধূ—তা হলে তাঁদের নেমতন্ন না করে যে দোষ করেচ তা মনে মনে বেশ বেশ জান।

যজ্ঞ করে যজ্ঞেশ্বরকে যদি নেমতন্ন না কর, তবে যজ্ঞ পূর্ণ হয় কি? দক্ষযজ্ঞের কি দশা হয়েছিল? মহারাজ নন্দ ধনে মানে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। আমি বাবার কাছে শুনেচি তাঁর ন্যায় ভগবানের পরম ভক্ত নেই। যে বাড়ীতে তাঁর পদধূলি পড়ে সে বাড়ীর পবিত্র হয়। যশোমতী সাক্ষাৎ ভগবতী। রোহিণীও নাগরাজ নন্দিনী উমা সদৃশ। তাঁহার পুত্র বলদেব মহামহিমান্বিত ভগবৎ সদৃশ পূজনীয়। আপনাদের দুর্ভাগ্য যে আপনারা তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের ন্যায় মহামহিমান্বিত পরমাত্মীয় আর কে আছে? নন্দ মহারাজের যে পুত্র আপনাদিগকে সম্প্রতি ইন্দ্রের কোপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার উপর দ্বেষ করা আপনাদের উচিত হয় নাই। মা যশোদা আমাকে আপন কন্যার ন্যায় কত স্নেহ করেন। আমার আগমনে আজ এখানে যে মহামহোৎসব, তাহাতে

তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে প্রাণে কি বিষম বেদনা হয়, তাহা বুঝাইব কাহাকে ?

জটিলা—ওমা ! বুঝেছি তাই তোমার শরীর অসুস্থ ! আচ্ছা বৌ এত ছেলে বয়সে এত সব শিখলে কোথা থেকে ?

(প্রস্থান)

বৌ—বয়স কমই বা কি ? লেখা পড়া শিখিলে বুদ্ধি বাড়ে, বিচার বিবেচনার শক্তি হয়। পিতা আমায় লেখা পড়া শিখিয়েচেন, তাতে আমার বয়সের চেয়ে জ্ঞান অনেক বেড়েচে। পুত্র কন্যা পিতা মাতার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানগবেষণার অংশভাগী হয়। সময়ে তা ভালরূপেই পরিস্ফুট হয়। আমি রাজার নন্দিনী, রাজবুদ্ধিও আমার আছে।

কুটিলা—আমাদের বাপ মা কি চাষা ভূষা ছিল ? আমরা কি বাপ মায়ের বুদ্ধি পাই নি ?

বৌ—তা আমি কেমন করে বলব ? আপনার বুদ্ধির ত কূল কিনারা নাই ! তবে মায়ের মা বাপের কথা আমি বল্‌তে পারি যে তাঁরা একবারে চাষা ভূষোই ছিলেন।

কুটিলা—ওমা ! আবার রসিকতাও জানে ! যশোদাকে নেমতন্ন করা হয়নি এই হ'ল যত রাগ ! লোকে শুন্‌লে বলবে কি ? যশোদাকে নেমতন্ন করলেই তার ধনুর্দ্ধর ছেলেটা আসবে। ছেলেটাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায় !

যেমন রূপ, তেমনি গুণ ! তার কি গুণে যে তোমার বাপ মা মজেছে আর তুমিও মজেছ তা বলতে পারিনি ! হ্যা বৌ তাকে কি দেখতে তোর এতই ভাল লাগে যে, তাদিকে নেমতন্ন করা হয়নি বলে রাগে ফুলচিস্ ?

বৌ—যিনি ইন্দ্রের কোপ থেকে তোমাদের দেশকে রক্ষা করেচেন উদ্দেশে তাকে মন প্রাণ সঁপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পারনা ? দেশের সকলেরই ত তা করা উচিত।

কুটিলা—আমার বয়ে গেছে! তোদের প্রাণ কেঁদে উঠে ত তোরা গুষ্ঠিশুদ্ধ মন প্রাণ সঁপে কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড় গে যা।

বৌ—তা ত উচিত। যিনি জীবন ও সম্পদ রক্ষা কর্ত্তা, তাঁকে কি দিয়ে তুষ্ট করা যায়, তা ত ভেবে পাওয়া যায় না।

কুটিলা—তবে লো ভাল মানুষের মেয়ে! তাকে প্রাণ সঁপেচিস্?

বৌ—যে সঁপতে পারে তার জীবন সার্থক হবে। একবার সঁপে দেখ না।

কুটিলা—নন্দের বেটা কেলে ছোঁড়া, সাত বছরের হতচ্ছাড়া তাকে প্রাণ সঁপা কি?

বৌ—তুমি মেয়ে মানুষ বলে কুভাব আন্‌চ কেন? স্ত্রী পুরুষ সবাইকেই সঁপতে বল্‌চি।

কুটিলা—পুরুষরা সঁপবে কেন?

বৌ—যিনি সাত দিন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধরে ছিলেন, তিনি কি নন্দের ছেলে—মানুষ?

কুটিলা—তবে কে?

বৌ—তিনি অসীম শক্তিশালী পরম পুরুষ ভগবান্।

কুটিলা—ওমা তাই ভেবে বুঝি নন্দনন্দনের পায় মনপ্রাণ সঁপেচ?

বৌ—তেমন ভাগ্য কৈ? তাঁর পায়ে মনপ্রাণ সঁপা কি মনে করলেই হয়?

কুটিলা—আর না, আর কথা বলো না। লোকে শুন্‌লে বলবে কি? সর্ব্বনাশ হল, যা ভেবেছিনু তাই হয়েচে! এমন কুলকলঙ্কিনীও হয়? একথা আবার প্রকাশ করে বলতেও লজ্জা হচ্চে না?—ছি ছি কলঙ্কিনী!

বৌ—আশীর্ব্বাদ কর যেন তাই হই।

কুটিলা—এঁ্যা ওমা বলে কি গো! বেহায়া! লজ্জার মাথা খেয়ে

ভদ্রলোকের মেয়ে বলে কি গো! মানসম্ভ্রম জ্ঞান একটু নেই! এই কি রাজনন্দিনীর কথা? সাত বৎসরের নন্দ ঘোষের ছেলে তার সঙ্গে প্রেম? একটা ডাংপিটে হতচ্ছাড়া, অন্ধকারের মত কুচকুচে কালো— ব্রজ বৃন্দাবন জ্বালিয়ে তুলেচে, যার ভয়ে লোকে অস্থির হয়ে উঠেচে,— তিনিই হলেন রাজনন্দিনীর ভগবান্! ভগবান্‌কে লোকে ভক্তি করে, উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানায়, পূজো করে;—সে ভগবান্ আলাদা জিনিষ! আর এই জল জ্যান্ত মানুষ নন্দের একটা ডাংপিটে চোর ছেলে হল কি না ভগবান্! ভদ্রলোকের মেয়ে রাজার নন্দিনী কুলশীল সম্ভ্রম-শালিনী মহামানীর বৌ হয়ে সেই হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটাকে ভগবান্ ভেবে একবারে মনপ্রাণ সঁপা! আবার মেয়ে মানুষ—কুমারী হয়ে মানুষকে ভগবান্ ভেবে মনপ্রাণ দেহ সর্ব্বস্ব সঁপলে লোকে কি কানাকানি কত্তে বাকি রাখবে? বয়সে বালক হলেও যে ডাংপিটে ছেলে, তাতে দু' দিন পরেই যে ধনুর্দ্ধর হয়ে উঠবেন্, তাতে আর সন্দেহ নেই। তা যা হ'ক ছেলেটার আর কি কর্ম্ম বাকি আছে বল্ ত? একে ত চোরের শিরোমণি, তাতে আবার এই বয়সেই বাঁশী বাজানর ওস্তাদ! তার উপর দেবতা, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসীর উপর অত্যাচার! কোথায় হোম কুণ্ডে পেচ্ছাব, কারোও ঠাকুরের নৈবেদ্য কেড়ে খাওয়া! তার অত্যা-চারে কুমারীরা শিব পূজায় যেতে পারে না, রাস্তায় তাদের পূজার উপকরণ কেড়ে নেয়, ফুল ছড়িয়ে ফেলে, মালা কেড়ে নিয়ে নিজে পরে। শুনেচি তাদের কাপড় ধরেও টান দেয়! নন্দের বেটা বলে কেউ কিছু বলে না, তাই আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে! নন্দমহারাজকে বলেও ত কোন প্রতিকার হল না। কুমারীদের কথা দূরে যাক্, তাকে দেখলে আমারি ভয় পায়! মনে হয় কি জানি পেছন থেকে এসে পাছে কাপড় ধরে টান দেয়! যদি কাপড় খুলে যায় তবে রাস্তার মাঝ-খানে ভদ্র লোকের মেয়ের কি অপমান বল ত! আবার তাকে কি ধরা যায় গা, চকিতে কোথায় পালায় তাও ঠাহর হয় না।

বাস্তবিক তাকে দেখলে আমার গা কাঁপে! নন্দের ত ক্ষীর সর নবনীর অভাব নেই, তাই খেয়ে অত বজ্জাতিতেও চোহারাটা কিন্তু বেশ আছে! বাপ মা ঐ ছেলেকে নিয়ে কেমন ক'রে ঘরে করে তা ভেবে পাই না!

বৌ—দিদি! রাগ করো না,—তাকে একবার আদর করে কোলে নিয়ে একটা চুমো খেয়ে দেখ না, সে কেমন ছেলে! যেন তার শরীরে হাড় নেই! যে একবার তার চুমো খায়, যে একবার তাকে কোলে নেয়, তার কি আরাম হয়, তা সে-ই জানে!

কুটিলা—বটে বটে তুই চুম খেয়েচিস্ নাকি?

বৌ—আমরা কুলের বৌ আমাদের কি সে ভাগ্যি?

কুটিলা—কেন লো, তোর বাপের বাড়ীতে ত যশোদা ছেলেকে নিয়ে হামেসা যেত। অত কুটুম্বিতে আত্মীয়তা,—পূজো উৎসবের অত ধূম! ছেলেটার উপর তোর যে টান দেখচি, তাতে তুই যে বাকি রেখেচিস্ তা ত বোধ হয় না।

বৌ—সত্যি দিদি একবার কোলে নিয়ে আশা মিটে না, মনে হয় আজীবন কোলে নিয়ে বসে থাকি।

কুটিলা—কেমন আরাম হয়?

বৌ—কি যে হয় তা কিছু বোঝা যায় না,—খুব আনন্দই হয়! অনেক ছেলে ত কোলে করেচ, কিন্তু এমন আনন্দ আর কোথাও পাবে না। একবার তাকে কোলে নিলে সে আনন্দ জীবনে আর ভুলতে পারবে না।

কুটিলা—আঁ্যা! বলিস্ কি? এমন কি গুণ?

বৌ—তা বলতে পারি না, সে যাকে স্পর্শ করে তাকেই আত্মসাৎ করে নেয়। এমন অদ্ভুত ছেলে কেউ কখনও দেখেনি। আমার দিব্যি ঠাকুর ঝি—তুমি একবার তাকে কোলে নিও।

কুটিলা—রাম বল! শুনেই আমার ভয় হচ্চে, সেটা কি মানুষ

জানে। এমন অদ্ভুত ছেলেও মানুষের হয় ? একবার ছুঁয়ে চির জীবনটা মাটী করব ? তাকে ছুঁয়ে তোর জীবনটা মাটী হয়ে গেছে দেখছি, নইলে তার জন্যে তোর এত অনুরাগ—এত চিন্তা কেন ? তোর এখনও যৌবন হয় নি, সেও শিশু বালক—তবে কি আকর্ষণ ? তাকে ছুঁলে কি এত ভালবাসা জন্মে ? এত ভালবাসা ভাল নয়, সে বেটা ছেলে, তুমি কিশোরী ; আজ সে বালক আছে, কাল সে কুমার হবে, পরে যুবা হবে। ভালবাসার আধিক্যে হয় ত সর্ব্বনাশ হবে।

বৌ—ভাল বাসলেই সর্ব্বনাশ হয় ! আবার সর্ব্বনাশ না হলে ভালবাসাও হয় না।

কুটিলা—বৌ ! দেখছি তুই পাগল হয়েচিস্। আচ্ছা যা থাকে কপালে, আমি একবার তাকে কোলে ক'রে এখানে নিয়ে আসব, দেখি কি হয় ! যদি তেমন কিছু হয়, তবে আমিও তার মতন ওষুধ দোব।

বৌ—দেখ যেন তাড়কার দশা না হয়।

কুটিলা—ঠিক বলেচিস্ ভাই ! তাকে বিশ্বাসও নেই, সে ভূতের ভূত—অদ্ভূত ! কি জানি মনে কোন বিরুদ্ধভাব থাকলে হয় ত কি বিপদেই বা ফেলে দেয় ! তবে এক কৌশল করে আনা যাক্ ; তুমি এসেচ, তুমি যশোদাকে দেখতে চাচ্চ, আর এই উৎসব হচ্চে, তোমাদের পদধূলি না পড়লে উৎসব সার্থক হবে কেন ? এই বলে যশোদাকে আনতে পাঠাই, কি বলিস্ ?

বৌ—সে ত ভাল কথা। তিনি এলে তাঁর কোল থেকে নিয়ে আদর করে চুম খেয়ো।

কুটিলা—আর তুই ? তুইও তাকে কোলে নিবি ত ?

বৌ—না, আমি আর তাকে ছোঁব না। তুমি কোলে নেবে, আমি ত সেখানে থাকব।

কুটিলা—দেখিস্ ভাই আমার কোলে দিয়ে যেন তুই সরে যাস্‌নি। কি জানি যদি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মত মূর্ত্তি ধারণ করে !

বো —না না, মায়ের কাছে তা পারবে না।

এইরূপ বুদ্ধি আঁটিয়া কুটিলা মাতা জটিলা ও ভ্রাতা অভিমন্যুকে বলিল—মহারাজ নন্দ ঘোষকে নিমন্ত্রণ না করা আমাদের বড়ই ভুল হইয়াছে। তাঁহাদের ন্যায় মহা মাননীয় ও পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ গৃহে উপস্থিত হইলে গৃহের কল্যাণ হয়। বধূর পিতাও এজন্য দুঃখিত। বর্ষাণ হইতে বৃন্দাবন অধিক দূর নহে। এখন উপযুক্ত লোক ও শিবিকা পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করা হউক। এ সময় তাঁহাদিগকে আনয়ন করিতে পাঠাইলে আমাদের ইচ্ছাকৃত ত্রুটিও তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহারা সদানন্দ। আহ্বান করিলেই এখনই আসিবেন। কারণ যশোমতী বধূকে বড়ই স্নেহ করেন।

কুটিলার অভিমত হওয়ায় জটিলাও কিছু বলিলেন না। অভিমন্যু ত্বরিত লোক ও শিবিকা পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন।

বর্ষাণে আগমন করিয়া নন্দ মহারাজ অভিমন্যু ও বৃষভানুকে আলিঙ্গন করিলেন। যশোমতী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া জটিলাকে প্রণাম করত কুটিলা ও শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাতা যশোদা পা ছড়াইয়া বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলে দুই বৎসরের শিশুর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট পুত্র স্তন পান করিতে লাগিল। শিশুটী চাঞ্চল্য রহিত হইয়া নির্ব্বোধের মত মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিল।

কুটিলা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র শিশুটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেখিল, শিশু স্তন পানে অন্তর্নিবিষ্ট,—একবারে শিশু প্রকৃতির সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত অল্পবুদ্ধি। জগতের সমুদয়ই যেন তাহার নিকট দুর্ব্বোধ্য ; কি সে কি হয়, তাহার কিছুই জানে না, ভালমন্দ জ্ঞান তাহার একবারেই নাই।

কুটিলা স্তম্ভিত হইল। মনে মনে ভাবিল, কি আশ্চর্য্য ! এই অপগণ্ড শিশুর সম্বন্ধে লোকে কত কি বলে। এ ত একবারে পিতা

মাতারই রক্ষণীয়। জীবন মরণের চিন্তাও ইহার কিছুমাত্র নাই বা থাকিতে পারে না। ছি ছি ছি! লোকে কি বিকৃতভাবেই ইহার প্রতি দোষারোপ করে। ইহার নিন্দা নহে,—ইহার প্রতি দোষারোপ করিয়া প্রকৃতপক্ষে নন্দযশোদারই নিন্দা করিয়া থাকে। নন্দের ন্যায় মহামতি পবিত্রচেতা পুরুষ, যশোমতীর ন্যায় জগৎকল্যাণ-কামিনীর নিন্দা করিয়া, লোক সমূহ অসূয়াই প্রকাশ করিয়া থাকে। আহা! শিশুর কি অনির্ব্বচনীয় রূপ! কি মোহনীয়তা! একবার দর্শন করিলে জগৎ সংসারের এমন অদেয় কি আছে যাহা শিশুকে না দেওয়া যায়? এমন সর্ব্বলোক পবিত্র অনিন্দ্য নির্ব্বোধ শিশুকেও লোকে কোন প্রাণে নিন্দা করে? ইহার ন্যায় সরল স্বচ্ছন্দ, মাতার উপর নির্ভরশীল, ক্রীড়াপ্রবণ ও আনন্দময় শিশু কাহার না আলিঙ্গন যোগ্য?

ইহা চিন্তা করিতে করিতে কুটিলা যশোমতীর নিকট বসিয়া উদাস ভাবে শিশুকে দর্শন করিতে লাগিল। শিশু মাতার স্তন্যপান করিয়া কতক্ষণ পরে কুটিলার প্রতি চাহিয়া মধুর হাসি হাসিয়া বিদ্যুদ্গতিতে মাতৃক্রোড় হইতে লাফাইয়া গিয়া কুটিলার ক্রোড়ে বসিল। কুটিলা স্নেহের আবেশে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। তাহা এত শীঘ্র ও এত উদাসভাবে যন্ত্রচালিতবৎ সম্পন্ন হইল যে, সে কিছু চিন্তারও সময় পাইল না। যেমন আলিঙ্গন অমনই তাহার হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। সে আনন্দ যেন হৃদয়ে ধরে না—বুঝি বা ফাটিয়া বাহির হয়,—অমনই আনন্দের আবেগে অবশেষে শিশুকে দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া গণ্ডদেশে অসংখ্য চুম্বন! সেই চুম্বনের আবেশে দেহ অবশ ও চক্ষে দর দরদরিত ধারা! পরক্ষণে তাহার সংজ্ঞা লোপ হইল।

যশোমতী সত্বর তাহার ক্রোড় হইতে শিশুকে লইয়া তাহার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। জটিলা ও অভিমন্যু উপস্থিত হইয়া কুটিলার অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। দরদরিত অশ্রু-

ধারায় তাহার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতেছিল,—এক অপূর্ব্ব ভাব ও জ্যোতিতে তাহার দেহ যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার অঙ্গে কম্পন আরম্ভ হইল, পুলকে লোমকূপ সমূহ মুহুর্মুহুঃ কদম্বকোরকের ন্যায় সমুচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, কিয়ৎকাল পরে তাহার সমুচ্চ হাস্যতরঙ্গে প্রাসাদে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল!

তাহার অবস্থা দেখিয়া যশোমতী, পাছে তাহার সন্তানকে কেহ অপরাধী করে, এই ভয়ে ভীত হইলেন। তিনি সন্তানকে লইয়া শ্রীরাধার মন্দিরে প্রবেশ করিলে শ্রীরাধা ত্বরিত আসিয়া ননদিনীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

বধূর শুশ্রূষায় কিয়ৎকাল পরে কুটিলা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় জাগরিত হইয়া বহু লোক জনকে সমবেত দেখিয়া বিস্মিত ও লজ্জিত হইল! তাহার সংজ্ঞার পুনঃপ্রাপ্তি দেখিয়া সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া গেল।

বধূ—ননদিনীকে বলিলেন "আর চুমো খাবে?—যাওনা মায়ের কোলে দুধ খাচ্চে!"

ননদিনী—কি হল বল দেখি?

বধূ—হবে আর কি, তুমি আনন্দে তাকে বুকে চেপে ধরে অসংখ্য চুমো খেয়েচ। তার পর কম্পন—আনন্দ—হাস্য—সংজ্ঞালোপ!

ননদিনী—বলিস কি,—লোক সব দেখেচে?

বধূ—দেখবে না? মস্ত একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। আমি আড়াল থেকে সব দেখছিলুম।

ননদিনী—তাই ত ছেলেটার কি একটা মোহিনী শক্তি আছে! সত্যি বল্‌চি ভাই, প্রাণটা যেন লুটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কোলে কত্তে কি যে আনন্দ হল বলতে পারি না। আমি চুম খেয়েচি, কি সে আমার চুম খেয়েচে তাও বলতে পারি না। কিন্তু যশোমতীর কোলে ত ভাই বেশ দুধ খাচ্চে, তাতে যশোমতীর ত কিছুই হচ্চে না, আমার অমন হ'ল কেন?

বধূ—দিদি ! ছেলে মায়ের দুধ খাবে, তাতে মায়ের কি হবে ? ও ছেলের শক্তিকে যে মা আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, মনে মনে বুঝ সে মায়ের শক্তি কত ! তারপর, হয় বৈ কি ! গোপালকে মনে হলেই মায়ের স্তন দুগ্ধ আপনিই ঝরে পড়ে ! মায়ের সে অতুল স্নেহের তুলনা নাই। কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকলে সে ঘরের অবস্থা যেমন হয়, তোমারও তেমনই হয়েচে ! তোমার দেহে অত আনন্দ ধরবার স্থান নেই। তাই তোমার সংজ্ঞা লোপ হয়ে গেছল। সে শক্তি-বেগ সম্বরণ বা সহ্য করার শক্তি তোমার নেই। যা হ'ক কেমন আনন্দ হ'ল বল দেখি ?

ননদিনী—তাই ত লো !—সে কথায় আর কাজ নাই, জীবনে আর কখনও ও ছেলেকে স্পর্শ করব না। একটা ছেলের যে এত শক্তি তা জানতুম না। মনপ্রাণহারী নির্ব্বোধ শিশুটী দেখে, ওর উপর আমার কেমন স্নেহ জেগে উঠল।—এমন শিশুকেও লোকে নিন্দে করে ? এই ভাবচি—এমন সময় সহসা আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ! —অঙ্গ স্পর্শমাত্র আমার যেন কি হল, আমি যেন তখন আত্মহারা হয়ে গেছি, সহসা কি যেন কি আনন্দে যেন আত্মাবিষ্ট চিত্তে তাকে বুকে চেপে ধরে খুব চুমো খেয়েচি ! এমন ননীর পুতুল দেহ দেখিনি ! সে কোমল দেহের সঙ্গে যেন কি আনন্দ মাখা ! কি যে হয়ে গেলুম তা বলতে পারিনি ! সে আনন্দটা মনে হলে এখনও যেন আমায় কাঁপিয়ে তুলে ! সে আনন্দের বেগ সইতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেছলুম বোধ হয়। কিন্তু ভাই সত্যি করেই বলচি, ও যে সে ছেলে নয়,—যেন সাক্ষাৎ মদনমোহন !—ষোড়ষবর্ষ বয়স্ক হয়ে দাঁড়াল ! তার ভঙ্গি, হাস্য, চাহনি দেখলে সতী ধর্ম্ম রাখা দায় !

বধূ—তোমার বহু ভাগ্য যে আজ মদনমোহন লাভ হ'ল !

ননদিনী—যা হ'ক তা' হক, তার আলিঙ্গনের সুখ পেয়েচি। আলিঙ্গনে যে এত সুখ তা জানতুম না। বৌ ! তুই একবার কোলে নেনা ভাই !

বধূ—রাম! রাম! রাম! তোমার দশা দেখে আরও?

ননদিনী—তুই ত বড় চালাক, আমার ওপর দিয়ে শিক্ষা লাভ করলি, আমি এত চালাক, আমাকে বোকা বানিয়ে দিলি?

বধূ—লোকে দেখে শিখে, আর ঠেকে শিখে। তুমি ঠেকে শিখলে, আর আমি দেখে শিখলাম।

ননদিনী—তা যা হ'ক, আর ও নাম করিস না। তোর কথায় মজে আমার সর্ব্বনাশ হল!

বধূ—কি সর্ব্বনাশ? তোমার কুল-ধর্ম্মের কোন ব্যত্যয় ঘটেচে নাকি?

ননদিনী—না না, তা নয়, তবে সতী ধর্ম্ম রক্ষা কত্তে হলে স্বপ্নেও পরপুরুষ দর্শন নিষেধ।

বধূ—শিশুকেও পরপুরুষ রূপে দেখলে সে দোষ তোমার, না শিশুর?

ননদিনী—না না, পরপুরুষের কথা নয়, তবে ঐ ভাব গুলোয় মন চঞ্চল হয়। যশোদা কোন ঘরে আছে, সে ঘরে আমি যাব না।

বধূ—প্রয়োজন নাই, তুমি আমার ঘরে এস।

ইহা বলিয়া ননদিনীকে লইয়া আপনার ঘরে লইয়া যাইলে কুটিলা দেখিল পর্য্যঙ্কোপরি যশোদা নিদ্রিতা এবং গোপালও তাহার ক্রোড়ে নিদ্রিত।

কুটিলা সহসা তাহা দেখিয়া কয়েক পদ পিছাইয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিল এবং অনিমেষ-লোচনে নিদ্রিত গোপালের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কুটিলা বধূকে বলিল দেখ্ ভাই দেখ্, এর ভিতর কোথায় কি কুহক আছে? এ যে একেবারে দুগ্ধ পোষ্য অজ্ঞান শিশু! মায়ের কোলে নিদ্রিত! এর মদনমোহনত্ব কোথায়? তবে যশোদার মহাভাগ্য! এমন অদ্ভুতরূপ সন্তান জগতে কি কারো আছে? তোমার পিতা মাতা এ শিশুর গুণ জানেন

তাই ঘন ঘন উৎসবে যশোদা তোমাদের বাড়ী গিয়ে পুরী পবিত্র করে-চেন। বৌ তুই কখনও এ ছেলেকে কোলে করেচিস্?

বৌ—না সে সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে তোমার দেখে আমার ভয় হচ্চে!

ননদিনী—শুনেচি, জন্মাবধি তুই অন্ধ ছিলি, যশোদা ঐ ছেলেকে কোলে নিয়ে তোকে দেখতে গেলে তোর কোলে ওকে দিলে তুই নাকি চোখ খুলে চাস, সেই থেকে তোর বাপ মা ওকে বড় ভালবাসে আর যশোদাকে ভক্তি করে।

বৌ—তা হবে, আমি জানি না।

ননদিনী—সেই ভয় হচ্চে আমার, তোর সমস্ত বয়েস হলে কি জানি কি হয়।

বৌ—অনেক লোকের অনেক রকম ভয় হয়। ভয় মনের রোগ। তবে তোমার দশা দেখে আমারও ভয় হচ্চে। যার বংশকে কুমীরে খায় ঢেকি দেখলে ভয় পায়।

ননদিনী—তা মিথ্যে নয়, মনে করলেই বুক শুকিয়ে যায়! আর অব্যাহতিরও উপায় দেখি না। নন্দ যশোদা পরমাত্মীয়;—যাওয়া আসা ও লৌকিকতা না করলেও নয়!

বৌ—যাক্ ওসব কথায় কাজ নেই, ওঁরা এখানে থাকুন। ওঁদের আহারাদির ব্যবস্থা কর। আমি তোমার ঘরে গিয়ে তোমার কাছে শোব। মাকে বলে চল্ আমরা যাই।

ননদিনী—তা বটে, কিন্তু এঁ দিকে ছেড়েই বা যাই কেমন করে? আমরা অপেক্ষা করি যশোমতী উঠুন, তার পর যাব।

বধূ—আচ্ছা তাই ভাল। আমি মায়ের পা টিপি, তুমিও এসে বিছানায় বস।

ননদিনী—আমি ও বিছানা ছোঁব না, এখানেই বসি!

[বলিয়া অন্য পালঙ্কে উপবেশন করিল।]

শ্রীরাধিকার হস্তস্পর্শে যশোমতী উঠিয়া বসিয়া হস্ত দ্বারা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া সেই হস্ত নিজ মুখে দিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, থাক্ মা থাক্, আর পায়ে হাত দিও না। মা! শুনেচি দুর্ব্বাসা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে গেছেন যে তোমার হাতের রাঁধা অন্ন অতি সুস্বাদু হবে, আর সে অন্ন যে খাবে তার আয়ুঃ বৃদ্ধি হবে। তাই বলি মা! আমার গোপালে জন্যে কিছু কিছু মিষ্টান্ন তৈয়ের করে পাঠাবে?

বধূ—আমি ত মা পরাধীন। (ননদিনীকে দেখাইয়া) এঁ দিকে ও মাকে বলে যাবেন। আমায় আদেশ করলেই তৈয়ের করে দিব।

কুটিলা—তাতে আপত্তি কি? বৌয়ের এত গুণ আছে তা ত জানতুম না। তা বেশ বেশ বৌয়ের হাতের রান্না কাল থেকে দাদাকে খাওয়াব।

ইতিমধ্যে গোপাল ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিয়া বায়না ধরিল—ক্ষীরের লাড়ু খাব।

তাহা শুনিয়া শ্রীরাধা কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গিয়া স্বহস্তে সদ্যঃ প্রস্তুত কয়েকটী ক্ষীরের লাড়ু লইয়া উপস্থিত হইলে যশোদা বলিলেন, মা! তুমি খাইয়ে দাও। এ লাড়ু কি তুমি করেচ? রাধা বলিলেন হাঁ। বেশ, দাও মা দাও, তুমি খাইয়ে দাও—আমার গোপালের পরমায়ুঃ বাড়বে।

ইহা বলিতে বলিতেই গোপাল লাফাইয়া গিয়া শ্রীরাধার হাত ধরিয়া লাড়ু খাইতে লাগিলেন। পাত্রে অনেকগুলি লাড়ু ছিল যশোদার অনুরোধে শ্রীরাধা যশোদার পার্শ্বে পর্য্যঙ্কে বসিয়া এক একটী করিয়া গোপালকে খাওয়াইতে লাগিলেন। গোপালের স্পর্শে শ্রীরাধার কোন বিকার উপস্থিত হইল না দেখিয়া কুটিলা বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

বধূ বলিলেন ঠাকুর-ঝি একটু জল আন।

(ঠাকুর-ঝি উঠিয়া গেলেন)।

যশোদা বলিলেন, মা! তোমার হাতে গোপাল আমার বেশ খাচ্চে। তুমি প্রত্যহ একবার গিয়া গোপালকে খাওয়াইতে পারিবে না? আমি তোমার যাইবার জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করিব।

শ্রীরাধা—আমার কোন আপত্তি নাই, এঁরা যেতে দিলেই আমি যাব। ইতি মধ্যে ঠাকুর-ঝি জল আনিলে বধূ বলিলেন এর মুখে ধর।

কুটিলা বলিল আমার বিশেষ কাজ আছে, আমি আসচি; বলিয়া যশোদার নিকট জল-পাত্রটী রাখিয়া বেগে প্রস্থান করিল। তাহা দেখিয়া শ্রীরাধা বলিলেন, মা! তোমার ছেলেকে ও আর ছোঁবে না। একবার ছুঁয়ে ওর মুচ্ছা হয়েছিল বলে ভয়ে পালিয়ে গেল!

যশোদা—ওমা! সে কি গো! আমার ছেলেকে ছুঁলে মূচ্ছা হয়? এই ত মা তুমি খাওয়াচ্চ, তোমার কি মূচ্ছা হচ্চে? ওমা! এমন অলুক্ষণে কথা বলা ত ভাল নয়। না মা, তোমাদের বাড়ী আর থাকব না, এখনই চলে যাব।

শ্রীরাধা—না মা, তা হলে আমার উপর দোষ হবে। বলবে আমি কি বলেচি তাই চলে গেলেন।

যশোদা—আচ্ছা মা! তোমার অনুরোধে আজ থাকব, কাল সকালে যাব।

ইতিমধ্যে কুটিলা আসিয়া বলিল, বৌ খাওয়ান হয়েচে? এখন এস, যশোমতী ও নন্দ মহারাজের আহারের ব্যবস্থা কর। যশোমতীকে বলিলেন গোপালকে লইয়া বিশ্রাম কর। বৌ মিষ্ঠান্নাদির ব্যবস্থা করুক। বৌ বেশ মিষ্টান্ন তৈয়ের করে।

যশোমতী—হাঁ, মহর্ষি দুর্ব্বাসা ওকে বর দিয়েচেন যে, ওর হাতের তৈয়ারী অন্ন অতি সুমিষ্ট হবে, আর সে অন্ন যে খাবে তার আয়ুঃ বৃদ্ধি হবে। সেইজন্য মা! আমার বিশেষ অনুরোধ বৌমাকে এক একবার আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে; ওর হাতের রান্না অন্ন খেলে আমার গোপালের আয়ুঃ বাড়বে।

জটিলা—এ ছেলে মানুষ, অত সব পারবে কি? আচ্ছা আমি ওকে জিজ্ঞেস করব, অভিমন্যুরও একটা মত নেব, তবে এই এসেচে, এক বছর ত কোথাও যেতে নেই।

কুটিলা গিয়া কক্ষান্তরে মাতাকে বলিল, মা! বৌকে নন্দালয়ে পাঠিও না। ছোঁড়াটা বৌয়ের হাতে খেতে খুব ভালবাসে। ও যেমন তেমন ছেলে নয়। মায়ের কোলে বসে দুধ খেলেও ওকে বিশ্বেস নেই। একবার ছুঁয়ে আমার কি হল দেখলে? ও কি যাদু মন্ত্র জানে। বয়েস বড় ছোটয় ওর কিছু বাধে না। মায়ের কাছে শিশুটী হয়ে থাকে, বনে জঙ্গলে প্রয়োজন অনুসারে দেহকে বাড়ায় কমায়।

ভগবান যাহাকে কৃপা না করেন, সে তাঁহাকে ধরিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন, "যোগ কর, তপস্যা কর, দান কর, ধ্যান কর, আমার কৃপা না হইলে কিছুই হইবে না।" অর্থাৎ কৃপা ভিক্ষা করিয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা বা প্রেমের সহিত ভজনা না করিলে, আন্তরিকতার সহিত তাঁহাতে আত্মসমর্পণ না করিলে তিনি ধরা দেন না। তাঁহাকে ধরিতে হইলে, তাঁহার কৃপা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার শরণ লইতে হয়। বল পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিবার সাধ্য কাহার?

শ্রীরামচন্দ্র যখন মুনীদের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তখন বশিষ্টদেব তাঁহাদিগকে বলিলেন শ্রীরামচন্দ্র আসিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার বাক্যে একবার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া বলিলেন "ও! দশরথের বেটা রাম!" ইহা বলিয়াই পুনরায় ধ্যান মগ্ন হইলেন। তাহা দেখিয়া রামচন্দ্র হাসিলেন। হাসিলেন এই জন্য যে, যে পরমাত্মার চিন্তায় তাঁহারা ধ্যানমগ্ন, তিনিই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আজ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত কিন্তু পরমাত্মার কৃপা না হওয়ায়—অর্থাৎ তাঁহারা পরমাত্মার এইরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হওয়ায়—পরমাত্মার সর্ব্বশক্তিমানত্বে অবিশ্বাস করায়, তিনি তাঁহাদের প্রীতি প্রেম ও আন্তরিকতার অভাবে

দেখিয়া তাঁহাদিগকে ধরা না দেওয়ায় তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

কুটিলারও তাহাই হইল। ভগবৎ সংস্পর্শে যেরূপ আধ্যাত্মিকতার মহিমা প্রকাশ হওয়া সম্ভব, তাহাই হইল। সময়োচিতভাবে ভগবচ্ছক্তি তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া নিজ মহিমাই প্রকাশ করিলেন। এজন্য সে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে আবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশের ন্যায় তাহাকে তোল পাড় করিয়া তুলিয়াছিল এবং সত্ত্বগুণের যে অনুভূতি অশ্রু কম্প পুলক প্রভৃতি—তজ্জন্যই তাহার দেহে তাহা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু প্রীতি প্রেম শ্রদ্ধা বা আন্তরিকতা না থাকায় তাহা স্থায়ীত্ব লাভ করে নাই। কুটিলার মনে "ইহাকে স্পর্শ করিলে কি হয়, দেখা যাউক" এই কৌতূহল থাকায় তিনিও যেন ভোজবাজীই দেখাইলেন। দেখাইলেন কি হয় দেখ, এইরূপই হয়। ইহা চাও? কাচে যেমন তাপ সঞ্চালিত হয় না; এবং বল পূর্ব্ব তাপ সঞ্চালিত করিলে তাহা যেমন টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, তাপের বেগ সে সহ্য করিতে পারে না; তদ্রূপ কুটিলাও সাত্ত্বিকভাবের সে আনন্দোচ্ছ্বাসকে উৎপাত বলিয়া মনে করিয়াই পাছে তাহার নিজ সত্ত্বা (প্রকৃতিগত কৌটিল্য) বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া ভগবান্ হইতে দূর পলায়ন করিল!

বহির্ম্মুখ জীবের এইরূপই হয়। বহু সৌভাগ্য বশতঃ যদি কোন প্রকারে একবার সাত্ত্বিকভাবের আনন্দাভাস পায়, তবে তাহাতে সে ভীত হয়। "ভাব" কি, "ভাবে" কেমন আনন্দ হয়, তাহা জানিবার জন্য মথুরবাবু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসিয়া মথুরের বুকে হাত দিলে তাঁহার "ভাব" হয়। ভাবে সাত্ত্বিক আনন্দে গদগদ হইয়া মথুর মাতালের ন্যায় টলিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, তাঁহার আনন্দ-ভাবের আর অবসান হয় না দেখিয়া, সেই ভাব মোহের ভিতর তাঁহার যতটুকু জ্ঞান

ছিল, তাহাতে তিনি চতুর্থ দিন টলিতে টলিতে পরমহংস দেবের নিকট আসিয়া বলিলেন "বাবা! আমার আর ভাবে কাজ নাই, তোমার ভাব তুমি লও—আমার বিষয় আশয় সব গেল!" তাহা শুনিয়া তিনি হাসিয়া মথুরের বক্ষেঃ হস্তার্পণ করিয়া "ভাব" হরণ করত বলিলেন "ভাব" কি বুঝলে?"

মথুর বিষয়ী লোক, তিনি "ভূতে পাওয়ার" মত সাত্ত্বিক ভাব সহ্য করিতে পারিলেন না। কুটিলাও তদ্রূপ সে সাত্ত্বিক ভাব সহ্য করিতে পারিল না। তাহা হইলেও বহুভাগ্যে সাত্ত্বিক ভাবের নেশার আমেজ বুঝিল। তাহাকে বুঝান প্রয়োজন ছিল বলিয়াই যেন কৃষ্ণ তাহাকে তাহা বুঝাইলেন। বুঝাইলেন এই জন্য যে, লোকমুখে অদ্ভুতত্ত্ব শুনা এক কথা, আর স্বয়ং অনুভব করা আর এক কথা! শুনার গুরুত্ব অপেক্ষা স্বয়ং অনুভূতির গুরুত্ব অনেক বেশী। কৃষ্ণকে লীলা করিতে হইবে, তজ্জন্য নন্দের গোপাল কি পদার্থ তাহা তাহার জানা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনে গুরুত্বের ভীতি প্রদর্শন করিয়া যেন তাহাকে কতকটা সংযত করিয়া রাখিলেন। আর শ্রীমতীও বুঝিলেন ইহারা কৃষ্ণ-বিরাগী।

যাউক, গোপালকে মিঠাই খাওয়াইতে খাওয়াইতে শ্রীমতীর অন্তরাত্মা কিরূপ আনন্দিত হইতেছিল তাহা শ্রীমতী ও গোপাল বুঝিতে ছিলেন। গোপালের অঙ্গস্পর্শে শ্রীমতীর সর্ব্ব শরীর অমৃত রসে অভিষিক্ত হইতেছিল। কেবল যশোমতীর উপস্থিতিতে উভয়েই দৃঢ় হইয়া সংযম রক্ষা করিতেছিলেন। পাছে ভাবের বশে দেহে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় তজ্জন্য শ্রীমতী তাড়াতাড়ি ননদিনীকে বলিলেন "ঠাকুর-ঝি! একটু জল আন।"

গোপাল সব মিঠাই খাইলেন না, অর্দ্ধভুক্ত কয়েকটা রহিল। শ্রীমতী তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া মুখে জলের গ্লাস ধরিলেন। গোপাল জল খাইয়া শ্রীমতীর বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছিলেন। শ্রীমতীর আনন্দের সীমা

নাই! আনন্দের উচ্ছ্বাস যখন পূর্ণমাত্রায় পৌঁছিবার উপক্রম করিতেছে—যশোমতীর সম্মুখেও যখন ভাবের আবেশে দেহ সংযত করিয়া রাখা চলে না বলিয়া মনে হইতেছে, তখনই বাহির হইতে জটিলার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল "বৌ মা! খাওয়ান হয়েচে?" যেমন একথা শুনা, অমনই ভাবের আবেগ কাটিয়া গেল! বধূ তখনই গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া একবার গোপালের বদন প্রতি চাহিয়া দ্রুত গৃহ ত্যাগ করিলেন।

তাহার পর আর তাঁহার গোপালের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। শুনিলেন, অতি প্রত্যূষেই নন্দযশোদা গোপালকে লইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমতী সখীগণের সঙ্গে যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন আসিয়া শুনিলেন গোপাল বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন। পৌষমাস—তখন শীতের আধিক্য। গোপালের গমন সংবাদ শ্রীমতীকে বিচলিত করিল;—দেহ কম্পিত হইতে লাগিল! কম্পন দেখিয়া সখীগণ শয্যায় লেপ চাপা দিয়া শয়ন করাইল; কম্পনের বেগ বাড়িতে লাগিল। এমন সময় কুটিলা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "কি বৌ! গোপাল চলে গেছে বলে কি দুঃখ হয়েছে?"

বধূ কোন কথা না বলিয়া কুটিলার সাড়া পাইয়া মুখেও লেপ চাপা দিলেন।

সখীরা বলিল—শীতকাল, জল বরফের মত ঠাণ্ডা, তাতে আবার প্রাতঃস্নান! এইজন্যে শৈত্যাধিক্যে কাঁপছে!

কুটিলা বলিল—হাঁ হাঁ তাই বটে! লেপটা ভাল ক'রে চাপা দে। তবে চোখের জলে বিছানা না ভাসে! তোরা উপযুক্ত সঙ্গিনী ত—পুরস্কার পাবি!

ললিতা—কিসের পুরস্কার? ভালবাসি বলে আসি, তোমরা যদি বিরক্ত হও তবে আর আস্‌ব না।

বিশাখা—তোমার মায়ের জিদেই ভোরে এসে বৌকে নিয়ে যমুনায় যাই, বৌও আমাদিগকে স্নেহ যত্ন করে তাতেই আসি। ভালবাসাই আমাদের দায়! নতুবা তোমাদের বৌ আর আমাদের কি পুরস্কার দিবে? তুমি ত ভাইয়ের বোন্! ভাই তোমার হাতধরা! ভাই তোমার কথা না শুনে কি বৌয়ের কথা শুন্‌বেন? আর গোপালের প্রতিই বা তোমার এত রাগ কেন? শুন্‌লাম গোপালের অঙ্গস্পর্শে তোমার নাকি হৃৎকম্প হয়েছিল? সে আনন্দোচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে নাকি তুমি অজ্ঞান হয়েছিলে? সেজন্য বৌ অপেক্ষা তোমারই দুঃখ শতগুণ! গোপালের কথা তুমি ভুলতে পারছ না, গোপাল তোমার মনপ্রাণে আসন পেতে বসে আছে, তাই তুমি সকলকেই গোপালের বিরহে দুঃখ অনুভব করতে দেখছ! আহা হোক্ হোক্! ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য!

কুটিলা—যা যা, আর সতীত্ব নাড়া দিস্‌নি! তোদের সব খবর রাখি। কাত্যায়নী পূজো, বস্ত্রহরণ আমার অজ্ঞাত নয়! গোপাল সর্ব্বদাই তোদের দৃষ্টি পথে আছে। তোরা যা না জানিস তা আমি সব জানি। তোরা যা হয় করগে যা, বৌয়ের জন্যেই আমার ভয়! গোপালটী যে সে বালক নয়। বালক বলে মা কিছু বলে না, আমরাও কিছু বলি না, দাদারও কোন সংশয় নাই। বৌ বাপের বাড়ী থেকে সর্ব্বনাশের হাঁড়ি মাথায় করে এনেচে। দেখচি বৌ সর্ব্বদাই উন্মনা! গোপালকে না দেখলে যেন বাঁচে না! সেই জন্য তার চিন্তা, তার সংস্রব একবারে ছাড়াবার চেষ্টা কর্‌চি।

বিশাখা—ছি ছি ছি! এ কি কথা! ব্রজ বৃন্দাবনে গোপালকে কে না ভালবাসে? যে একবার তাকে দেখে, সে কি মোহিত না হয়ে থাকে? গোপাল দুধের শিশু, সে জগতের কিছুই জানে না, তাকে একবারে প্রণয়ী করে তুললে? প্রেমের সে কি জানে? ছি ছি ছি! এমন অপবিত্র মন! কাত্যায়নী পূজা করেচি তাতে দোষ কি?

কুমারীগণ শিব পূজা করে, সেটা কি তাদের দোষের ? আমরা না হয় কাত্যায়নী পূজা করেচি। কুমারীগণ যে উদ্দেশ্যে শিব পূজা করে, আমরাও সেই উদ্দেশ্যে কাত্যয়নী পূজা করেচি, ইহা হিন্দুর ধর্ম্ম ও কুমারীগণের ব্রত। সংপতি লাভ সকলেই কামনা করে। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনই ত সংপতি লাভের জন্য শিব পূজার আদেশ দেন। এটা কেমন করে তোমার চোখে বিসদৃশ লাগল, তা ত বলতে পারি না। আর বস্ত্রহরণ ?—ওটা রাখাল বালকদের খেলা! গো চারণ করতে করতে পাছে গরু পা দেয়, এজন্য কাপড়গুলো জড় করে গাছে তুলে রাখে। এটা খেলা বা সাবধানতাও হতে পারে। এজন্য অপরাধ কি ? কুচিন্তায় মনটাকে এমন জঘন্য করে ফেলেচ ?

কুটিলা বিশাখার সহিত কথায় না পারিয়া অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, বিশাখা! তুমি তামাসাও বোঝ না ? ক্রোধ করো না। রাখাল বালক বা গোপালকে আমি দোষী করিতেছি না। রহস্যচ্ছলে বলিয়াছি। ভাই ক্ষমা কর, একথা আর কাকেও বলো না।

বিশাখা—হাঁ, আমিও জানি তুমি যুবতী ও বুদ্ধিমতী। বালকের কর্ম্ম ও মনে যুবার ভাব থাকা সম্ভব কি ? তুমি ইঙ্গিতে যাহা বুঝিবে, শত চেষ্টাতেও বালককে তাহা বুঝাইতে পারিবে না, তোমার যৌবনের উল্লাস তাহার মনে রেখাপাতও করিতে পারিবে না। সে সরল স্বচ্ছন্দ ও অকলঙ্ক। সে জানে শুধু ক্রীড়া। তাহার ক্রীড়ার ব্যাঘাত হইলেই সে উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হয় বা কাঁদে।

কুটিলা—ওকথায় আর কাজ নাই, গোপাল যে সর্ব্বজনপ্রিয়, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। ব্রজ-বৃন্দাবনে গোপালকে ভাল না বাসিয়া কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না। আমরাও কি গোপালকে কম ভালবাসি ? মায়ের অনুরোধে বৌ গোপালের জন্য লাড্ডু তৈয়ের করে দেয়। কিন্তু গোপাল বালক হইলে কি হয়, তার রূপের মোহ সহ্য করা সহজ কথা নয়!

বিশাখা—তাই বল! তুমি সহ্য করিতে না পারিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছ বলিয়া কি সকলকেই একসূত্রে গাঁথিতে চাও?

কুটিলা আর বিশাখার সহিত কথা কাটাকাটি না করিয়া সহসা বধূর গায়ের লেপ খুলিয়া ফেলিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিল—অত্যন্ত উত্তাপ!—চোখ মুখ বসিয়া গিয়াছে, মুখশ্রী ও বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে! তাহা দেখিয়া সে মাতাকে সংবাদ দিতে গেল। এবং ললিতা বিশাখাকে অনুনয় করিয়া তাহার শুশ্রূষার অনুরোধ করিল।

মাতা আসিয়া বধূর অবস্থা দেখিয়া কবিরাজ ডাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ললিতা বলিল, এই ত নবজ্বর, আজ থাক। জটিলা চলিয়া গেল।

শ্রীমতীর অবস্থা দেখিয়া ললিতা বিশাখাও বিস্মিত হইল। দেখিল সোণার অঙ্গ যেন কাল হইয়া গিয়াছে। চিন্তা-বিশীর্ণার ন্যায় উন্মনা হইয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তাহারা বলিল এত উতলা হইলে চলিবে না। ধৈর্য্য ধর। আগামী শরৎকালে আমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে। এত চিন্তায় দেহ ক্ষয় করিলে সে আনন্দের দিনে পৌঁছিতে পারিবে না। সেই আদেশ স্মরণ করিয়া আমাদিগকে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হইবে। আদেশের অর্থ আছে;—এক বৎসরকাল আমাদের চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। আমাদিগকে তাঁহার সেবার উপযুক্ত করিতে হইলে অনন্যমনা হইয়া সর্ব্বপ্রকার চিত্তের আবেগ পরিত্যাগ করিতে হইবে। সর্ব্ব প্রকার জড়তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবলে বলবতী হইতে হইবে। আরও একটা বিশেষ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে যে, আমাদের এই মহা গোপনীয় কর্ম্ম ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে না পারে। চিত্তের দুর্ব্বলতা আসিলেই বিপদ উপস্থিত হইবে। সংসারে সব কর্ম্ম করিব কিন্তু চিত্ত তাঁহাতে আবিষ্ট থাকিবে। আমাদিগকে কেবল সেই মহানন্দকর দিনের অপেক্ষায় আনন্দ ও উৎসাহের সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে।

বধূ—জানি সব, পারি না। এক দণ্ডের চিন্তায় আমার দেহ অবসন্ন ও কালিমাময় হইয়া যায়! রাত্রিতে নিদ্রা নাই; রাত্রি আসিলেই চিন্তায় দেহ জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। হস্ত কেবল তাঁহার সেবা করিতে চায়, পদ তাঁহার দর্শন জন্য ব্যাকুল হয়, কর্ণ তাঁহার বাঁশী ও বাক্য শুনিতে চায়, চক্ষু তাঁহার মোহনরূপ দর্শন জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, ত্বক তাঁহার স্পর্শামৃতের আস্বাদ চায়, জিহ্বা তাঁহার নাম গান ব্যতীত অন্য কিছুই চায় না, নাসিকা তাঁহার অঙ্গ-গন্ধের বাসনা করে, মন তাঁহার চিন্তায় যে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হইতে চায় না। সুতরাং দেহ কেমন করিয়া নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে? তজ্জন্য ইন্দ্রিয়গণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া দেহও বিবর্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

সই! কেমন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করা যায়? যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, মদনমোহন, চৌষট্টিকলা-বিশারদ, যাঁহার ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়, যিনি চিরকুমার, তিনি এমন নিদারুণ!

ললিতা—সই! বস্ত্র-হরণের কথা স্মরণ কর। তিনি সত্যবাক্। উতলা হইলে চলিবে না, সেই দিনের অপেক্ষা কর। আমাদের মধ্যে অনেক বাধা আছে, অনেক বৃথা লালসা আছে, অনেক পারিপার্শ্বিক মায়া আছে, আমরা এখনও আপন সুখ বিস্মৃত হইতে শিখি নাই, তজ্জন্যই কৃষ্ণসেবার অধিকারিনী হই নাই; এবং তজ্জন্যই তিনি সম্মিলনের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

আমারা তাঁহাকে না দেখিলে বাঁচি না বলিলে আমাদের স্বার্থেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এখনও তিনি মাতৃ-অঙ্কশায়ী। সুদীর্ঘ এক বৎসর কাল আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে অবকাশ দিয়াছেন এইজন্য। আমরা কৃষ্ণ-সেবার কি শিখিয়াছি? এখন আমরা তাঁহার রূপসাগরে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়াছি স্ব স্ব স্বার্থ সাধন জন্য! যে দিন আমরা তাঁহার রূপ গুণ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সেবায় আমাদের কর্ত্তব্য

উৎসর্গ করত তাঁহাকে আত্ম বিক্রয় করিতে পারিব, সেই দিন আমরা তাঁহার সেবা-দাসীরূপে গ্রহণের যোগ্য হইব। এখন আমাদের কর্ত্তব্য আত্মসম্বরণ করিয়া তাঁহার সেবার উপযুক্ত হইবার জন্য অন্তর বাহিরের সর্ব্বপ্রকার মায়ার বন্ধন ছেদন ও ইন্দ্রিয়ের লালসা পরিত্যাগ।

এমন সময় বাহিরে শব্দ হওয়ায় বধূ তাড়াতাড়ি শয়ন করিলেন। বিশাখা বধূর পাদ সম্বাহন ও ললিতা তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই অভিমন্যু বৈদ্য সমভিব্যাহারে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বধূর মুহুর্মুহুঃ কম্প হইতে লাগিল।

বৈদ্য বহুক্ষণ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, বায়ুপিত্তাধিক্যের জন্য কৃষ্ণতিল-তৈল প্রয়োজন। প্রাতঃস্নান ও স্নেহময় খাদ্য বিশেষ উপযোগী। নতুবা শীঘ্রই মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। এজন্য সর্ব্বদাই ইহাঁকে পরম পরিতোষে পালন করিতে হইবে অর্থাৎ ইঁহার ইচ্ছা পরিপূরণ পূর্ব্বক অত্যন্ত স্নেহাধিক্যে ইঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে হইবে, সুতরাং অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই সখীদিগের সঙ্গ করিতে দিবেন। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের যেরূপ দুর্ব্বলতা তাহাতে ইঁহাকে সাবধানে নাড়াচাড়া করিতে হইবে। ইনি বড়ই মানিনী। বাক্যের সামান্য রূঢ়তাও ইঁহার অসহ্য। এই অসামান্যা রূপশালিনী কন্যা বৃষভানুর পরম আদরের সন্তান। অত্যন্ত সোহাগে ইঁহার রুচি প্রবৃত্তি বিরুদ্ধভাবের হাওয়া যেন সহিতে পারে না। এই জন্য পুনঃপুনঃ বলিতেছি সর্ব্বদা সোহাগ-মাখা মাধুর্য্যে ইঁহার মন পরিতৃপ্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবং ইহাই ইঁহার একমাত্র চিকিৎসা। বিষ্ণু-তৈল বা নারায়ণ-তৈলে ইহার মনের উদ্বেগ নষ্ট করিতে পারিবে না।

অভিমন্যু—রোগটা কি ?

বৈদ্য—সোহাগাভাব।

অভিমন্যু—সে কি রোগ ?

বৈদ্য -- সোহাগ-লালিতার সোহাগের অভাব হইলেই এইরূপ মানসিক রোগ জন্মে। মনের চিকিৎসাই একমাত্র প্রয়োজন।

অভিমন্যু - এখানেও ত সোহাগের অভাব নাই ; সকলেই অতি আদর যত্নেই ইহাকে রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং বিকারের সম্ভাবনা কোথায় ?

বৈদ্য—তাহা আপনারা জানেন। আমি নাড়ী দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বলিলাম। ইনি কুমারী ; পতিগৃহের মমত্ববোধ এখনও ইঁহার জন্মে নাই। পিতৃভবন ত্যাগ জনিত বিরহবেদনাও ইঁহার হৃদ্দৌর্ব্বল্যের কারণ হইতে পারে।

অভিমন্যু —তবে কি ইহাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিব ?

বৈদ্য—তাহা হইলে ভালই হয়। সেখানে পদার্পণ মাত্র মনের আনন্দ জন্মিলেই রোগ দূরীভূত হইবে।

কুটিলা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহা শুনিয়া সে বলিল, সে কি কথা ? লোকে কি বলিবে ? বৌয়ের অসুখ হইয়াছে চিকিৎসা না করাইয়া যদি পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে লোকে বলিবে চিকিৎসার ব্যয়ের ভয়ে বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিল। বধূ আগমনের উৎসবের হাওয়া এখনও বহিতেছে !

বৈদ্য—লোকের কথার মূল্য কি ?

কুটিলা—ওমা ! সে কি কথা, লোক লজ্জা নেই ?

অভিমন্যু বৈদ্যকে বলিলেন যদি কোন ঔষধের প্রয়োজন হয়, তবে তাহা পাঠাইয়া দিবেন। ইহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া আপনাকে জানাইব। বাস্তবিকই কয়েকদিন মাত্র আসিয়াছে, তাহাও চিন্তার বিষয়।

[বৈদ্য দর্শনী হইয়া চলিয়া গেলেন]।

বৈদ্য চলিয়া গেলে জটিলা আসিয়া বলিলেন "ও বৈদ্যির কথা ছাড়, হিঁদুর মেয়ে শ্বশুর বাড়ী করবে না। বাপের যদি এত আদরের

মেয়ে তবে বিয়ে দিলে কেন? ঘরে রাখ্‌লেই ত হ'ত। থাকৃতে থাকৃতে সবই সয়ে যাবে। হাওয়া লাগলে গলে যায় এমন ননীর-পুতুল সকলেরই থাকে, তা' বলে কি কেউ শ্বশুরবাড়ী করে না? অভিমন্যু! দেখ ত বাবা গায়ে হাত দিয়ে—কি হ'য়েছে?

তাহা শুনিয়া বধূ আরও অধিকতর কাঁপিতে কাঁপিতে গায়ে লেপ মুড়ি দিয়া বলিলেন "না না কেউ আমার কাছে এসো না।"

কুটিলা—রোগ টোগ কিছু নয়—ও সব আদর! বাপের বাড়ী যাবার ফন্দী! তা হচ্চে না, এত আদর চলবে না। ও সব রোগ আমি বুঝি! দাদা তুমি সরে যাও, আমি দেখছি,—রোগের গোড়া আমি জানি।

অভিমন্যু—যাক্‌ যাক্‌—ও সব কথা ছাড়! ললিতা বিশাখা তোরা একটু কাছে বস। কি খেতে টেতে চায়, কি বলে শুনিস্‌।

কুটিলা—তবেই হ'ল,—আস্কারা দিয়েই সর্ব্বনাশ কর্ব্বে!

[অভিমন্যু কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন]।

অভিমন্যু বা আয়ান চলিয়া গেলে বধূ উঠিয়া বসিলেন এবং ননদিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ঠাকুর ঝি! তোমার কথার জ্বালাই আমার হৃদয়ে শেলের অপেক্ষাও বেশী বাজে! তোমার সতীত্বের বড়াই আমরা সে দিন দেখেছি, সবাই দেখেচে! তুমি নিজের জ্বালায় পুড়ে মরচ বলে সবাইকেই তাই মনে কর? যার তার কাছে আমার রোগের কথা বড় গলা করে যে বল্‌চ! আমার রোগ কি?

কুটিলা—কালাজ্বর!—আর কি?

বিশাখা—তা হলে বৌয়ের কথাই সত্যি দেখছি। তুমি এমন নিলর্জ্জ তা জানতুম না। কালাজ্বরে যে তুমি জর্জ্জরিতা, তা তোমার হৃদয়ের ভাবেই বোঝা যায়! লোকে শুনলে কি বলবে? যে এখনও যশোদার স্তন্য পান করে—দুগ্ধপোষ্য শিশু, তার নামে এ কি কলঙ্ক? উপহাস কত্তে কত্তে লোকে সত্যি বলে মনে করবে। এ ত তোমারই ভাজ, কলঙ্কের কালি তোমাদের মুখেই লাগবে।

ললিতা—কাল তোমার সতীত্ব বোঝা যাবে। যশোমতীকে নেমতন্ন করে আনব, আর গোপালকে তোমার কোলে বসিয়ে দিয়ে, দেশের লোককে ডেকে এনে তোমার ভাব দেখাব!

কুটিলা—তোরা সব পারিস্, তোদের অসাধ্য কিছুই নেই। তোরা রাগই কর আর যাই কর, বৌয়ের রোগের ওষুধ পেয়েচি! এক কথাতেই বৌয়ের কাঁপুনি ঝাঁকুনি সব চলে গেল! এ ওষুধ আর আমি জীবনে ভুলব না!

বিশাখা—আহা! তোমার সুমতি হ'ক। উহাই তুমি চিরদিন মনে রেখো! আমরা জগতের কৃষ্ণকৃপাই প্রার্থনা করি। তোমার কৃষ্ণে মতি হক, কৃষ্ণে মতি হক, কৃষ্ণে মতি হক—আমরা দেখে সুখী হই!

জটিলা—ওমা এই যে বৌমা উঠে বসেচে গো! হ্যা মা! জ্বর টর আর নেই ত? যমুনায় প্রাতঃস্নানের জন্যেই বুঝি ওরূপ হয়ে ছিল। হ্যা মা! এখন বুকের ধড়ফড়ানি গেছে ত? কুটিলা কিছু খাবার নিয়ে আয় মা, এই সময় বৌমাকে কিছু খাইয়ে দে।

বৌ—না মা, পূজা না করে, কি করে খাব?

জটিলা—তুমি না খেয়ে হাঁটতে পারবে? বুক ধড়ফড় করবে যে?

বৌ—কেউ আমার সঙ্গে গেলে কোন কষ্ট হবে না। শিবপূজা সেরে শীগ্রিই ফিরব।

জটিলা—মা বিশাখা, ললিতা! তোরা আমার কুটিলার ন্যায়ই স্নেহের পাত্রী। বৌমাকে নিয়ে একবার শিবপূজাটা করিয়ে নিয়ে আয় মা। বৌমা তোদিকে বড়ই ভালবাসে। তোদিকে না দেখলে কারো সঙ্গে কথাও কয় না। তোরা বৌমাকে একটু দেখসি মা; যখনই সময় পাবি, তখনই আস্‌বি এও তোদের ঘর, তোরা অন্য কিছু মনে করিস্‌ন।

ললিতা—তা ত বল্‌চ মাসীমা, আমাদেরও ত ঘর বাড়ী আছে, বাপ মা, ভাই পরিজন আছে, তাদিকে ছেড়েই বা কি করে আসি?

তবে তোমার বৌ আমাদিকে বড়ই ভালবাসে সেইজন্যে মায়ায় পড়েচি। শীগ্‌গির আয়োজন করে দিন, পূজা সেরে চলে আসি।

জটিলা—আয়োজন সবই ঠিক আছে। বৌমার অসুখ বলে কুটিলাকে পাঠাব মনে করেছিলুম। বাড়ীতেও ত শিব ঠাকুর আছেন, তোমরা না হয় এখানেই পূজো কর, আমি গোপেশ্বরের পূজো না হয় পাঠিয়ে দি।

ললিতা—সেটা তোমাদের ইচ্ছে। কুটিলে না হয় সেখানে পূজো নিয়ে যাক্। যা হ'ক এক জনকে ত যেতে হবে।

জটিলা—হ্যাঁ মা, তা বটে। ঘরের পূজোর ব্যবস্থা কচ্চি। তোমরা গোপেশ্বরের পূজোটা আগে সেরে এস।

জটিলা বিশাখা ললিতাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া নৈবেদ্য ও পুষ্পাদি দিয়া বৌকে যাইবার আদেশ করিয়া বলিলেন, "বাছা! শিবপূজা কর্‌লে স্বোয়ামীর কল্যেণ হয়, তোমরা শীগ্‌গীর শিবপূজো সেরে এস, আমি আহারের ব্যবস্থা কচ্চি। ওমা তোরাও এসে খাবি। মাথা খাস্ ঘরে খাসনি।"

ইহা বলিয়া তিনি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। বধূ সহিত ললিতা বিশাখা শিব পূজার জন্য গোকুলের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর গিয়াই ললিতা বিশাখার হাসির ফোয়ারা ছুটিল! পথে আরও কয়েকজন সঙ্গিনী জুটিল। এবং নানা কথা ও আনন্দে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। শিব মন্দিরে যাইবার আদেশ পাইয়া আনন্দের সীমা নাই, নানা কথায় পথ প্রান্তর মুখর করিয়া চলিয়াছে। কতক্ষণ পরে তাহারা লক্ষ্য করিল রাধারাণী নীরব। বাহিরে আসিয়াই সহসা তাহার প্রাণ যেন কাঁপিয়া উঠিল, ললিতা বিশাখার স্কন্ধদেশ আলিঙ্গন করিয়া চলিলেও শরীর যেন ক্রমশঃ ভারী হইয়া উঠিতে লাগিল।

ললিতা বলিল সই! তুমি আমাদের কথোপকথনে যোগ দিতেছ না কেন? শ্রীরাধা বলিলেন সই! বিয়োগের ব্যথাই আমাকে ভারী করিয়া তুলিতেছে, যতই কাননের দিকে চাহিতেছি ততই আমার মন উদাস হইয়া উঠিতেছে! ভাই! আর আমি চলিতে পারিতেছি না, আমায় ধরিয়া কি করিবে কর, নতুবা যমুনার তীরে রাখালগণের গোচারণ দর্শন করাও।

ললিতা বলিল চল চল দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া চলিয়া আসিব, তাহা হইলে তোমার মন শান্ত হইবে ত? তুমি চলিতে পারিবে বলিয়াই তোমার শাশুড়ীকে বলিয়া আসিয়াছি, এখন অচল হইলে চলিবে কেন?

বিশাখা বলিল,—সই! তোমার যেরূপ ভাব দেখিতেছি গোপালকে দেখিয়া মূর্চ্ছা যাইবে না ত? তাহা হইলে গোপীদের নামে কলঙ্ক হইবে, ভরম ভাঙ্গিয়া যাইবে। তোমার জন্যেই ত আমরা কালাকে সত্যবদ্ধ করিয়াছি। এত উতলা হইলে আমাদের উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত পড়িবে,—হয় ত বা বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে।

শ্রীরাধা তাহাদের কথার উত্তর না দিয়া উৎকর্ণ হইয়া বনের দিকে চাহিয়া চলিলে লাগিল।—যেন বনের বৃক্ষলতার পত্রে পত্রে কাহার রূপ অনুসন্ধান করিতেছেন, কর্ণে যেন কি শব্দ শুনিবার আশায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চলিয়াছেন, সখীদের কথা যেন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না, সম্মুখে যে কেহ আছে চক্ষু যেন তাহা দেখিতে পাইতেছে না,—দূরে—অতি দূরে যেন কাহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহাকুল চিত্তে গলা বাড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন! সখীগণ কথা বলিবার চেষ্টা করিলে নিঃশব্দে তাহাদের গা টিপিয়া তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহা দেখিয়া সখীরা চিন্তাকুলা হইলেন এবং ভাবিলেন কি সর্ব্বনাশ! না দেখিলে বুঝি প্রাণ যায়! তাহারা অনুভব করিল যেন তাঁহার মনে হইতেছে!—

কিরূপ দেখিলুঁ মধুর মূরতি
পীরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক যার॥
বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনি
কপালে চন্দন চাঁদ।
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর
ভুবন মোহন ফাঁদ॥
নব জলধর রসে ঢর ঢর
বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন,
মণি মুকুতার মালা॥
জোড়া ভুরু যেন কামের কামান,
কে গো কৈল নিরমাণ।
তরল নয়নে তেরছ চাহনি
বিষম কুসুম-বাণ॥
সুন্দর অধরে মধুর মুরলী
হাসিয়া কথাটী কয়।
দ্বিজ ভীম কহে ওরূপ নাগর,
দেখিলে পরাণ রয়॥

—বুঝি সেই রূপ অন্বেষণ করিতেছে যেন দেখিলে পরাণ রয়!—না দেখিলে বুঝি প্রাণ যায়!—সখীরা তাহা অনুমান করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহার সহিত চলিতে লাগিল।

কত পরকারে দেখিলুঁ তাহারে
লখিতে নারিলুঁ কি।

রাই উন্মনাঃ হইয়া যেন এই চিন্তা করিয়া চলিয়াছে "তাই ভ

এতবার এত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও তার রূপের এক কণাও ধারণা করিতে পারিতেছি না? আহা কি সেইরূপ!"—যেমন সেইরূপ মনে জাগিল অমনই অধীরা হইয়া ব্যাধের বংশীধ্বনি শুনিয়া বনবিহারিনী হরিণীর ন্যায় গলা বাড়াইয়া "ইতি উতি" চাহিয়া অধীর ভাবে চঞ্চল নয়নে কাহাকে দেখিবার জন্য যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া চলিয়াছেন!

ললিতা তাহা দেখিয়া বিশাখার কানে কানে বলিল সাবধান হও, নন্দনন্দনকে দেখিলে মূর্চ্ছা যাইবে, আবার না দেখিলেও বুঝি প্রাণে মরিবে! এখন উপায় কি? কেমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করা যায়?

বিশাখা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্রীরাধার গলা ধরিয়া কানে কানে বলিল, সই! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আমরা শিব মন্দিরে না যাইয়া কালিন্দীর কূলে আসিতেছি জানিয়া জটিলা আমাদের অনুসরণ করিতেছে। এখন অতি সত্বর নিকটস্থ কোন শিব মন্দিরে প্রবেশ করা ভিন্ন আমাদের উপায় নাই!

তাহা শুনিয়া অমনই শ্রীরাধার চমক ভাঙ্গিল! বলিল চল চল চল, যেমন করিয়া পার নিকটস্থ এক শিব মন্দিরে সত্বর প্রবেশ কর। ললিতাও ত্বরান্বিতা হইয়া সখীগণকে লইয়া অতি দ্রুত নিকটস্থ এক শিব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সকলে মিলিয়া পুষ্পচন্দনে মহাদেবের পূজায় নিরত হইল। এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল ঃ—নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায় নমঃ। সখীগণ সকলেই পুষ্প বিল্বপত্র রক্তচন্দনসিক্ত করিয়া অক্ষত সহিত উক্ত মন্ত্রোচারণ পূর্ব্বক মহাদেবের লিঙ্গ শরীরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ললিতা লক্ষ্য করিল শ্রীরাধা পত্র পুষ্প হস্তে লইয়া নয়ন জলে ভাসিতেছে। মহাদেবের লিঙ্গশরীর সমুজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া তাহার কৃষ্ণোদ্দীপনা হইয়াছে, ক্রমশঃ অঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে। ললিতা বলিল সই! মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সচন্দন পুষ্প বিল্বপত্র গৌরীপট্টস্থ মহাদেবের লিঙ্গশরীরে প্রদান কর। মহাদেব আশুতোষ—স্বভাবদাতা—তোমার মনস্কামনা

পূর্ণ করিবেন। শিব মন্দিরে আসিয়া পূজা না করিয়া জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকিলে অপরাধ হয়। সুকর্ম্মই দুর্গতি নাশের একমাত্র উপায়। আমরা কাত্যায়নী পূজা করিয়া যে বর লাভ করিয়াছি, মহাদেব পূজায় সত্বরই তাহা সম্ভোগ করিতে পারিব ; সই ! তজ্জন্য চিন্তিত হইও না। আমরা সহস্রে সহস্রে কাত্যায়নী পূজা করিয়া যে বর লাভ করিয়াছি, এখন দেখিতেছি তাহা কেবল তোমারই পুণ্য বলে। তোমার আকর্ষণে নন্দনন্দন যমুনা পুলিনে সমাগত হইয়া আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়া গিয়াছেন। তোমার ন্যায় আর কাহারই ত এমন মধুর ভাব দেখিতেছি না। এমন তন্ময়তা যখন তোমাতে আসিয়াছে তখন আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে লাভ করিয়া ধন্য হইব। নন্দনন্দনকে প্রাপ্তির জন্য এমন তন্ময়তা না আসিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তুমিই আমাদের যূথেশ্বরী। তোমার কৃপাতেই আমরা কৃতকৃতার্থ হইব। তুমি আমাদের যূথেশ্বরী, তুমি আমাদের যূথেশ্বরী, তুমি যূথেশ্বরী। তোমার দেহ আমাদের পরম বস্তু। আমরা মন প্রাণ দেহ দিয়া তোমার দেহের সেবা করিয়া বাঞ্ছিত রত্ন লাভ করিব। কিন্তু তোমার অবস্থা দেখিয়া আমাদের কেবল ইহাই মনে হইতেছে যে, একমাত্র তুমিই নন্দনন্দনের যোগ্যপাত্রী, আমরা অধমা। অতএব আমরা আর আমাদের সম্ভোগের বাসনা পোষণ করিব না। কেবল তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করাই আজ হইতে আমাদের কার্য্য হইল। আমরা সর্ব্বদা দাসীর ন্যায় তোমার সেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে চাই ! আমরা না বুঝিয়া নন্দনন্দনকে কামনা করিয়া ছিলাম, এখন দেখিতেছি নন্দনন্দন একমাত্র তোমারই সম্ভোগের বস্তু। তুমি তাঁর, তিনি তোমার। সখি ! আমাদিগকে কৃপা কর, আমরা না বুঝিয়া তোমার চির-সম্ভোগের ধনকে সম্ভোগের প্রয়াস করিয়া ছিলাম। সখি ! যদি আমাদিগকে দাসীত্ব দাও তবেই আমরা প্রাণে বাঁচিব, নতুবা যমুনার জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব,

মনে অন্য কিছুই ভাবিও না, কারণ সখীত্বের পরাকাষ্ঠাই দাসীত্ব। সখী বলিয়া আমাদিগকে যে সম্মান ও আন্তরিকতা প্রদর্শন কর, তোমার দেহ রক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা কোন কার্য্য করিলে তজ্জন্য সঙ্কুচিত হইওনা, এজন্যই একথা বলিলাম।

ললিতার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যে শ্রীরাধিকার ঘোর কাটিল। তিনি ধীরে ধীরে অর্দ্ধ বাহ্যে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, সই! ও কথা বলিও না, তোমাদিগকে অবলম্বন করিয়াই আমার জীবন আছে। তোমরা আমার সখী, আমার প্রাণ, মন ও দেহ। তোমরা যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব। আমি স্বয়ং বহু চেস্টা করিয়াও স্ববশে থাকিতে পারিতেছি না। আমার দেহ মাত্র অবশিষ্ট আছে, মন-প্রাণ সেই প্রিয়তমের শ্রীচরণে বিক্রয় করিয়াছি। সে বিক্রয় যেন আমার ইচ্ছাকৃতও নহে, তিনি বলপূর্ব্বক তাহা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এখন আমার কর্ত্তব্য যাহা হয়, তাহা তোমরা কর, আমি ইহার কিছুই জানি না।

ললিতা বলিলেন সই! তুমিই আমাদের জীবন ও মান রক্ষা করিলে। নন্দনন্দন কৃষ্ণকে কেমন করিয়া ভাবনা করিতে হয়, কেমন করিয়া ভজনা করিতে হয়, তাঁহাতে কেমন করিয়া মন প্রাণ দেহ সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে হয়, তাঁহার ধ্যানে কেমন করিয়া দেহ মন শুদ্ধ করিতে হয়, কেমন অনুরাগে তাঁহাকে আকর্ষণ ও তাঁহার বালত্ব ঘুচাইয়া তাঁহাকে যুবকে পরিণত করা যায়, তাহা আমরা কেহই ধারণা করিতেও পারি নাই, এজন্য তুমি আমাদের সখী হইলেও পথ প্রদর্শিকা পূজনীয়া আর্য্যা। আমরা সকলেই তোমারই পথ অনুসরণ করিব। সই! তুমিই আমাদের জীবন। তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমরা শ্রীনন্দনন্দনের সেবার অধিকারী হইব। এতদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াই অবস্থান করিতেছিলাম, এবার আমরা যুথ সংস্থাপন করিয়া এক এক যুথে আসিয়া তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবন সার্থক করিব। কেমন করিয়া নন্দনন্দনের সেবা করিতে হয় তাহা তোমারই নিকট শিক্ষা

করিব। শ্রীনন্দনন্দন সাধারণভাবে আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেও আমরা তাঁহার সেবিকা হইবার উপযুক্ত নহি। আজ হইতে তোমার প্রীতিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইল। আমরা যদি নন্দনন্দনের সেবার করিবার অধিকার পাই, তবে সে অধিকার তোমার সেবা হইতেই লাভ করিব। তোমাকে অগ্রণী করিয়াই আমাদের মান রক্ষা করিব, নন্দনন্দনকে দেখাইব যে, কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় তাহা তুমি জান না, প্রীতি প্রেমের আদর্শ কি তাহা আমাদের এই সখীই তোমায় শিক্ষা দিবে।

কৃষ্ণপ্রেম কি তাহা আমরা জানি না, আমাদের কেহই জানে না। আমরা শুধু জানি ভোজন ও শয়ন। নন্দনন্দনের স্বীকৃতি অবলম্বন করিয়াই অভ্যাস বশে—এমন কি কাত্যায়নী আরাধনার আগ্রহ আকাঙ্ক্ষাকেও বিসর্জ্জন দিয়া—বেশ আনন্দেই দিন কাটাইতেছি, এক দিনও অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করি নাই; নন্দনন্দকে আমরা সহজ লভ্য বলিয়াই মনে করিয়াছি। নন্দনন্দন যে কি জিনিস তাহা এতদিন বুঝি নাই। সই! তোমার প্রেরণায় আজ বুঝিতেছি তিনি কি হৃদয়ে ধন, কেমন করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে হয়। আরও সহজ প্রাপ্য যে জিনিস তাহার মূল্য কম। অতিশ্রমে অতি আয়াসে যাহা লাভ হয় তাহাই দুর্লভ,—তাহারই মূল্য অত্যধিক। লোকে দুর্লভ ধনকে অতি সমাদরে গোপনে রক্ষা করে। নন্দনন্দনকে মহারাজ নন্দ ঘোষের পুত্র এবং আমাদেরই একজন ব্রজবাসী জ্ঞান করিয়া বিষম ভ্রম করিয়াছি। তাঁহার এত অলৌকিক কার্য্য, এত শক্তি, সামর্থ্য, এমন অপরিসীম বুদ্ধি ও সাহস দেখিয়াও তিনি আমাদেরই এক জন এই ভাব মনে জাগিয়াছিল। আজ তোমার সমাধিতে তাঁহার গুরুত্ব ও মহামহিমত্ব বুঝিতেছি। বাস্তবিকই যাঁহাকে এতদিন সহজ লভ্য বলিয়া মনে করিয়াছি, কৈ তিনি ত আর আমাদিগকে ধরা দেন নাই। ধরা দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব যেন দিনে দিনে বাড়িতেছে!

ক্রমেই যেন তিনি দুস্প্রাপ্য বা দুর্লভ হইয়া উঠিতেছেন! এজন্য আমারা সর্ব্ব প্রকারে তোমারই অনুবর্ত্তন করিব। তোমার এই অসীম আন্তরিকতা দেখিয়া আমাদের সর্ব্ব প্রকার লালসা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে! তোমার অপূর্ব্ব শারীরসৌন্দর্য্য ও অসীম লাবণ্য দেখিয়া জগৎ মোহিত হয়! কিন্তু তাঁহার প্রতি তোমার প্রীতি প্রেম ও সাধনার উন্মাদনায় আমাদিগকে তোমার দাসীত্বে নিয়োগ করিতেছে। তুমি যাহাই বল আমরা তোমারই কৃতদাসী; এজন্য লজ্জা করিও না। আমরা প্রাণ দিয়াও তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব, তুমি চিন্তিত হইও না। নন্দনন্দনের প্রতিশ্রুতির দিনও নিকট হইয়া আসিতেছে! বিশেষতঃ তুমি যেভাবে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছ তাহা দেব দুর্লভ! সই! মহাদেবের শ্রীচরণে পুষ্প-বিল্বদল দাও, ইনিই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।

শ্রীরাধা যো সো করিয়া হস্তস্থ পত্রপুষ্পাদি মহাদেবের অঙ্গে নিক্ষেপ করত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্রোড়ে লইয়া ললিতা ও বিশাখা কর্ণে ধীরে ধীরে কৃষ্ণ নাম শুনাইতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিয়া বলিলেন সই! কেন আমায় জাগাইলে? আমি যে পরম সুখে নন্দনন্দনের ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিলাম।

বিশাখা বলিল সই! তোমার এই মূর্চ্ছা রোগ হইয়াছে প্রকাশ পাইলে তোমার শাশুড়ী ননদী আর তোমায় গৃহ হইতে বাহির হইতে দিবে না। তাহা হইলে আমরা তোমাকে হারাইব। তুমি প্রকৃতিস্থা হও, গৃহে চল, তবেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

শ্রীরাধা বলিলেন, আমি কি কোন মন্দ কাজ করিয়াছি? আমার কাজে তোমরা ব্যথা পাইয়াছ? তজ্জন্য তোমাদিগকে লোকে মন্দ বলিবে? না না তেমন কাজ করিব না। তোমরা যাহা বলিবে তাহাই করিব। আমার কি হইয়াছে আমি কিছুই জানি না। তবে আমি নন্দনন্দনের চিন্তায় আত্মসম্বরণ করিতে পারি না,

আমার যে কি হয় তাহা বলিতে পারি না—তোমরা আমায় রক্ষা কর। আমার বেয়াদবি দেখিলে ধমকাইও, আমাকে সহজ পথে লইয়া যাইও।

ললিতা—সই! আমরা অনেকক্ষণ আসিয়াছি। বিলম্ব দেখিলে কুটিলা আমাদিগকে খুঁজিতে আসিবে, তোমার এভাব দেখিলে একটা অনর্থ হইবে। তাহাতে আমাদের সাধনায় বাধা পড়িবে। এখন চল চল শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া যাই।

সকলে শ্রীরাধাকে লইয়া গৃহে ফিরিল।

শ্রীরাধার এই ভাব সখীদের মধ্যে সত্বর প্রচারিত হইল। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে এবং এক এক যূথে আসিয়া তাঁহার সেবায় নিয়োজিত হইতে লাগিল।

তাহারা আসিয়া দেখিল ঃ—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায়॥

তখন তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল ঃ—

রাই কেনে বা এমন হইল।
গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব পাইল॥

তাহারা আরও দেখিল ঃ—

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল,
সম্বর নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে॥

তখন মনে মনে বলিতে লাগিল ঃ—

বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাঢ়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা॥

কবি বলিতেছেন ঃ—

তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাঢ়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥

চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীগণও রাইয়ের এই অভিনব ভাবের কথা শুনিয়া চঞ্চল হইয়া দেখিতে আসিল। এবং শ্রীরাধার সেই ভাব দেখিয়া কতকটা ঈর্ষান্বিতাও হইল। চন্দ্রাবলী বলিল সই! তুমি কি পাগল হইলে? তোমার কার্য্যের স্থিরতা নাই, বাক্যের সামঞ্জস্য নাই, গুরুজনের ভয় নাই, সদাই চঞ্চল, উন্মনা, কাহারও সহিত কথা কহিতে চাহ না, কাহাকেও দেখিতে চাহ না, সর্ব্বদাই নির্জ্জনে বসিয়া থাক, চমকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে, অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইতেছ, সোণার অঙ্গ কালি হইয়া গিয়াছে! ক্ষুধা তৃষ্ণারও প্রবৃত্তি নাই, চিন্তায় অনিদ্রায় চক্ষু কোটরগত হইয়া কালি পড়িয়া গিয়াছে। তোমার কেন এমন দশা হইল? গৃহে তোমার উপর অত্যাচার হইতেছে? তজ্জন্যই তুমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছ? সই! তোমার মনোদুঃখের কারণ না জানায় আমাদেরও দুঃখ হইতেছে! আমাদের নিকট মনের কথা বলিলে আমরা তাহার প্রতিকার করিতে পারি।

অশ্রুমুখী হইয়া শ্রীরাধিকা বলিলেন ঃ—

সই! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতি ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মন পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুলনাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

শ্রীরাধার অন্তরের কথা শুনিয়া চন্দ্রাবলী কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল সই! সে জন্য এত অধীরতা কেন? শ্যাম যে এখনও বালক! তোমার এই কাতরতার শ্যাম কি বুঝিবে? বস্ত্রহরণের প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে বটে, বিশ্বাস হয় না। রাখাল বালকের খেয়ালও হইতে পারে! তাহার অপরূপ রূপলাবণ্য জগতের সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছে, শুধু আমাদিগকে নহে। তাহা হইলেও দেহের একটা ধর্ম্ম আছে। বালক প্রেমের কি বুঝিবে? দেহ-ধর্ম্ম সময়োপযোগী যখন হইবে, তখনই পরস্পর পরস্পরের মর্ম্ম বুঝিতে পারে, আকাঙ্ক্ষার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। তুমি অসময়োচিত আকাঙ্ক্ষায় নিজের সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছ। এখনও নিবৃত্ত হও—ধৈর্য্য ধর। কারণ তোমার এই ভাবের কথা ত ব্রজময় রাষ্ট্র হইয়াছে, কৈ শ্যাম ত বিচলিত হয় নাই! তজ্জন্যই বলিতেছি, বালক প্রেমের কি বুঝিবে?

শ্রীরাধা বলিলেন ঃ—

মনের মরম কথা তোমারে কহি গো হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল চরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥

রজনী সাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চির-অঙ্গে
নিদ্রা যাই মনের হরিষে॥

শিখরে শিখণ্ডরোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহুরে কুতূহলে।
ঝিঁজা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনুঁ হেন কালে॥

মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক রহু কুলের কামিনী॥

রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখ ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেয় ছলে
আমা কিন বিকাইনু বোলে॥

কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥

রসাবেশে দেই কোল, মুখে নাহি সরে বোল,
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয়ে মান গেল,
ভাবে ভোর চিত মোর ভাবিতে লাগিল॥

তাহা শুনিয়া চন্দ্রাবলী চমকিয়া উঠিল! কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল সই! স্বপ্নে বিশ্বাস? স্বপনে অমন কত কি দেখা যায়, স্বপ্নে দরিদ্র রাজা, এবং রাজা ভিখারী হয়। স্বপ্নান্তে তাহা অসার বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। স্বপ্ন অলীক চিন্তা মাত্র।

আরও এক কথা, তোমার এই উন্মাদনা আমাদের সকলেরই সর্ব্বনাশ করিবে। তুমি এখনই এমন উন্মাদিনী হইলেই চলিবে না। জানাজানি হইলে লোকেই বা কি বলিবে? বালকের প্রতি তোমাদের মত নবীনাদের প্রেমের কথা শুনিলে লোকের টিটকারিতে বাঁচিবেনা, আত্মস্বম্বরণ কর। প্রতিশ্রুতির দিনের এখনও বিলম্ব আছে। সে দিনে কি হয় তাই বা কে জানে? জল না দেখিয়া উলঙ্গ হইলে লোকে মস্তিষ্ক বিকারেরই পরিচয় পাইবে।

সে কথার উত্তর না দিয়া শ্রীরাধা বলিলেন ঃ—

কি পেখলুঁ যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গো
বিকাইলু তার আঁখি ঠারে॥

চন্দ্রাবলী বলিল তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তোমার সহিত কথা কহাও এখন বৃথা। যদি তুমি প্রকৃতিস্থা না হও, তবে আর তোমার নিকট আসিব না। তুমি যখন আমাদেরও সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ, তখন কলঙ্কের ভাগী হইবার জন্য আর কেন তোমার নিকট আসিব? আমি সাবধান হইবার জন্য আমার মতাবলম্বিনীদের লইয়া নিজের যূথ গঠন করিয়া দূরেই অবস্থান করিব। তুমি আমাদিগকে তোমার সাহায্য করিতে বঞ্চিত করিলে। তোমার

শাশুড়ী ননদী যেরূপ মুখরা, তাহাতে এই অসম্ভব প্রেমের কথা রাষ্ট্র হইলে তোমার প্রাণে বাঁচাও দায় হইবে। তুমি এখনও সাবধান হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

চন্দ্রাবলীর কোন কথাই যেন শ্রীরাধার কানে গেল না। তিনি সেই রূপধ্যানমুগ্ধনেত্রে চিন্তাকুলিত চিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

চিকণ কালা গলায় মালা
বাজন নপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়নে চায়॥
কালিন্দীর কুলে কি পেখলুঁ সই
ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু যাইতে নারিলুঁ সই
আকুল করিল প্রাণ॥
চাঁদ ঝলমলি ময়ূর পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া মোহন বাঁশী
মধুর মধুর চায়॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা॥

ইহা শুনিয়া চন্দ্রাবলী সঙ্গিনীদিগকে বলিল আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সত্বর এস্থান ত্যাগ করাই ভাল। ইহা বলিয়া পলায়ন করিল বটে; কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইল। ভাবিল সর্ব্বনাশ! ভগবান্ প্রেমের বশ—তিনি মিঠাই মণ্ডায় ভুলেন না। হৃদয়ই তাঁহার

রাজ্য! রাধা যে ভাবে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে আমাদের আশা পুরণের আশা সুদূরপরাহত। শ্যামকে বালক বলিয়া উপেক্ষা করিবার জন্য রাধাকে যাহা বলিয়াছি সে তাহা গ্রাহ্যও করে নাই। সে কৃষ্ণের মর্ম্ম যথার্থই বুঝিয়াছে। ভক্তপ্রাণ কৃষ্ণ এই উন্মাদিনারই বশীভূত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন যে কোন উপায়ে ইহাকে নিবৃত্ত করাইতে না পারিলে আমাদের অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ সংকল্প করিয়া চন্দ্রাবলী নিজ যূথের সখী পাঠাইয়া জটিলা কুটিলাকে বিষয়টা অবগত করাইবার জন্য সচেষ্ট হইতে লাগিল।

কিন্তু আবার ভয়ও হইল, বালকের সহিত প্রেমের কথা বলিলে লোকে বিশ্বাস ত করিবেই না, উপরন্তু এইরূপ নিন্দাকারিনীদিগকে গালাগালি করিবে, এমন কি প্রহার পর্যন্ত করিতেও পারে। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া চন্দ্রাবলী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল।

এদিকে চন্দ্রাবলী চলিয়া গেলে কিয়ৎকাল পরে ললিতা, বিশাখা, সুচিত্রা, ইন্দুলেখা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, ও সুদেবী বহু সখীর সহিত সমাগত হইলেন। দেখিলেন, শ্রীরাধা সখীদিগকে দেখিয়া কোন কথা না বলিয়া অবিরাম অশ্রুধারায় বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিলেন। তাঁহারা নানা প্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু যেন কোন কথাই তাঁহার কর্ণে গেল না, দ্বিগুণ বেগে আরও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বিশাখা উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার কাণে কৃষ্ণনাম শুনাইলে কিয়ৎকাল পরে তিনি প্রকৃতিস্থা হইলেন এবং সখীদিগকে সমাগত দেখিয়া যেন কিছু লজ্জিত হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া ললিতা বলিলেন, সই! আমাদের জন্য তোমাকে ব্যস্ত সমস্ত হইতে হইবে

না। তুমি সুস্থ হইলেই আমরা সুখী হই, তোমার জন্যই আমাদের চিন্তার সীমা নাই. আমরা কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারি-তেছি না। প্রতিশ্রুতির দিনের এখনও অনেক বিলম্ব। চিন্তায় তোমার শরীর যেরূপ শীর্ণ বিবর্ণ ও কালিমাময় হইয়া গিয়াছে, ইহাতে আমরা বড়ই কাতর হইয়াছি। আমাদিগকে যদি বাঁচাইতে চাও, তবে ধৈর্য্যাবলম্বন কর। তোমার শাশুড়ী ননদীর যেরূপ খ্যাতি আছে, তাহাতে তোমার কোনরূপ কলঙ্কের কথা শুনিলে আর কি তাহারা তোমায় রাখিবে? গঞ্জনায় তোমার প্রাণান্ত হইবে। কিন্তু ভাগ্যের ভাল যে, কালাচাঁদ এখনও বালক। তজ্জন্য কালাপ্রেম লোকে বিশ্বাস করিবে না। সংবাদ পাইলাম চন্দ্রাবলী নাকি আসিয়াছিল? চন্দ্রাবলী আমাদের সহিত একত্রে কাত্যয়নী পূজায় যোগদান করিলেও সে তোমার সৌন্দর্য্যের হিংসা করে। সে যখন আসিয়া ছিল, তখন একটা কিছু না কিছু বিপদ না ঘটাইয়া ছাড়িবে না। এজন্য আমাদিগকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে। আমরা ইতিমধ্যেই অষ্ট সখীর যূথ গঠন করিয়াছি; তোমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানই আমাদের কাজ। তোমাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা অভীষ্ট লাভ করিব। তোমাকে সুস্থ না দেখিলে কোন কার্য্যেই আমাদের উৎসাহ থাকে না। কিন্তু আর একটা সুখবর!— তোমার জন্যও শ্যাম ব্যাকুল। তথাপিও তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তোমার আকর্ষণে তিনি বিচলিত হইয়াছেন বলিয়াও বিশেষ সংবাদ পাইয়াছি। কিন্তু ভাই তাঁহাকে সাধারণ মানুষ ত ভাবিতে পারি না। তজ্জন্য তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিতে হইবে। বুঝি যে, যিনি অনায়াসে ছত্রকের ন্যায় গিরি ধারণ করিতে পারেন, তাঁহার অসাধ্য ও অসম্ভব কার্য্য কি আছে? তাহা হইলেও তাঁহার নিকট আমরা হীনবুদ্ধি; তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝি-বার সাধ্য আমাদের নাই। যাহা হউক, আমরা এক বুদ্ধি ঠাওরাই-

ছি, তুমি ত উত্তম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পার, তুমি প্রত্যহ তাহা প্রস্তুত কর, আমরা গোপনে তাহা যশোমতী দেবীকে দিয়া আসিব। তিনি তোমার স্বহস্ত পক্ক মিষ্ঠান্ন প্রার্থনা করিয়া ছিলেন এই জন্য যে, দুর্ব্বাসার বর প্রভাবে তোমার হস্তের পক্ক মিষ্ঠান্নাদি ভোজ্য দ্রব্য যে ভোজন করিবে তাহার আয়ুঃ বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং তাহা পাইলে যশোমতী ও নন্দমহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন এবং উক্ত মিষ্ঠান্নাদি ভোজ্য দ্রব্যের সংবাদ তাঁহারা গোপালকেও বলিবেন। এইরূপে গোপাল আমাদের প্রতি কৃপাসম্পন্ন হইবেন। এইরূপে গোপালের সেবা করিয়া আমরা সেই দিনের জন্য আনন্দে অপেক্ষা করিতে পারিব। কারণ গোপাল সর্ব্বদ্রষ্টা, তাঁহার নিকট কিছুই অবিদিত নাই।

বিশাখা আসিয়া বলিতেছিল যমুনায় তোমার রূপ দেখিয়া তাঁহারও নাকি ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। তোমার সঙ্গলাভের জন্য তাঁহারও আগ্রহের সীমা নাই। তবে তিনি সত্যসন্ধ তাই ধৈর্য্যধারণ করিয়া আছেন। তজ্জন্য বলিতেছি সই! আমাদের কাত্যায়নী পূজা সার্থক হইয়াছে। তুমি ধৈর্য্যধারণ কর। তুমি অধীর হইলে নাগর উপেক্ষা করিয়া আমাদিগকে পাইয়া বসিবে। তুমি ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিলে তাঁহার প্রতিশ্রুতির দিনও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে। নাগর অধীর হইলে আমাদের অভীষ্ট সহজেই লাভ হইবে। তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া তোমার উন্মাদনার লক্ষণ গোপন রাখিতে হইবে।

রাধিকা বলিলেন সই! তুমি যাহা বলিলে তাহা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বটে, কিন্তু আমি যে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। শ্যামরূপ মনে আসিলেই যে আমার চেতনা লোপ হইয়া যায়। তবে তোমরা আমার সঙ্গে থাকিয়া শ্যাম-সেবা-রূপ কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত রাখিয়া চৈতন্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা কর, ইহাই আমার ইচ্ছা। একাকী থাকিলেই আমার শ্যামরূপ মনে জাগে। তোমাদিগকে

দেখিলে আমার আশার সঞ্চার হয় তজ্জন্য আত্যন্তিক আগ্রহের কতকটা অবসান হয়। সই! তোমরা যাহা হয় কর। আমি আমার নিজ সত্ত্বা হারাইয়াছি, এখন তোমাদের আশ্রিত, আমার এই দেহ লইয়া তোমরা যাহা করিতে হয় কর, আমার ভাল মন্দ জ্ঞান রহিত হইয়াছে।

ললিতা বলিল—সই! তুমি যদি অধীরা না হও, তবে প্রতি-শ্রুতির দিনের জন্য ব্যস্ত না হইয়াও আমরা অলক্ষ্য হইতে শ্যামরূপ দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি। এবং তিনি যদি কোন্ দিন তোমায় দেখিয়াও ফেলেন, তাহাতেও তুমি বিচলিত হইও না।

রঙ্গদেবী বলিল—সই! ধীরা অধীরার কথা নয়। শ্যাম যাকে টানে সেই হয় অধীরা! কারণ শক্তি থাকিলে ত টান সহ্য করা যায়, নতুবা টলিতে হয়!

চম্পকলতা—তাহাও সত্য; আবার সূর্য্য কিরণ সর্ব্ব পদার্থে পড়িলেও পদ্মরাগ মণিতে যেমন প্রতিভাত হয় এবং তাহার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে, মাটীতে কি তেমন হয়? আমাদের সই রাধা পদ্মরাগমণি! অন্ধকারেও ঔজ্জ্বল্যের সীমা নাই; তাহার উপর শ্যামসূর্য্যের কিরণ পড়ায় রূপে জগৎ আলো করিয়াছে।

ইন্দুরেখা—না সই, তাহা নহে। কালীয়-ফণিভূষণ শ্যামনীল-মণি নিজ উদরান্ন সংস্থানের দুর্ভাবনা নিবারণ জন্য পদ্মরাগমণিকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে।

সুচিত্রা—সে কি রকম?

ইন্দুলেখা—ফণী যেমন মণিকে নিজ বদন মধ্যে সযত্নে এইজন্য রক্ষা করে যে, তাহার প্রভায় আলোক ভ্রমে, রূপের কাঙ্গাল কীট পতঙ্গাদি নিকটস্থ হইলে তাহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া আহার করিবে, তদ্রূপ আমাদের সখী শ্রীরাধার অঙ্গজ্যোতিঃতে শ্যামসুন্দরের অঙ্গ পুষ্টির অভিলাষ আছে তাই আকর্ষণের প্রাবল্য এত বেশী!

শ্যামের কথা পড়ায় শ্রীরাধার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল। নির্জ্জনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীরাধার নয়নদ্বয়ের কোণ হাজিয়া গিয়াছে, চক্ষু জ্যোতিঃ ভ্রষ্ট হইয়াছে, দেখিয়া চম্পকলতা সত্বর নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া শ্রীরাধার চক্ষুর্দ্বয় মুছাইয়া দিয়া বলিল সই! একটা গান গাই শোন। আমরা সবাই অভাগিনী, আমাদের দুঃখের অন্ত নাই। আমরা আসিলাম তোমার নিকট জুড়াইবার জন্য; তুমি অধীরা হইলে আমরা দাঁড়াই কোথায়? তোমাকে আশ্রয় করিয়াই আমরা সর্ব্ব দুঃখ বরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা নহি। তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ। তোমার প্রাণের মর্ম্ম আমরা বুঝিয়াছি। আমাদের প্রাণ দিয়াও যদি তোমার প্রাণ রক্ষা হয়, আমরা অনায়াসে এখনই তাহা করিতে প্রস্তুত। তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, আমাদিগকে তোমার প্রাণ ভিক্ষা দাও। আমরা তোমার শুষ্ক মুখ দেখিতে পারি না। তুমি দিবা নিশি যদি এমন করিয়া কাঁদ, তবে আর কতদিন জীবিত থাকিবে? প্রতিশ্রুতির দিনও নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমাদের আর অন্য কোন বাসনা নাই। কেবল তোমার বাসনা পূর্ণ করাই আমাদের কাজ। তোমার এই অভূতপূর্ব্ব ধ্যানে—তোমার এই অনন্যচিন্তায় আমাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখী করিয়াছে। কৃষ্ণের কি অপূর্ব্ব মহত্ত্ব তাহা বুঝাইতেছে। তুমি কৃষ্ণানুরাগিণী—তুমিই একমাত্র কৃষ্ণকামিনী—কৃষ্ণভামিনী—কৃষ্ণভাবিনী। প্রতিশ্রুতির শুভ মুহূর্ত্তে তোমাকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া আমরা তোমাকে কৃষ্ণসমীপে পৌঁছাইয়া দিয়া আমাদের বাসনা চরিতার্থ করিব। তোমার অন্তরের সব কথা আমরা জানি। ভাই! কেঁদোনা। তুমি কাঁদিলে আমাদের প্রাণ বাঁচে না।

আনন্দ পাইবার জন্যই তোমার নিকট আসি। তুমি যে হলাদিনী—তুমিই যে ব্রজের আনন্দদায়িনী। ব্রজনাথ যে তোমারই আশায় জীবন ধারণ করিয়া আছেন। তিনি যে প্রেমের কাঙ্গাল?

সে প্রেম তোমা ভিন্ন ব্রজে আর কাহাতেও নাই, তিনি তাঃ জানিয়াছেন। প্রতিশ্রুতি পালনের দিন তাহার সমুচিত পরীক্ষা হইবে।

ব্রজে সকলেই তাঁহাকে বালক বলিয়া উপেক্ষা করে, কিন্তু তিনি কেমন বালক তাহা আমরা জানি। তিনি যে মহামহীয়াঃ অনন্ত শক্তির আধার, সর্ব্বদেবদেব, তাহার এত প্রমাণ পাইয়াও কি আরও অবিশ্বাস থাকে? তিনি ইচ্ছাময়। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে জগতে এমন কে আছে? সই! তুমি যেমন কাঁদিতেছ, তিনিও তোমার জন্য ততোধিক কাঁদিতেছেন! তিনি ভক্তপ্রাণ! কেবল প্রতিশ্রুতির দিবসের জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারও চাঞ্চল্যের অনেক সংবাদ লইয়া আসিয়াছি তুমি একটু সুস্থ হও। তোমার জন্য তিনি কিরূপ চঞ্চল তাহা নিদর্শন একে একে বলিব।

এখন একটা গান গাই শুন ঃ—

সই! মনের মানুষ পেলে
কত কথা বলতে ইচ্ছা হয় গো তারে।
আদর করে, সোহাগ ভরে, গলাটি তার জড়িয়ে ধরে,
চোখে রেখে চোখ, ভেসে যেতাম অশ্রুধারে।
যেন ছাড়তে তারে চায়না মন
করে তারে আপন জন
প্রাণ বিনিময়ে দিয়ে প্রাণ
লুকাইতাম তার প্রাণেরি ভিতরে।
তার সুখে সুখী, দুখে দুখী দরদী হয়ে
প্রাণেরে বেদনা তার ধরিতাম গো অন্তরে।
করিতাম কত সেবা দিন রাত ধরে
সাজাইতাম তারে মনোমত করে।

খাওয়াতাম কত ক্ষীর ননী সরে,
মিষ্টান্ন করিয়ে পাক ধরিতাম অধরে।
আজ্ঞাকারী দাসী হয়ে আজ্ঞার অপেক্ষা করে
থাকিতাম উৎকর্ণ হয়ে, অভ্যঞ্জন ফুল চন্দন লয়ে,
পীত বসন বনমালা করে ধরে॥
চন্দনে চিত্রিত করিতাম গণ্ডদ্বয়,
চিবুকে লিখিতাম ফুলধনুচয়,
মদনমোহন হেরে, মদন কাঁপিত ডরে,
বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে সই অধরে
হাসিতাম কত জানাব কারে?

গান শুনিয়াই শ্রীরাধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্ব শরীর মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। অশ্রুধারায় বক্ষঃ প্লাবিত হইল। ললিতা শ্রীরাধাকে ক্রোড়ে লইয়া ব্যজন করিতে ও বিশাখা কর্ণে শ্যাম নাম শুনাইতে লাগিল।

সখীদিগের দুচিন্তা ঘনীভূত হইয়া উঠিল। চম্পকলতা অপ্রস্তুত হইয়া অপরাধিনীর ন্যায় শুষ্কমুখ হইলেন। তাঁহারা কি করিবেন, সেই চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তাঁহারা পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন আর ত অপেক্ষা করা যায় না। প্রতিশ্রুতি দিনের অপেক্ষা করিলে বুঝি রাধার আর প্রাণ থাকে না। অতএব কৌশল অবলম্বন করা যাউক। যমুনার ঘাটে লইয়া গিয়াও শ্যামেরও ব্যাকুলতা রাধাকে না দেখাইলে এই অত্যধিক আনুরক্তির বিকারের ঘোর কাটিবে না। সখীর এই প্রকার আত্যন্তিক আকর্ষণে শ্যামও বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তের এইরূপ টানে ভগবানের প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার প্রায়ই ভাঙ্গে। সুতরাং প্রতিশ্রুতি দিনের যাহাই হউক, এখন ইহাকে বাঁচাইবার উপায় করিতে হইবে।

ইতিমধ্যে ললিতার শুশ্রূষা ও বিশাখার নাম-রসায়ন পানে শ্রীমতী

রাধিকা সংজ্ঞালাভ করিলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া ললিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ললিতা বলিল সই! আমরাও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি। আর প্রতিশ্রুতি দিনের অপেক্ষা করিব না। আজই আমরা তোমাকে শ্যামের করে সমর্পণ করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য সমাপন করিব। পরের বোঝা ঘাড়ে লইয়া সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি কখন কি হয়; শ্যামের জিনিস শ্যামকে দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব। শ্যাম তাঁহার গচ্ছিত ধন লইয়া যাহা ইচ্ছা করুন—চাই ট্যাঁকেই রাখুন, কি বিলাইয়াই দিন!

বিশাখা—তা আবার বলতে, তার ব্যবস্থা আমরা সব করেছি। রাখালদের আড্ডা ত ঐ যমুনার তটে। রাখালরাজ শ্যাম ত যমুনার ঘাটে কদম তলায় দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজিয়ে প্রত্যহই ব্রজবালাগণে জ্বালাতন করচেন। আর আমাদিগের বললেন আগামী শরৎকালে তোমাদের বাসনা পূর্ণ করব। আবার এদিকে দেখছি, যমুনার ঘাটে মাঠে ব্রজবালাদের বাহির হওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে। একা পাইলে ত রক্ষা নাই, আড় চোখে চাওয়া—বাঁশীর সঙ্কেত! কাপড় ধরিয়া টানাটানি কলসী কাড়াকাড়ি, দেবতার নৈবেদ্য কেড়ে খাওয়া, ফুলের মালা কেড়ে নিয়ে গলায় দেওয়া—কাঁচুলি ছেঁড়া—আলিঙ্গন চুম্বন!—বাকি আর রৈল কি?—যিনি এত উতলা তাঁর আবার প্রতিশ্রুতি কি?—তিনি মজা করচেন আর আমরা কেঁদে মরছি!

তাহা শুনিয়া শ্রীরাধার যেন চমক ভাঙ্গিল! তিনি কতকটা বিস্মিত, কতকটা ক্রুদ্ধ, কতকটা অভিমানিনী হইয়া বলিলেন—বলিস্ কি?—যা বল্‌লি—সত্যি?

বিশাখা—এক চুলও মিথ্যে নয়!

সখীরা দেখিল—তাহা শুনিয়া শ্রীরাধার মুখ লাল হইয়া উঠিল! মুখ চোক নাক কান দিয়া যেন আগুণ বাহির হইতে লাগিল!

ললিতার ইঙ্গিতে বিশাখা জল আনিয়া শ্রীরাধার মুখে চোখে দিয়া ধুইয়া দিল।

শ্রীরাধা বলিলেন সই! শ্যামের কথা আর আমার নিকট বলিও না।

তাহা শুনিয়া সখীরা অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ললিতা বলিল—রাম! রাম! ও কথা আবার মুখে আনে?

বিশাখা বলিল—বাঁচা গেল! একটা দুর্ভাবনা ঘুচিল—আজ সুখে নিদ্রা হবে। আমরা সব সখী মিলে যমুনায় গিয়ে চল শ্যামের কীর্ত্তি দেখি।

শ্রীরাধা বলিলেন—না না আর কীর্ত্তি দেখা দেখির প্রয়োজন নাই। আমরা যমুনায় গিয়া স্নান করিব—চলিয়া আসিব, কোন দিকে চাহিব না।

ললিতা বলিল—হাঁ—ইহাই অত্যুত্তম!

বিশাখা বলিল—তাহা যেন হইল, কিন্তু আমরা যদি এদিকে ওদিকে না চাই—তবে কে কখন আসিয়া কাপড় ধরিয়া টান দিলে লোকের মাঝে অপ্রস্তুত হইব।

ললিতা—আচ্ছা তাহাই হইবে, তোমাকেই চৌকিদার রাখা হইবে; আমরা চাহিব না।

বিশাখা—তাহা ত অত্যুত্তম কথা। আমি ত বাঁচিব, তাহার পর যাহার অদৃষ্টে যা আছে তা হবে। কারণ, না বলিলেও তাহার হাতে নিস্তার আছে? রাখালরাজ কি লোক লজ্জার ভয় রাখে?

শ্রীরাধা—তামাসা নয়, আর ওকথা বলিও না।

ললিতা—বিশাখা নেহাৎ বেহায়া! আরও সে কথা মুখে আনে? যে চোর, লম্পট, মিথ্যাবাদী, আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া আপনি নিত্য নূতন আনন্দে মগ্ন; তাহার সঙ্গে আবার কথা, না তাহার প্রতি

আবার চাওয়া ? আমরা যদি না চাই তবে তার সাধ্য কি যে আমাদের গায়ে হাত দেয় ?

বিশাখা—আমার কসুর হয়েছে ভাই, আমি কি অত সব জানি ? ঠিক বলব ভাই, না চাওয়াই মঙ্গল ! যেহেতু তার চোখে চোখ পড়লে আর কি রক্ষে আছে ? কুমারী পোকার আরসোলা ধরার ন্যায় আর কথাটি কইবার যো নেই ! বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবার যুক্তি ত হ'ল, কিন্তু বাঁধবে কে সেইটাই দেখব।

ললিতা—রাখ্ রাখ, তোর ও সব কথা এখন রাখ। আজ আমরা খেয়ে দেয়ে খুব ঘটা করে সবাই মিলে মধ্যাহ্নকালে যমুনায় গিয়ে গা ধুয়ে আসব, দেখি কে কি করে !

বিশাখা—উত্তম পরামর্শ !

ইত্যবসরে কুটিলা আসিয়া ললিতাদি ব্রজবালাগণে মধ্যাহ্ন আহারের জন্য আহ্বান করিলে সকলেই আনন্দে যোগ দান করিয়া ভোজনে বসিলেন।

বধূকে আজ বেশ প্রকৃতিস্থ দেখিয়া কুটিলার আনন্দের সীমা রহিল না। অত্যধিক আনন্দে তাহাদিগকে ভোজন করাইতে লাগিলেন।

সকলেই আনন্দে ভোজন করিতে লাগিল কিন্তু শ্রীরাধা নিজ ভোজ্যপাত্র হইতে খাদ্য তুলিয়া তুলিয়া সখীদিগকে দিতে লাগিলেন। মুখে কথা নাই, অভিমানে মুখের ভাব অন্যরূপ হইলেও তাহা যেন চাপিবার চেষ্টা করিয়া বাহিরে চিন্তাশূন্যতার পরিচয় দিবার ভাব দেখাইতে লাগিলেন।

ললিতা জটিলাকে বলিল মাসি ! তোমার বৌয়ের পাতে কিছু নাই, ওকে দাও।

শ্রীরাধা বলিলেন—না, না, আমার আর প্রয়োজন নাই, আমার পেট ভরিয়াছে, ইহারা বেশ খাইতে পারে, ইহাদিগকেই দিন।

জটিলা মিষ্টান্নের স্তূপ স্তরে স্তরে রাখিয়া বলিলেন খাওনা মা খাওনা, আমি সবাইকে দিচ্চি।

ইহা বলিয়া বধূর ভোজ্যপাত্রে ক্ষীর সর নবনীজাত মিষ্টান্নাদি দিয়া ধীরে ধীরে খাইতে বলিলেন।

ললিতা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া বলিল মাসি মা! বৌ না খেয়ে খেয়ে আরও রোগা হয়ে যাচ্চে। আমাদের ঘরে যদি এত ক্ষীর, সর, ননী থাক ত, আমরা কত মোটা হতুম!

জটিলা বলিল সে কি বাছা! ঘরে খেতে পাও না? এখানে যে খাবার লোকের অভাবে কত নষ্ট হয়, তা বাছা তোমরা যখন তখন এসে খেয়ো। এও ত তোমাদেরই ঘর। খাও বাছা খাও!—বলিয়া দুই হস্তে তুলিয়া ললিতার পাতে মিষ্টান্নের রাশি ঢালিলেন!

তাহা দেখিয়া সকলেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল!

শ্রীরাধাও হাসি চাপিতে পারিলেন না, তাঁহারও মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল! জটিলা তাহার কারণ না বুঝিয়া অন্য সকলেরই পাতে মিষ্টান্নাদি ঢালিতে লাগিলেন এবং নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া গিয়া আবার কতক আনিয়া বসিলেন। তাহা দেখিয়া সকলেই সমস্বরে বলিল আর না মাসি মা! আর আর না, আমাদের যে পেট ফাটবার উজ্জুক হয়েচে। তুমি আমাদের সামনে থেকে উঠ, আমাদের আর কিছু চাই না, তোমায় দেখে আমাদের ভয় হচ্চে মাসি মা! তুমি সরে যাও।

তাহা শুনিয়া জটিলা হাসিতে হাসিতে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

জটিলা চলিয়া গেলে আবার হাসির রোল উঠিল।

বিশাখা বলিল—ললিতে! কেমন জব্দ!

ললিতা বলিল—আমি একা নই সবাই!

বিশাখা—বৌকে মোটা করবার উপদেশ দিতে গিয়ে নিজের মোটা হবার ইচ্ছেটা কি মাসী মা আর না বুঝেচেন, তাই তোমাকেও মোটা হবার ওষুধ দিয়েচেন।

ললিতা—বিশাখা! আজ এক মজা করা যাবে, এত ত কেউ খেতে পারব না; এক কাজ কর, স্থালী শুদ্ধ সব যমুনায় নিয়ে গিয়ে সেখানে বিলান যাবে।

মহা সমারোহে ভোজন সমাপ্ত হইলে ব্রজ-কুমারীগণ সঙ্গীত করিতে করিতে যমুনায় অবগাহন জন্য গমন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীতের শব্দ শুনিয়া পথিমধ্যে দলে দলে ব্রজবালা আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহাদের দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা বস্ত্রহরণ-ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ব্রজকুমারীদের সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি দূর হইতে শ্রবণ করিয়া ব্রজ রাখালগণ কুমারীদের সান্নিধ্যে আগমন করিতে লাগিল। রাখাল-রাজ নন্দনন্দনকৃষ্ণ দূর হইতে কুমারীদিগের এই অভিমান লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, ইন্দুরেখা প্রভৃতি শ্রীরাধাকে বৃত্তাকারে ঘিরিয়া ঘাটের স্ফটিক নির্ম্মিত সুবৃহৎ চত্বরে উপবেশন করিয়া সমস্বরে যমুনা স্তুতি গান করিতে লাগিল। গান শুনিয়া বালক বালিকা, কুমার কুমারী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাও অনেকে আসিয়া জমিল। ক্রমশঃই তাহাদের আসর জমিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে স্তুতি সমাপ্ত হইলে সকলেই যমুনাদেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। কুমারীগণ প্রণতা হইলে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া গেল। অনন্তর ব্রজ রাখালগণ কুমারীদের স্থালীস্থ মিষ্টান্ন দর্শন করিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কি বলিল। অনন্তর কৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, সুবল ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি আসিয়া কুমারীদের স্থালী আক্রমণ করিলে কুমারীগণ বলিল ইহা আমাদের উচ্ছিষ্ট, আমরা যমুনার কুর্ম্মদিগকে প্রদান জন্য আনয়ন করিয়াছি, ইহা তোমরা স্পর্শ করিও না। তোমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাক আমরা গৃহ হইতে উত্তম

খাদ্য আনয়ন করিয়া দিব। তোমরা অপেক্ষা কর, আমরা হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও গাত্র ধৌত করিয়া শুষ্কবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক যমুনা-দেবীকে মাল্য দান জন্য আগমন করিব। বিশেষতঃ আজ আমাদের প্রিয়সখী রাধারাণীর ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। আমরা নিয়ম করিয়া যমুনা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য যমুনার পূজার্চ্চনাদি করিয়া যমুনা সলিলচারী মৎস্য কূর্ম্মাদিগকেও পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইব। ব্রতের নিয়মানুসারে সখী রাধারাণী কোন পুরুষ, এমন কি বালকেরও মুখ দর্শন করিবেন না। অতএব তোমরা সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থান কর। কি জানি, কাহাকেও দেখিয়া ফেলিলে ব্রত-ভঙ্গ হইবে। ব্রতভঙ্গ হইলে পুনরায় ছয়মাস ব্রত নিয়ম পালন করিতে হইবে।

রাখাল বালকগণ বলিল, তাহা উত্তম কথা, আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত। যমুনার মৎস্য কুর্ম্ম অপেক্ষা আমাদিগকে অন্নদান করিলে কি পূণ্যের সম্ভাবনা নাই?

ললিতা—পাপপুণ্যের কথা হইতেছে না। আমরা যমুনার ব্রত করিয়াছি, যমুনাকে পূজার্চ্চনা ও যমুনায় অবস্থিত মৎস্য কুর্ম্মাদির প্রীতি সাধনই আমাদের কামনা। আরও, আমরা, স্থালীতে যে সমুদয় মিষ্টান্নাদি আনিয়াছি তাহা উচ্ছিষ্ট,—আমাদের ভুক্তাবশিষ্ট। উচ্ছিষ্ট দ্রব্য তোমাদিগকে দিই কেমন করিয়া? তোমরা ব্রজের দুলাল—আমাদের ভাই।

রাখাল বালকগণ বলিল তাহা আরও উত্তম। তোমরা যখন ভগিনী, তখন তোমাদের উচ্ছিষ্ট ভোজ্যদানে কুণ্ঠিতা হওয়া উচিত নহে। তোমরা দিদি, তোমাদের উচ্ছিষ্ট আমাদের পক্ষে দেবতার প্রসাদ। আমরা তোমাদের আর কোন আপত্তি শুনিব না, তোমরা না দিলে আমরা বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব; ইহাই আমাদের রাখাল-রাজের আদেশ।

বিশাখা বলিল—আচ্ছা আর গোলযোগের প্রয়োজন নাই, তোমরা আমাদের সকলেরই থালী লইয়া যাও কিন্তু শ্রীরাধার থালিটী দেওয়া হইবে না।

রাখাল বালকগণ বলিল তাহা হইবে না। তোমাদের কাহারই থালী না দাও, তাহাতে ক্ষতি নাই, রাধারাণীর অন্নপাত্রের প্রয়োজনই আমাদের বেশী। কারণ সখা কানাই তাহার প্রসাদ গ্রহণের জন্যই আজ সমস্ত দিন উপবাসী আছে। আমরা গৃহ হইতে ক্ষীর, সর ননী মাখন ও মিষ্টান্নাদি যাহা আনিয়াছি তাহা সমস্তই মজুত আছে। কানাই খায় নাই বলিয়া আমরাও খাই নাই। কানাইকে খাওয়াইয়া তবে আমরা সকলে খাইব। কানাই আজ বড়ই চঞ্চল ও বিষণ্ণ। কাহারও সহিত কথা নাই, কাহারও দিকে চাহে নাই। আজ সহসা কেন এমন বিষণ্ণ হইল তাহা বলিতে পারি না। অনেক সাধ্য সাধনার পর সুবলকে মাত্র বলিয়াছে, "ভাই সুবল! যদি তুমি আমার প্রাণ রাখ তবেই থাকিবে, নতুবা আজই সন্ধ্যার পর যমুনায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।

সুবল জিজ্ঞাসা করিল, কেন ভাই কি হইয়াছে? তাহাতে কানাই বলিল, সুবল! আমি যাহার জন্য প্রাণ ধারণ করি, সেই আজ সখীদের মিথ্যা কথায় আমার উপর অভিমান করিয়াছে, আমার আত্মা ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রসাদ ভিন্ন আমার আত্ম-প্রসাদ লাভ হইবে না, সেই প্রসাদেই আমার দেহে বল সঞ্চার হইবে।

অতএব দিদিগণ! তোমাদের পায়ে ধরি আমাদের সখার প্রাণ বাঁচাও, নতুবা সখার সহিত আমরাও যমুনার জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।

তাহা শুনিবামাত্র শ্রীরাধা স্থালী হস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল সুবল! আমার ব্রত ভঙ্গ হইল, এই আমার প্রসাদ লইয়া গিয়া, এখনই তোমাদের সখাকে খাওয়াইয়া তাহার প্রাণ রক্ষা কর।

ইহা বলিয়া শ্রীরাধা সুবলের হস্তে স্থালী প্রদান পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে এক দৃষ্টিতে দূরে চাহিয়া বলিল তোমাদের সখার কুশল সংবাদ দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিও।

সুবল সানন্দচিত্তে আচ্ছা বলিয়া দ্রুতবেগে প্রসাদ লইয়া গিয়া রাখাল-রাজের নিকট উপস্থিত হইলে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। অদূরে তাহাদের আনন্দধ্বনি ব্রজবালাগণের কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহারাও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এবং দেখিল কৃষ্ণ স্থালী হইতে মিষ্টান্ন লইয়া প্রথমতঃ আপন বদনে দিয়া আনন্দ সহকারে সকলের বদনে প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর কৃষ্ণ আনন্দে বংশীধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে ধেনুগণ বৎস সহিত বেগে দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। ধেনু সমুদয় একত্র হইলে রাখালগণ সদলে আসিয়া ব্রজকুমারীগণে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাহাদের স্থালীস্থ সমুদয় অন্ন প্রার্থনার সহিত বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভোজন করিতে এবং গোসমূহকেও প্রদান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

মধুমঙ্গল অত্যধিক আনন্দে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে বলিল, আজ চাঁচর!—ঘরে আগুণ লাগিল!—কাল রাস—হোলির উৎসব! আনন্দের ফোয়ারা—প্রীতি বিনিময়! সব মিষ্টিমুখ—সব মিষ্টিমুখ! মিষ্টিমুখেই রস ধারার উৎস!

শ্রীরাধা রাখালগণে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেও শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া চঞ্চল হইলেন। অঙ্গুলির অগ্রভাগে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মস্তক উন্নত করত চারিদিক অবলোকন করিতে লাগিলেন।

সুবল দূর হইতে শ্রীরাধাকে উন্মাদিনীর ন্যায় চঞ্চল ও ভীত ত্রস্ত দেখিয়া ত্বরিত আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিল "সখা কানাই প্রসাদ পেয়ে প্রাণে বেঁচেচে। তার আনন্দের সীমা নাই! তাহাকে দেখিতেছ কি? সে তোমায় সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতেছে,

এই দেখ তোমার সম্মুখের ঐ বৃক্ষশাখায় সহাস্য বদনে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহা শুনিয়া শ্রীরাধা লজ্জা-চঞ্চল চক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়াই অবগুণ্ঠনে বদন ঢাকিয়া সখীদের সহিত সত্বর যমুনা সলিলে অবগাহন জন্য গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষ হইতে অবতরণ পুরঃসর রাখালগণ সহিত ধেনুবৃন্দ লইয়া গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন।

শ্রীরাধার ভাব দেখিয়া সখীদের আনন্দের সীমা রহিল না। ললিতা বলিল, আর যাহা হউক, ভগবৎ কৃপায় বিশাখা রক্ষা পাইল। পাহারার দায়ীত্ব তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল! রাখালগণের যে দল উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে তাহাকে যে প্রহৃত হইতে হয় নাই, ইহাই পরম সৌভাগ্য।

বিশাখা বলিল তাহা নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাই আজ আমাদের প্রিয় সখীকে বড়ই অপমানিত হইতে হইল।

ললিতা বলিল, কিসে?

বিশাখা—তাহা লক্ষ্য কর নাই? সুবল যখন আসিয়া বলিল "আমি যাহার জন্য প্রাণ ধারণ করি—সখীদের মিথ্যা কথায় আজ সে-ই আমার উপর অভিমান করিয়াছে, আমার আত্মা ম্রিয়মাণ হইয়াছে, তার প্রসাদ ভিন্ন আমার আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে না, সেই প্রসাদেই আমার দেহে বল সঞ্চার করিবে।" তাহাতেই আমাদের অভিমানিনী সখী সখার কাতরতার কথা শুনিয়াই আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ ব্রত ভঙ্গ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া সুবলের হস্তে প্রসাদ প্রদান করিলেন। ইহাতে আমরা অপমানিতা হইলাম, না সখী নিজে অপমানিতা হইলেন? এত উতলা হইলে কি মান থাকে, না ভবিষ্যতে থাকিবে? নারী পাগল হইলে কি নরকে বশে রাখা যায়? বুক ফাটিলেও যার মুখ ফুটে না

সেই নারী! সেই নারীই পুরুষকে বশে রাখিতে পারে। আর উড়ন্ চণ্ডীর মত সব বিলাইয়া দিলে তার হাতের পুতুল হইলে নিজেকেই কাঁদিতে হয়।

বিশাখার এই কথা কতক শ্রীরাধার কর্ণে প্রবেশ করিলেই দর-দরিত ধারে বক্ষঃ বাহিয়া অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল! শ্রীরাধা ললিতার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়!
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরছা পায়!
কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিনু
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন কটাখে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের মালাটী গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে॥

এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম
সদা হয় এই ভয়॥

ইহা বলিতে বলিতেই শ্রীরাধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সখীগণ ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া যমুনার সলিল সন্নিকটে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া সখীরা কাঁদিয়া আকুল হইল। সমাধিস্থ যোগীর ন্যায় তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে, হৃৎপিণ্ডও সম্পূর্ণ স্থির, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবশ ভাব দেখিয়া সখীগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সখীকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় পৌর্ণমাসী তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন "ভয় নাই, ভয় নাই, কর্ণে কৃষ্ণ-মন্ত্র দাও।"

তাঁহার কথায় সাহস পাইয়া ললিতা কর্ণে কৃষ্ণ নাম শুনাইতে আরম্ভ করিলে কতক্ষণ পরে শ্রীরাধার চৈতন্য হইলে পৌর্ণমাসী বলিলেন 'দুলালি! উতলা হইও না, তোমাদের আনন্দের দিন্ সমাগত। আগামী রাত্রিতে তোমাদের মিলনের বাঁশী বাজিবে। যমুনা উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে বহিবে। তোমার অবস্থা দেখিয়া আমারও ভয় হইতেছে। আশ্বস্তা হও, তোমাদের উদ্বেগের দিবার অবসান হইয়াছে। আগামী কল্যই মাধব যমুনা পুলিনে রাসরসমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তুমি মাধবের জন্য যেমন কাঁদিতেছ, মাধবও তোমার জন্য তেমনই কাঁদিতেছেন। তুমি নারী তাই অধীরা হইয়াছ। মাধব পুরুষ তাই অন্তরের আবেগ চাপিয়া তোমাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সুন্দরি! জানিও তিনিও তোমার জন্য পাগল! প্রতিশ্রুতির কঠোরতায় সত্যভঙ্গের ভয়ে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। প্রথম মিলনের পর তাঁহার অবস্থা বুঝিবে। তুমি উঠ, আনন্দ কর! তুমি ব্রজের রাস-রসকর্ত্রী—তুমিই ব্রজের আনন্দ

বিধাত্রী। ব্রজের আনন্দ-সাগর তোমাকে কেন্দ্র করিয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তোমাদের আনন্দ দর্শন জন্যই জীবিত আছি। তোমরা সেই শুভ মূহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হও। বেশ ভূষা মাল্য চন্দনে ভূষিত থাকিও। কাত্যায়নী দেবী তোমাদের আনন্দ বিধান জন্য মাধবকে প্রীতি-চন্দনে বিভূষিত করিবেন।

ব্রজে অসংখ্য ব্রজবালা কাত্যায়নী পূজা করিয়া বর লাভ করিয়াছে, সকলকেই কৃষ্ণ আশ্বাস দিয়া বিহারের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সকলেই আনন্দে সেই শুভ-মূহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছে বটে, কিন্তু তোমার ন্যায় অনুরাগিনী ব্রজে আর দ্বিতীয় নাই, তুমিই প্রেমের পূর্ণ-প্রতিমূর্ত্তি—প্রেমের প্রতীক। প্রেম কেমন করিয়া অর্জ্জন করিতে হয়, কেমন করিয়া অভীষ্টে আরোপ করিতে হয়, অভীষ্টকে কেমন করিয়া প্রেমের বশ করিতে হয়, তাহা একমাত্র তুমিই দেখাইলে, তুমিই ব্রজেশ্বরী, তুমিই প্রেমদাত্রী, ব্রজেশ্বর একমাত্র তোমারই বশীভূত। তোমার এই প্রেম জগতে অতুল্য। ভগবান্ প্রেমের বশ।

অন্যান্য ব্রজবালাগণ কেবলমাত্র দেহ-সুখের জন্যই মদনমোহন কৃষ্ণ কামনা করিয়াছে। তোমার কামনা দেহ-সুখ অতিক্রম করিয়া প্রেমের অপূর্ব্ব-রাজ্যের অমৃতময়ী পন্থা প্রদর্শন করিয়াছে, সেই জন্যই অভীষ্ট তোমার করতলগত হইয়াছেন। তোমার সাধনাই সার্থক হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তুমি ধন্যা, তুমি আমাদের উপাস্যা, তুমি আমাদের বাঞ্ছিত ধন।

ইহা শুনিয়া বৃষভানুনন্দিনী হৃষ্টা হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর সকলে প্রণতা হইলে তিনি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ব্রজে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। ব্রজকুমারীগণ যমুনায় গাত্র ধৌত করিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং শারদ নিশায়

মাধবের বংশীধ্বনির অপেক্ষায় উৎফুল্ল হইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বরাগ—প্রতিজ্ঞাচ্যুতি

সত্যব্রত ভগবানের বাক্যও ভক্তের আকর্ষণে টলিয়া যায়। এ দৃষ্টান্ত হিন্দুর পুরাণেতিহাস ও শাস্ত্রে বহুল পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিলেন আমি অস্ত্র ধরিব না। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিলেন তোমায় অস্ত্র ধরাইব। ভক্ত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাই রক্ষিত হইল। দেবতাদিগেরও এ দুর্ব্বলতা আছে তাহার প্রমাণ পুরাণে ভূরি ভূরি। ভক্তের নিকট টলেন নাই কে, এমন প্রমাণ জগতে নাই। ব্যবহারিক জীবনে নিত্যই ইহা প্রত্যক্ষ হয়. স্নেহভাজনের শ্রদ্ধা ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তিভাজন সর্ব্বদাই হারি মানিতেছেন, দৃষ্টান্ত গৃহে গৃহে নিত্যই পরিস্ফুট, আর এই যে হারি মানা, ইহার মাধুর্য্যের সীমা নাই। বড় ছোটর নিকট, স্নেহভাজনের নিকট যখন হারি মানেন, তখন তাঁহার মাধুর্য্য অপরিমেয় সীমায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাহাতে ভক্ত ও ভগবান্ বা ভক্তিভাজন উভয়েরই বিপুল আনন্দ!

যে ভগবান্ বা ভক্তিভাজন ভক্তের নিকট হারি মানেন না, তাঁহার মাধুর্য্য নাই, হৃদয় নাই, তাহার ভগবানত্ব বা ভক্তিভাজনত্বও নাই, তাঁহার স্নেহ, দয়া মায়া, প্রীতি প্রেম নাই, তিনি নিষ্করুণ কঠিন লৌহ বা প্রস্তর। তাঁহার ক্রিয়া নাই, তাঁহার লীলা নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ কালে বলিলেন আগামী শরৎকালে তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। গোপীগণ আনন্দিতা হইয়া গৃহে ফিরিলেন। তাঁহাদের মনে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। কল্পনায় কত কত সেবা সম্ভোগের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে লাগিলেন।

কল্পনার আত্যন্তিক তীব্রতায় চিত্ত সমাহিত করিয়া অদ্ভুত আকর্ষণে কান্তকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগবানের আসন টলিল। সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ গোপীর আত্যন্তিক অনুরক্তির তীব্র তাড়নায় তিনি আন্দোলিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সত্যব্রততা ও সত্যসংকল্পতায় যেন ব্যাঘাত ঘটিবার উপক্রম হইল, তিনি কতকটা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তখন গোপীদের সংবাদ লইতে লাগিলেন কে কি করিতেছে। এবং বালক কৃষ্ণ তখন আর বালকত্ব বজায় রাখিতে পারিতেছেন না, একবারে পূর্ণযুবক ও প্রণয়ী হইয়া উঠিলেন!

ভক্তের আকর্ষণ বড়ই দুর্ব্বার; কারণ নিরাকার সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ কোথায় থাকেন তাহা কে জানে? কিন্তু ভক্তের আকর্ষণে তাহারই বাঞ্ছিতরূপে তাঁহাকে দর্শন দিতে হয়। তখন আর আত্ম গোপন করিয়া থাকিতে পারেন না, একবারে বরাভয় মূর্ত্তিতে অবির্ভূত হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ইহাই ভগবানের স্বভাব ও স্বরূপ। লীলাই তাঁহার প্রকৃষ্ট ক্রীড়া।

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ—কৃষ ধাতু ণ। কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা। তজ্জন্য সকলেই জানেন যে, কৃষ্ণই সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাহা সত্য। আবার কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে কে?—ভক্ত। যেমন তেমন আকর্ষণ নহে, রমণীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভুবনমোহন পতির প্রতি যে আকর্ষণ,—রূপে মুগ্ধ, গুণে মন ভোর!—তাহার তুলনা নাই। মহাকর্ষণে আকর্ষণ করিয়া জগৎ পরস্পরকে ধরিয়া আছে বটে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ সীমার বাহিরে যাইতে দেয় না, উৎক্ষিপ্ত হইলেও আপন কোলে টানিয়া আনে। ভাবপ্রবণতাই রমণীর স্বভাব-ধর্ম্ম। ভাবপ্রবণতার প্রাবল্যই মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ। যৌবনজ আকর্ষণ যুবক যুবতী পরস্পরকে তন্ময় করিয়া রাখে। তাহা সহজ প্রাপ্য বা সদা সম্মিলনের সর্ব্বপ্রকার অনুকূল অবস্থার ব্যত্যয় না ঘটিলেও তাহাদের

পরস্পরের আকর্ষণ পরস্পরকে হৃদ্য সম্মিলনের জন্য আগ্রহশীল ও উন্মুখ করিয়া রাখে। পতি পত্নীর এই যে আকর্ষণ, ইহা সম্ভোগ জনিত যৌবনজ আকাঙ্ক্ষামাত্র। কারণ প্রোষিত-ভর্তৃকা দুষ্প্রাপ্য নহে এবং ভর্ত্তাও বিধি নির্দ্দিষ্ট লোকাচার গণ্ডীর অন্তর্ভূত। তাহাদের পরস্পর সম্মিলন সহযোগ পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ও বিধি সম্মত। সুতরাং তাহারা যৌবনজ ধর্ম্মে পরস্পরকে আকর্ষণ করিলেও তাহাতে অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্যের চিন্তা নাই বা অভাবের প্রাবল্য নাই। গৃহ সঞ্চিত ধন রাশির ন্যায় তাহারা নির্ভয়ে পরস্পরকে উপভোগ করিতে পারে। এজন্য তাহাদের পরস্পরের যে আকর্ষণ তাহা ভোগ নিবৃত্তির সাময়িক অনুগ্র আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

গোপীদিগের আকর্ষণ বিধি নির্দ্দেশের বহির্ভূত। তাহারা যাহাকে চায়, যাহার গুণ মুগ্ধ ও রূপে আত্মহারা, সে পর পুরুষ! ঘৃণা লজ্জা ভয় তাহাদিগকে বাধা দিতেছে, কেমন করিয়া কোথায় তাহার সহিত সম্মিলিত হইবে। আত্মীয়-গুরুজন তাহাদের সে উদ্দেশ্য জানিতে না পারে, তজ্জন্য তাহা দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিকই যদি তাহাকে পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিয়া থাকে তবে সেই স্থির সংকল্পে তাঁহাকে পাইবার জন্য বাসনাও তত উগ্র হইয়া উঠে। সর্ব্বদাই সেই চিন্তাই হৃদয়মন অধিকার করিয়া থাকে। কেমন করিয়া তাঁহাকে পাইব, কোন পন্থা অবলম্বন করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, কাহাকে ধরিলে, কে আমার সহায়তা করিলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, এই চিন্তাতেই বিভোর থাকে। এই অবিচ্ছেদ চিন্তা ইষ্টের যতই নিকটবর্ত্তিনী হয়, অভাবের তাড়নায় সে ততই আত্মহারা ও ইষ্টপ্রাপ্তির উন্মাদনায় কায়মনোবাক্যে গভীর ধ্যানে ইষ্টে সমাহিত হইয়া পড়ে। এবং যখনই এই সমাধি ইষ্টে সন্নিবিষ্ট হয়, তখন ইষ্টও অধীর হইয়া উঠেন। তখন তিনি সর্ব্ব বাধা, সর্ব্ব বিঘ্ন দূরীভূত করিয়া ভক্তকে আত্মসাৎ করেন। কিন্তু সেই ধ্যান-সমাধি

কি সকল ভাগ্যে ঘটে ? ব্রজে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গোপী কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোরা হইলেও তেমন সমাধিলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে নাই।

ঘটিয়াছিল এক জনের,—তিনি রাধা। তাঁহার আকর্ষণে কৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রতিশ্রুতি দিবসের অপেক্ষাও তাঁহাকে সহিতে দিল না, তিনি রাধা রাধা করিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। সুবল সখার সহিত বৃন্দাবনের মাঠে ঘাটে শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা যমুনার কোন ঘাটে স্নান করেন, কোন সখীদের সহিত কোথায় বিহার করেন, কোন গৃহে শয়ন করেন, কোন অট্টালিকা শিখরে আরোহণ করিয়া বায়ু সেবন করেন, কোন মন্দিরে শিব পূজায় যান, তাঁহার রূপের মাধুর্য্য কিরূপ, ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ জন্য তিনি অলক্ষ্যে তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভক্তপ্রেমে আকুল হইয়া উঠিলেন।

পূর্ণকাম সত্যসংকল্প ভগবান্ নিজের প্রতিশ্রুতি ঠিক রাখিবার জন্য ভক্তকে দর্শন দিয়া তাহার আত্যন্তিক আকর্ষণ লাঘব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। কৃষ্ণ দর্শনে রাই উন্মাদিনী হইয়া উঠিল। আকর্ষণ লাঘব করিয়া কৃষ্ণ আত্মরক্ষা করিবার প্রবাসী হইলেও দর্শনের আকর্ষণে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বরাগে তিনিও অধীর হইয়া উঠিলেন !!

অনুরাগ তুমিই ধন্য !—যে আকর্ষণে ভক্তপ্রাণ ভগবান্ও বিচলিত হইয়া ভক্তের অন্বেষণে ছুটেন, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ জন্য অধীর হইয়া উঠেন, তুমিই তাহার জনক। প্রেম সংঘটনের তুমিই মোহিনী-মন্ত্র। তুমিই নিরাকারকে সাকার কর, নির্দ্দয়কে দয়াশীল কর, নির্ম্মমকে মায়ামুগ্ধ করিয়া কাঁদাও! তোমারই প্ররোচনায় জগতে অসম্ভব সম্ভব হয়। কত নর নারী পরস্পরের অনুরাগে কুলশীল তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্ম ও ধন প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে, কলঙ্ককে অঙ্গের ভূষণ করিয়া

প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে অপ্রহিতবেগে অদম্য উৎসাহে ছুটিতেছে, কাহারও কথায় কাণ দিতেছে না, বা কাহারও বাধা মানিতেছে না— অনন্য মনে, অনন্য চিন্তায় সিন্ধুর উদ্দেশে নদীর বহির্গমনের ন্যায় অবাধগতিতে গন্তব্য পথে প্রধাবিত হইতেছে।

অভাব বোধের তীব্রতাও অনুরাগের সীমা নির্দ্দেশ করে। উদ্দিস্ট পদার্থ যতই দুষ্প্রাপ্য বা দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়, অনুরাগের তীব্রতাও ততই সীমা অতিক্রম করিয়া ছুটে! সে যতই সরিয়া যায়, প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ততই তাহার চারি পার্শ্বে দৌড়িতে থাকে। যদি অদম্য অধ্যবসায় থাকে, যদি উদ্দিস্ট পদার্থকে লাভ করিবার বাঞ্ছা "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" সংকল্পের দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবেই যত বাধা বিঘ্ন থাকুক অভীষ্ট লাভ হইবেই হইবে। তবে অনুরাগই সকলের মূল। অনুরাগ না থাকিলে দৃঢ়তাও আসে না।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, শ্রীরাধা তাঁহার শক্তি। মানুষ ভগবানের বড়ই প্রিয়। মানুষকে সর্ব্ব প্রকারে উন্নত ও তাঁহার লীলার সঙ্গী করিবার জন্যই সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের আদর্শ প্রদর্শন নিমিত্ত মানবরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে—কেমন করিয়া পার্থিব প্রেমকে ভগবৎ সাধনায় ভগবৎ ভাবে বিভাবিত করা যায়, তাহারই পন্থা প্রদর্শনার্থ—ব্রজলীলার অবতারণা করিয়াছেন। এই অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা নায়ক নায়িকার দুই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করত চূড়ান্ত অভিনয় প্রদর্শন জন্য লীলার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তজ্জন্য ইহাতে কোন্ প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিতে পারে না। মানুষ হইয়া মানুষরূপে যাহা যাহা প্রয়োজন, হাসি কান্না, শোক তাপ, আগ্রহ উদ্বেগ, উদ্যম অধ্যবসায়, ভয় লজ্জা, স্নেহ ভালবাসা, প্রণয় প্রেম—সকল ভাবের অভিনয়েরই চূড়ান্ত সীমা প্রদর্শন করিয়াছেন, মানুষকে মানুষ বা মান-হুঁস করিবার জন্য। প্রিয়তমকে কেমন

করিয়া আত্মসাৎ করিতে হয়, মানব দেহ ধারণে তাহাতে কত সুখ এবং কেমন করিয়া সেই-সুখ অর্জ্জন করিতে হয়, জগতে সেই সুখের মধ্যে দিয়া কেমন করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করা যায়, প্রণয়ী প্রণয়িনীর জীবন সর্ব্বস্ব উৎসর্গীকৃত ঐকান্তিক প্রেম-কামনার আত্যন্তিক অনুরক্তির ভিতর কেমন করিয়া সেই সর্ব্বলোক পাবন ভূতভাবন ভগবানের সুমধুর প্রেম উপলব্ধি করা যায়, তাহারই ভাব-বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান।

মানুষে এইরূপ ঠিক ঠিক প্রেম হইলে ভগবানের প্রেমসিন্ধুর অমৃত কণার আস্বাদ পাইয়া জীব ধন্য হইয়া যায়। জীবকে সেই প্রেম সিন্ধুর বিন্দু দান জন্যই ব্রজে রাধা মাধবের এই অপূর্ব্ব লীলা। ইহা কামলীলা নহে,—প্রেমলীলা। ভগবান্ কেমন করিয়া প্রেমে বিচলিত হন এবং প্রেমই ভগবানের একমাত্র কাম্য, সেই প্রেম সহজ ভাবে কেমন করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়, কেমন করিয়া তাঁহাকে আপনার জন করিয়া, তাঁহাকে সর্ব্ব অভাবগ্রস্ত মনে করিয়া স্নেহ দয়া মায়া, বাৎসল্য, প্রীতি প্রেম দিয়া আদর করিতে হয়, কেমন করিয়া তাঁহার সেবা যত্নে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়া তাঁহাতে তন্ময় হইয়া থাকিতে হয়, সেই তন্ময়তায় কেমন করিয়া তাঁহার কৃপা লাভ হয়, সেই সহজ সরলভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবকে ভগবদারাধনার যে চূড়ান্ত পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে, জগতে অন্যত্র তাহার তুলনা নাই। ভগবান্ আমার পুত্র, ভগবান্ আমার সখা, ভগবান্ আমার পতি, এভাবের সাধনা কত সহজ, তাহার পন্থা প্রদর্শনই ব্রজ লীলার উদ্দেশ্য।

যাহা হউক, ভক্তের টানে ভগবান্ টলিলেন!—তিনি যমুনার ঘাটে ঘাটে কেলি কদম্বের মূলে ডালে, বনপথে, যমুনার তটে তটে মাঠে বাটে অলক্ষ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, উদ্দেশ্য তিনি সকলকে দেখিবেন কেহ তাঁহাকে দেখিতে না পায়। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা

নহে, তিনি দেখিলে ত হইবে না, তাঁহাকে দেখা দেওয়া চাই। তবে সুস্পষ্ট নয়—আবছায়ায়; অথচ তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে, মনোচোরা কানাই গোপনে তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের লজ্জাশীলতার হানি করিয়া গেল। কেহ হয় ত অঙ্গের বসন শিথিল করিয়া আছে, কেহ হয় ত মাথার চুল খুলিয়া হাতে লইয়া দেখিতেছে, কেহ হয় ত পান খাইয়া আয়নায় রাঙ্গা ঠোঁট দেখিতেছে, কেহ হয় ত স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্র সামলাইতেছে, কেহ হয় ত একান্ত মনে উদাস প্রাণে তাহার চিন্তায় বিভোর হইয়া আপনা ভুলিয়া গিয়াছে, কেহ হয় ত সখীজন পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণ কথায়—তৎপ্রসঙ্গে কখনও চুপি চুপি, কখনও বড় গলা করিয়া কৃষ্ণগুণকীর্ত্তন করিতেছে, কেহ হা কৃষ্ণ বলিয়া মূর্চ্ছিত প্রায় হইতেছে, সখিগণ তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে, কেহ বন ফুলের মালা গাথিয়া সখীর গলায় দিয়া তাহাকে কৃষ্ণ সাজাইতেছে! সখীরা অলক্ষ্যে আনমনা হইয়া এইরূপ করিতেছে কৃষ্ণ তাহাদিগকে বিদ্যুতের ন্যায় চপল দর্শন দিয়া চকিতে কোথায় চলিয়া গেল! মুহূর্ত্তের দর্শন পাইয়া সখীরা চঞ্চল হইয়া ঐ—ঐ করিয়া সেই দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দর্শনের আশা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু পিপাসা বাড়িয়াই চলিয়াছে! যাঁহাকে নয়নের সমক্ষে স্থির দৃষ্টিতে দেখিলে কোটীকল্প বৎসরেও দর্শনের আশা মিটেনা, তাঁহাকে বিদ্যুৎ-চকিত দর্শনে দেখিয়া দর্শনের কি আশা মিটে? বরং মরীচিকার ন্যায় প্রাণের উদ্বেগ ক্রমশঃই বাড়ায়!

ব্রজকামিনীরা বুঝিতে পারেন নাই যে, তাহাদের মনোচোরা প্রাণকান্তের মনও তাহারা আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে ব্রজের কুলি কুলি ঘুরাইতেছেন! তাহারা কৃষ্ণই নিষ্ঠুর ভাবিয়া অভিমানের মাত্রায় তাঁহাকে আরও শতগুণ আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতেছে! তাহার উপর এই চকিত দর্শন তাহাদিগকে আরও উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছে! সুতরাং কে কাহাকে ঘুরাইতেছে তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারি-

তেছে না। এরূপ অবস্থায় গোপী ও কৃষ্ণের মনোভাব কি, তাহা মহাজন পদাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি ঃ—

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দর্শনের অভিলাষে গোপনে গমন করিয়া অলক্ষিতে দেখিবার আশায় অন্তরাল হইতে মুখ বাড়াইলেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃ শ্রীরাধার অঙ্গে পতিত হইবামাত্রই শ্রীরাধা চমকিত হইয়া চকিত দর্শনে জিব কাটিয়া ঈষৎ হাস্য-লজ্জাসঙ্কুচিত হইয়া বিদ্যুৎ-গতিতে অন্তরালে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রূপবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া বলিতেছেন ঃ—

গেলি কামিনী গজবর গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালিক কুসুম শায়ক
কুহুকি ভেলি বর নারী॥
জোরি ভুজ যুগ মোরি বেঢ়ল
ততহি বয়ন সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে শারদ ঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে জীবন জড়ায়ব
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক হৃদয়ে পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
চীত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয়॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হঠাৎ দর্শনে শ্রীরাধা লজ্জা সঙ্কুচিতা হইয়া অন্তরালে অন্তর্হিতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া দর্শনের আশা মিটাইতে না পারিয়া বলিতেছেন, আহা কি দেখিলাম!—দেখিলাম গজবরের ন্যায় মৃদুমন্দগামিনী কি মনোহারিনী কামিনী! চক্ষুতে চক্ষু পড়ায় বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রক্ত সমুজ্জ্বল অধরোষ্ঠে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় ঈষদ্ধাস্য করিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বিদ্যুদ্বেগে অন্তর্হিত হইল! অহো! সেই বরাঙ্গনা যেন ইন্দ্রজালিক (বাজীকরের) ন্যায় সম্মোহন বিদ্যা পারদর্শিনী পুষ্পশর কন্দর্পের কুহকী (মায়াজাল বিস্তার কারিনী) ভেল্কি স্বরূপ হইল। অর্থাৎ তাহার চকিত দর্শনেও মন অনঙ্গশরে জর্জ্জরিত হইল। আহা! অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি জুড়িয়া (অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা পঞ্চাঙ্গুলি সম্বদ্ধ করিয়া) আলস্যভরে ভুজ-যুগল মস্তকোর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক হস্তের তালুর সম্মুখ ভাগ বিপরীত-দিকে মুড়িয়া তদ্দ্বারা শরীর বেষ্টন করিল। মরি মরি! তাহাতে কন্দর্প যেন অঙ্গুলিরূপ চম্পক পুষ্প দ্বারা তাহার মনোমোহন বদনরূপ শরচ্চন্দ্রকে পূজা করিল। তাহাতে আরও একটা অপূর্ব্ব শোভা হইল এই যে, শ্রীরাধা বক্ষোদেশে চঞ্চল ভাবে বস্ত্রাঞ্চল ঢাকা দিল। অর্থাৎ গতি বশতঃ ওড়নার যে প্রান্তভাগ ঝুলিয়া পড়িয়াছিল তদ্দ্বারা দ্রুত কুচ যুগ ঢাকিল। তাহাতে পয়োধরের অর্দ্ধভাগ অনাবৃত হইয়া পরিদৃষ্ট হইলে বোধ হইল যেন পবন প্রভাবে বিতাড়িত শরৎকালীন শুভ্র মেঘ সুবর্ণময় সুমেরুর শিখরকে প্রকাশিত করিল। তাহার চরণের অলক্তক আমার হৃদয়ে যেন পাবক স্বরূপ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ দহন করিতেছে! তাহার পুন-

দর্শন বিনা আমার অঙ্গজ্বালা নিবারিত হইবে না। অর্থাৎ বরিহে আমি দগ্ধ হইতেছি। বিরহের অবসান অর্থাৎ মিলন না হইলে আমার মনের শান্তি হইবে না।

আবার বলিতেছেন ঃ—

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ মালা সঙ্গে তড়িতলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আচর খসি আধ বদনে হাসি
আধ হি নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আচর ভরি
তব ধরি দগধ অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা অনুপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পশারল কাম॥
দশন মুকুতা পাঁতি অধরে মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা॥

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অপরূপ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া কোন সখাকে বলিতেছেন ঃ—

অপরূপ পেখলুঁ রামা।
কনক লতা অব লম্বনে উয়ল
হরিণহীন-হিমধামা॥
নয়ন নলিনী দৌ অঞ্জনে রঞ্জল
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।

চকিত চকোর জোরে বান্ধল
কেবল কাজর পাশ ॥
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশত
গিম-গজ-মোতিম হারা।
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনি ধারা ॥
পয়সি পয়াগে জাগ শত জাগই
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক
গোপীজন অনুরাগী ॥

হিমধামা—হিমধাম-শীতগু—চন্দ্র। হরিণহীন হিমধামা—চন্দ্রের ক্রোড়ে হরিণ শিশু আছে এবং উহাকেই কলঙ্ক বলিয়া কবি প্রসিদ্ধি আছে অতএব হরিণহীন হিমধামা অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আজ বড়ই অপরূপ দেখিলাম ; কনকলতা অবলম্বন করিয়া আজ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের উদয় হইয়াছে (এখানে দেহের সহিত কনকলতার এবং বদনে সহিত চন্দ্রের সাদৃশ্য উপমিত হইয়াছে।) ভ্রূভঙ্গির বিলাসস্থল স্বরূপ অথবা অনুরাগ তরঙ্গের লীলাস্থল সদৃশ কমল নয়নযুগল অঞ্জনে রঞ্জিত। দেখিলে বোধ হয় যেন বিধাতা স্বভাব ভীত বা পলায়নোদ্যত নয়নরূপ চঞ্চল চকোরদ্বয়কে কজ্জল রেখারূপ পাশ দ্বারা বল পূর্ব্বক বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

গুরুয়া—গুরু—ভারী। গীমা—গ্রীবা। গজমোতিম—গজমতি। কম্বু—শঙ্খ। কনয়া—কনক—সুবর্ণ। ঢারত—ঢালিতেছে। গলদেশে বিলম্বিত গজমুক্তার হার গিরিবর তুল্য গুরুভার পয়োধর স্পর্শ করিয়াছে, আহা! বোধ হয় যেন কামদেব সুবর্ণময় শিবের মাথার উপর শঙ্খপূর্ণ গঙ্গা জলধারা বর্ষণ করিতেছে! [এই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে কণ্ঠকে কম্বু এবং পয়োধরকে শম্ভু উপমেয়কে উপমানরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।] যে অতিশয় ভাগ্যবান্ সে ত্রিবেণী-সঙ্গম প্রয়াগ তীর্থে [জাহ্নবী-যমুনা-সরস্বতী তীর্থে] শত যজ্ঞ সমাপন করিয়া এইরূপ রমণী-রত্ন লাভ করে ; অথবা প্রয়াগ তীর্থে শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে এইরূপ রমণী-রত্ন লাভ করিতে সমর্থ হয়, সে পরম ভাগ্যবান্।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অভূতপূর্ব্ব অনুরাগের কথা শুনিয়া গোপনে শ্রীরাধা দর্শন করিয়া আসিয়া সখা মধু মঙ্গলকে বলিতেছেন ঃ—

খেনে খেনে নয়ন কোণে অনুসরই।
খেনে খেনে বসন ধূলি তনু ভরই॥
খেনে খেনে দশন ছুটাছুটি হাস।
খেনে খেনে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে খেনে, খেনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি ঘোর।
খেনে আচর দেই খেনে হয়ে ভোর॥
বালা শৈশবে তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহে শুনবর কান।
তরুণিম শৈশব চিনই না জান॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—সখে! তরুণীর এইরূপ ভাব দেখিয়া বাল্য যৌবনের কোনটী বড় কোনটী ছোট তাহা স্থির নিশ্চয় করা যায় না। কারণ সে ক্ষণে ক্ষণে বিলাসিনীর ন্যায় নয়ন কোণে কটাক্ষ করিতেছে, কখনও বা বসনাঞ্চলে পথের ধূলি ভরিতেছে, কখন বা হা হা করিয়া উচ্চ হাস্য করিতেছে, আবার কখনও বা অধরে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মৃদু-মন্দ হাসিতেছে। কখনও বা কি যেন কি দেখিয়া বা কি যেন কি ভয়ে চকিত হইয়া বেগে ধাবিত হইতেছে। আবার কখন বা মরালের ন্যায় মন্দগামিনী! দেখ, ইহা দেখিয়া আমার বোধ হয়, অনঙ্গ অলক্ষিতে তাহার হৃদয় অধিকার করিতেছে। কারণ ইহা কৈশর-যৌবন সন্ধির চিহ্ন। বক্ষঃস্থলে বদরিকা হইতে কমলালেবুবৎ কুচ যুগের সমৃদ্ধি বার বার লক্ষ্য করিতেছে! একবার অঞ্চল দিয়া তাহা ঢাকিতেছে, আবার বস্ত্রাঞ্চল সরাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া যেন কি অপূর্ব্ব

আনন্দে আনন্দিত হইতেছে! সেইজন্যই বলিতেছি শ্রীরাধা যেন শৈশব কালেই বাল্য-যৌবনের এই বয়ঃসন্ধি বা তারুণ্যের সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ হয় যে, তাহাতে মন্মথ-পাঠের প্রথম অনুবন্ধ পৌঁছিয়াছে কি না!

কিন্তু ভাই যৌবন নহিলে কি এত রূপ হয়? তাহার সখীদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কোন উত্তর দেয় না—আমার প্রতি চাহিয়া হাসিয়া পলায়। আমি তাহার দর্শন লাভ জন্য অস্থির হইতেছি। আহা! তাহার রূপের কথা আর কি বলিব?

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিল্লোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান্।
চিনলহু রাই চিনই নাহি জান॥

সখে! সেই গৌরীর চিন্তায় আমায় আকুল করিয়া তুলিয়াছে। গোপনে দিনান্তে একবারও তাহাকে না দেখিলে আমি যেন বাঁচি না। আবার তাহাকে দেখিয়া আমার আশা মিটে না, তাহার সঙ্গ না পাইলে বুঝি জীবন থাকে না। যদি দৈবাৎ আমায় দেখিয়া

ফেলে, তবে সে যেন কেমন হইয়া যায়, কোন কথা কহে না। তাহার কথা শুনিবার জন্য আমার প্রাণ কাঁদে, কিন্তু সে গুরুজনের ভয়ে বিহ্বল হয়। ভয়ে ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিতে পারে না। তাহার বদন চন্দ্র আমার নয়নে লাগিয়াই আছে—সরে না! আমি কি করি!

হেরইতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি॥
চতুর সখী সঞে বসই।
রস পরিহাসে হসই না হসই॥
পেখল ব্রজ-নব নারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি॥
হৃদয়-নয়ন-গতি-রীতে।
সো কিয়ে নহত পরতীতে॥
ঐছন হেরইতে গৌরী।
হঠ সঞে পৈঠল মন মাহা মোরি॥
তব হি কুসুম-শর জোরি।
ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে মোরি॥
গোবিন্দ দাস চিতে জাগ।
চাঁদ কি লাগি সুরজ উপরাগ॥

মন স্থির হইতেছে না, চিন্তায় উন্মত্ত হইয়া সখাকে বলিতেছেন:—

আহা! চম্পকবরণী বয়সে তরুণী
হাসিতে অমিয়া ধারা
সুচিত্র বেণী দুলিছে জনি
কপিলা চামর পারা॥
সখি! যাইতে দেখিনু ঘাটে।

জগত মোহিনী হরিণ নয়নী
ভানুর ঝিয়ারী বটে ॥
হিয়া জয় জয় খসিল পাজর
এমতি করিল বটে।
চলল কামিনী বঙ্কিম চাহনি
বিঁধিল পরাণ তটে ॥
না পাই সমাধি কি হৈল বেয়াধি
মরম কহিব কারে ॥
চণ্ডীদাস কয় ব্যাধি সমাধি হয়,
পাইবে যবে তারে ॥

সখার কর ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ অন্যমনে থাকিয়া আবার রূপের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ঃ—

থির বিজুরী বরণ গৌরী
পেখিনু ঘাটের কূলে।
কানাড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে
নব মল্লিকার-মালে ॥
সই! মরম কহিয়ে তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
বিকল করল মোরে ॥
ফুলের গেরুয়া লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচ যুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস ॥
চরণ কমলে মল্ল তোড়ল
সুন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাস হৃদয়ে উল্লাস
পালটি হইবে দেখা ॥

আনমনে যেন ভাবোন্মত্ত হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন ঃ—

সজনি! ওধনি কে কহ বটে।
গোরচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুনহে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনি মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন করেছে আসন
এলায়ে দিয়াছে বেণী।
উচ কুচমূলে হেম হার দোলে
সুমেরু শিখর জিনি॥
সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে
পড়েছে চিকুর রাশি॥
কাঁদিয়ে আঁধার কলঙ্ক চাঁদার
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে ভুগুলি শঙ্খ ঝলমলি।
সরু সরু শশি কলা।
সাঁজেতে উদয় সুধু সুধাময়
দেখিয়ে হইনু ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হইতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ-জ্বরে ভোর॥

গোপবালাগণ নবীননীরদশ্যামের মূর্ত্তি দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া প্রতিশ্রুতির দিন গুণিয়া সঙ্গ লাভের আশায় উন্মত্ত হইয়া

উঠিয়াছে; এদিকে শ্যামও তাহাদের আকর্ষণের আবেগে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। তাহাদের সন্ধানে ঘাটে বাটে ছুটাছুটি করিতেছেন। গৃহের ছাদে, গাছের ডালে উঠিয়া অলক্ষ্যে তাহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। দলে দলে গোপবালা শিবপূজায় চলিয়াছে, দূর হইতে দেখিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত হইল না—দেখিলেন, সে দলে কে যেন নাই, লৌহ চুম্বকের নিকটবর্ত্তী হইলে যেমন আকৃষ্ট হয়, তেমন আকর্ষণ নাই, সে উদ্ভ্রান্ত ভাব কৈ? যে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে তাহাকে দেখা গেল না। চলিলেন যমুনার তীরে, চুপি চুপি চোরের ন্যায় গিয়া ঘাটে ঘাটে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কৈ সে ত নাই! যে তার প্রাণ চুরি করিয়াছে তাহার দর্শন ত মিলিল না। মানুষ দেখেলেই যে,—সে চোরকে দেখিলেই যে চেনা যায়, চোখে চোখ পড়িলেই যে, সে চোরকে ধরা যায়! সে চোরের ধারা যে স্বতন্ত্র! কিন্তু চোরের চোরধরাও যে তাহাকে ধরিতে পারিতেছে না, তাই ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া হতাশ হইতেছেন!

আহা! ভক্তের জন্য ভগবানের অধীরতা কত, তাহা পরিমাপ করিবার সাধ্য কাহার? তিনি ভক্তপ্রাণ, আবার ভক্তও তাঁহার শরীর। আত্যন্তিক অনুরক্তির আকর্ষণই তাঁহার উপাদেয় উপভোগ বা কাম্য রাজভোগ! শুধু তাহাই নহে, তাহাকে তাঁহার জীবনের উপাদানও বলা যায়। তাহার অভাবেই যেন তাঁহার শরীর শীর্ণ হয়, প্রাণ যায় যায় হয়! এই জন্যই সুর-বিরোধী অসুরের দলে জগৎ পূর্ণ হইলে তাহাদের বিনাশের জন্য তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হয়। কারণ ভক্তি প্রীতির ন্যায় তাঁহার খাদ্য আর নাই! তাই ভক্তি-শ্রদ্ধাদাতা ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার এত চাঞ্চল্য!!

তিনি প্রেমময়!—বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রেমই তাঁহার শরীর। ব্রজ গোপী তাঁহার শরীর-পরিপোষক বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রেমদাত্রী। তজ্জন্য তিনি চুরাশী ঘাটে উঁকি মারিয়া সেই শুদ্ধসত্ত্বা প্রেমময়ীর অন্বেষণ করিতে

ছেন। যেন ডাকিতেছেন, কে কোথা আছ গো এস!—আমায় প্রেম দাও, আমি প্রেমের ভিখারী। প্রেমের অভাবে আমার দেহ শুষ্ক হয়, প্রেমই আমার জীবন, প্রেমই আমার পরম উপভোগ্য খাদ্য! প্রেম দিয়া আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি কর, আমায় বাঁচাও—আমায় কিনিয়া লও! এস—এস—এস! কোন ঘাটে কে আছ এস! তোমাদের জন্য আমি আকুল হইতেছি, তোমাদিগকে না দেখিলে আমি জগৎ অন্ধকারময় দেখি!

ভক্ত আমার পিতা মাতা, ভক্ত আমার বন্ধু ভ্রাতা,
ভক্ত আমার জীবন মন।
অদম্য আমি ভক্তের বশ, ভক্তপ্রেমে পাই অপূর্ব্ব রস,
ভক্ত-প্রেমসুধা আমার আকাঙ্ক্ষার ধন॥
কে পায় আমায় খুঁজে কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যাথা!
ভক্তের তরে (ভক্তি ভরে) আমার দেখা পায় সর্ব্বজন।
ভক্তি বলে আমি হই বন্দী, ভক্ত বিনা কে বা পায় সন্ধি?
ভক্ত আমার চিরসঙ্গী, অবতরি ভক্তেরি কারণ।
ভক্ত লয়ে করি খেলা, ভক্ততরে বিশ্বমেলা
ভক্ত আমার প্রাণের প্রাণ।
ভক্ত যা সাজায় তাই হই, ভক্তের আমি অবাধ্য নই,
ছোট হয়ে ধরি পায়ে ভাঙ্গাই ভক্তের মান॥
ভক্তের এঁটো আনন্দে খাই, খেলার ছলে কাঁধে চড়াই,
ভক্তপদধূলি লয়ে মাখি সর্ব্ব গায়।
রাখাল হয়ে করি গোচারণ, শিরে বহি বাধা ভক্তেরি কারণ,
সহি কত তাদের তাড়ন ভৎর্সন অপরাধী প্রায়॥

দেবর্ষি নারদকে তিনি বলিয়াছেন,—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ॥
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীদের হৃদয়েও থাকি না; ভক্তগণ যেখানে আমার গুণগান করে, আমি সেইখানেই অবস্থান করি। ইহাই লীলাময় ভগবানের স্বভাব।

বৃন্দাবনের গোপীগণের আকর্ষণে কৃষ্ণ অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। তজ্জন্য নির্দ্ধারিত দিনের অপেক্ষায় কম উৎকণ্ঠাকুল ছিলেন না। এ উৎকণ্ঠা তাঁহার নিজের জন্য নহে, ভক্তের আকর্ষণের টানে। ভক্ত টানিলে ভগবান্ স্থির থাকিতে পারেন না; ইহাই তাঁহার স্বভাব।

আবার ভক্তের সহিত ভগবানের যতক্ষণ না মিলন হইতেছে, ভক্ত যতক্ষণ না ভগবানের সাক্ষাৎ পাইতেছে, ততক্ষণ তাঁহারও শান্তি নাই। যতই দিন যায়, যতই তাঁহার দর্শনে বিলম্ব ঘটে, ততই ভক্ত প্রাণ উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়া উঠে। ভক্তের উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষা যতই বাড়ে, ভগবান্ ততই বেগে আকৃষ্ট হইতে থাকেন। তজ্জন্য উভয়েই উভয়ের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠেন এবং উভয়েই উদ্‌ভ্রান্তভাবে উভয়কেই পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়েন।

প্রশান্ত মহাসাগর ধীর স্থির অগাধ সলিলরাশিসম্পন্ন। সামান্য আকর্ষণে তাহাকে বিচলিত করা যায় না বা তাহাতে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় না। চন্দ্রের আকর্ষণেই তাহাতে জোয়ার উৎপন্ন হয়। পূর্ণিমায় চন্দ্র সূর্য্যের সমসূত্রপাত আকর্ষণে জোয়ারের বেগ বেশী হয়। ভাদ্রের ষাঁড়াষাঁড়ীর ডাকের ভয় এই জন্যই মাঝিদের বেশী।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনচন্দ্ররূপে ব্রজবাসিনী ব্রজবালাগণে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের হৃদয় সমুদ্রে যেমন প্রবল জোয়ার উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাদের লজ্জা-মর্য্যাদা-গঙ্গা যমুনারূপ কুলশীলের দুকূল ভাসাইয়া দিয়াছেন; আবার বৃন্দাবন চন্দ্র দর্শনের অভাবে বিষম বিষাদগ্রস্ত হইয়া অমাবশ্যারূপে তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সমুদ্রে বিরহরূপ প্রবল জোয়ার উৎপাদন করিয়াছেন। নিষ্কলঙ্ক অক্ষয় কৃষ্ণচন্দ্র যেন চিন্তাগ্রস্ত হইয়া গোপীপ্রেম সমুদ্রে

ডুবিয়া তাহাদের ভাব-সলিলের সীমা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতে-ছেন কিন্তু পারিতেছেন না, হাবু ডুবু খাইতেছেন!

আমাদের বাঙ্গালী কবি বলিয়াছেন ঃ—

বিবাহ বরং ভাল এক রকমে কেটে যায়।
প্রেম তরঙ্গে নানা রঙ্গে কখন হাসায় কখন কাঁদায়!

মিলনের পর প্রেমের মাধুর্য্য নানা ভাবতরঙ্গে নবভাবে উজ্জীবিত ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে বটে, তাহা বিরহ, অভিমান ও ভাবসঙ্গতির অভাবে মধ্যে মধ্যে দুঃখ দান করিলেও প্রেমমাধুর্য্য-রসলালিত্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কিন্তু পূর্ব্বরাগ অনন্ত অসীম ভাব-সমষ্টি লইয়া শ্রীলতা ও লজ্জার আবেষ্টনে পরিরক্ষিত হইয়া প্রেমময় বা প্রেমময়ীকে আকর্ষণের সূত্র সমষ্টি যে পুষ্পমালা গ্রন্থনের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব বিস্তার প্রয়াসে আপনা বিলাইয়া দেওয়া উন্মাদনায় তন্ময় হয়, বুঝি তাহা অপেক্ষা জগতে প্রেম বিস্তারের ভাব-মাধুর্য্য আর নাই। যতক্ষণ না উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততক্ষণ আত্মরক্ষা প্রয়াসের অভূতপূর্ব্ব সম্ভ্রম জ্ঞান তাহাকে প্রেমরসামৃতসিন্ধুতে সঞ্জীবিত ও জাগ্রত রাখে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও পারম্পর্য্য রক্ষার প্রখর বিচারবুদ্ধি পরিচালনায় অভূতপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। সে অবস্থা কি কঠোর, কি অননুভূতপূর্ব্ব সংশয়ান্দোলনে দোদুল্যমান অপূর্ব্ব রসাস্বাদনের উন্মাদনাচঞ্চল-ক্ষণপ্রভাবিস্তারী আনন্দোন্মেষ, তাহা উপলব্ধি ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। এই জন্যই পূর্ব্বরাগের মহিমা, পূর্ব্বরাগের গোলাপী নেশা, পূর্ব্বরাগের অচিন্ত্য-পূর্ব্ব প্রভাব জগতে অতুলনীয়! প্রণয়ী প্রণয়িনী উভয়েই রূপগুণের নেশায় আকুল হইলেও একবারে আপনাকে বিলাইয়া দেয় না। মাছ গাঁথিয়া হুইলের সূতা মাছের দৌড় দেখিয়া যেমন অল্পে অল্পে ছাড়িতে এবং মাছকে নিকটস্থ হইতে দেখিলে কৌশলের সহিত তাহা গুটাইতে হয়, সেইভাবে তাহারা আপন আপন রূপগুণের

কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া উভয়েই উভয়কে প্রণয়াবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু দেখা যায়, প্রণয়ী অপেক্ষা প্রণয়িণীর ধৈর্য্য ও শ্রীলতাগুণ অনেক বেশী। প্রণয়ী অল্পেই অস্থির হইয়া উঠে এবং নিজের অধীরতা প্রকাশ করিয়া আপনাকে হীন ও নিলর্জ্জরূপে প্রণয়িনীর দ্বারস্থ করিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত হয় না। তাহা যে অধীরতা প্রকাশক হীন প্রচেষ্টা, তাহা বুঝিয়াও বুঝে না। আর প্রণয়িনীর বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না! রমণীর এই বৈশিষ্ট্যই তাহার রূপগুণ ও লজ্জা-মাধুর্য্য!

শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত-গুণ-সম্পন্ন পুরুষের ন্যায় প্রণয়িনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় আকুল—অধীর! ঘাটে ঘাটে তল্লাস—সখীর অন্বেষণ! তাহাদের হাত ধরিয়া মিনতি—আনুগত্য প্রকাশ। এদিকে প্রণয়িনী ধীর গম্ভীর!—কারণ রমণীর আর একটা গুণ আছে, আনুগত্য দেখিলেই উপেক্ষায় তাহা আরও পরিবর্দ্ধনের চেষ্টা করে! অধীর পুরুষ বিচার বুদ্ধিতে তাহা ধরিতে না পারিয়া যেন হতাশ হইয়াই তাহাদের পায়ে ধরিয়া একবারে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ফেলে!

আবার এদিকে সখীরাও সখীর জন্য ওৎপাতিয়া কৃষ্ণান্বেষণ করিতেছে, কৃষ্ণকে দেখিয়াও তাহারা যেন দেখিতেছে না, আনমনে পথ চলিতেছে! কৃষ্ণ দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া দৌড়িয়া গিয়া আনুগত্য জানাইতেছেন—বলিতেছেন, দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, দুটো কথা কই!

ললিতা—দাঁড়াইবার সময় নাই, সখী শিব পূজায় যাইবেন তাহার আয়োজনে ব্যস্ত আছি। তাঁর আর অন্য কোন দিকে মন নাই, শিবের প্রতি অসীম অনুরাগ জন্মিয়াছে। শিব পূজায় তন্ময় হইয়া যায়! শিবের বেশ-পরিপাট্যে এমন অপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্য যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

কৃষ্ণ—বল কি তোমাদের সখী এত শিবভক্ত হইয়াছেন? পূজার উপকরণ ও নৈবেদ্য কি কি?

ললিতা—সে কথায় তোমার কাজ কি? আমার কথা কহিবার সময় নাই; উপকরণ সংগ্রহ ও পূজায় বিলম্ব ঘটিবে। সখী অস্থির হইয়া হয় ত কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া মূর্চ্ছিত হইবেন।

কৃষ্ণ—বল কি এত অনুরক্তি? তোমারও যে তাহার প্রতি অগাধ ভক্তি দেখিতেছি। দেবতা বা গুরুর প্রতি সম্ভ্রমসূচক বাক্যের ন্যায় তাহার প্রতি তোমারও যে অসীম ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিতেছি।

ললিতা—হইবে না? গৌরীর ন্যায় একবারে শিব বলিতে অজ্ঞান! সে ভক্তি-প্রীতি, সে ভাব দেখিলে তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার কুমারীভাব দেখিয়া আমরা সকলেই তাঁহার শিষ্যা হইয়া চিরকুমারী থাকিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। "পুরুষের মুখ দেখিব না" ইহা আমাদের নিকট ত্রিসত্য করাইয়া লইয়াছেন। তুমি পথ ছাড়। যদি কোন সখী আমায় তোমার সহিত কথা কহিতেছি দেখে, তবে সে নিশ্চয়ই সখীকে একথা বলিয়া দিলে তিনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন।

কৃষ্ণ—কেন? আমি কি পুরুষ?

ললিতা ওহো! ঠিক ঠিক, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম আমায় বাঁচাইয়া দিলে! যদি কেহ দেখিয়াও ফেলে, তাহাতেও ক্ষতি নাই। যেহেতু তুমি ত পুরুষ নহ, তুমি ত রাখাল বালক—তুমি নপুংসক! তোমার পুরুষত্ব প্রাপ্তির সময় এখনও হয় নাই, সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে কি হয় বলা যায় না! সে দিন যে আর আমরা তোমার সহিত কথা কহিব, তাহারও ত কোন উপায় দেখিতেছি না। কারণ সখী চির-কুমারী হইয়া থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন! যাহা হউক অনেক কথা কহিয়া ফেলিলাম, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, সর সর কথা কহিবার আর সময় নাই। বিলম্ব দেখিলে বিশাখা আমায় খুঁজিতে আসিবে।

তাহাকেই আমার ভয়, সে যদি দেখিয়া ফেলে তবে সঙ্গে সঙ্গেই সখী আমায় পরিত্যাগ করিবেন।

কৃষ্ণ—না না, কৈ কেহই ত আসে নাই, তুমি এত চঞ্চল হইতেছ কেন? আর সে জন্য ভয়ই বা কি? সখী যদি তোমায় পরিত্যাগ করেন, তবে কি আর গ্রহণ করিবার কেহ নাই?

ললিতা—না, ব্রজে আর তেমন কেহ নাই। তুমি কি মনে কর সখী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমরা প্রাণে বাঁচিব? এ প্রাণ আর রাখিব না।

কৃষ্ণ—কেন, তোমাদের সখীর চেয়ে আর একজন যদি বেশী ভালবাসে?

ললিতা—আর কে ভালবাসিবে? তেমন ভালবাসা কি জগতে আছে? আর আমরা অন্য কারও ভালবাসা চাই না, আমরা চাই সখীকে। সখীর সুখেই আমাদের সুখ, সখীর দুঃখেই আমাদের দুঃখ। সখী যাহাকে ভালবাসেন, আমরা নির্ব্বিচারে তাহাকেই ভালবাসি—তারই সেবা করি। সখী আমাদের প্রাণ মন দেহ সর্ব্বস্ব! আরও অমরা পুরুষের প্রেম চাহি না, আমরা চাই সখীর প্রেম! যাব ছাড় ছাড় পথ ছাড়!

কৃষ্ণ—আঃ! এত ব্যস্ত হ'চ্চ কেন? শিব পূজার সময় এখনও ঢের আছে।

ললিতা—সময় ত আছে, আয়োজন ত চাই। তুমি বৃথা আমাদের সময় নস্ট ক'চ্চ; তুমি বালক, তোমার সহিত এখন আর কি কথা কহিব? প্রেম কি তাহা তুমি বুঝিবে কেমন করিয়া?

অভিমান, প্রেম-যাগ, কে বুঝে হে মহাভাগ?
যৌবন জোয়ার, সময় না এলে?

সখীর প্রতি আমাদের প্রেম তুমি বুঝিবে না। সখী আমাদিগকে না দেখিলে অস্থির হন, আমরাও তাঁহাকে না দেখিলে বাঁচি না। সখীর

কার্য্যে গমন করিলেও সত্বর ফিরিয়া সখীর নিকট যাই। আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে, ছাড় ছাড় পথ ছাড়।

কৃষ্ণ— সই! তোমরা কি আমার সই নও? তোমাদের সখীর জন্য এত চঞ্চল হও, মন কেমন করে, কৈ আমার জন্য ত তোমরা এত ব্যস্ত হওনা। তোমরা যেমন তোমাদের সখীমন্ত্রের উপাসক আমিও তেমনই তোমাদের সখীমন্ত্রের উপাসক। তোমাদের সখীকে না দেখিলে আমারও প্রাণ বাঁচে না। আমি সদাই রাধামন্ত্র জপি।

ললিতা—তুমি বলতে চাও যে, আমরা সবাই একগুরুর শিষ্য! মন্ত্রসাধনার পরিচয় ত খুবই পাওয়া যাচ্চে! সাধক মন্ত্রসাধনায় বসলে মন্ত্রের টানে ইষ্ট চঞ্চল হয়ে উঠেন, তখন তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য অস্থির হন। কৈ তোমার সাধনায় ত তেমন কিছু দেখ্‌ছি না। বরং সখীর মন্ত্র জপার ফল হাতে হাতে দেখ্‌চি। কার টান বেশী, কার বল বেশী তার পরিচয় তোমার এই সখী ধরার ভাবেই বুঝা যাচ্চে। আমাদের সখী ত তোমার মত ছুটাছুটি কচ্চেন না। কিন্তু ভাই তাঁর টানে তুমি টানা হলেও তোমার টান না থাকায় সখী অচলই রহিয়াছেন।

কৃষ্ণ—সই! আজ নূতন কথা শুনালে। তোমার কথায় তুমিই মিথ্যাবাদী হইলে।

ললিতা -কি রকম? আমি একটুও মিথ্যা বলি নাই।

কৃষ্ণ —সাধক ইষ্টকে টানে কিসের জন্য?

ললিতা —ইষ্ট লাভ জন্য?

কৃষ্ণ—তবে?

ললিতা—তবে কি? সাধক কি আসন ছাড়িয়া দৌড় দেয়? সাধক ত আসনে অটলই থাকে, ইষ্টই দৌড়িয়া তাঁহার নিকট যান। তুমি দৌড়িয়া সখীর সন্ধান করচ। সখী ত আসন ছাড়েন নাই। সেইজন্য বলিতেছিলাম তোমার মন্ত্রজপা কথার কথা, আত্যন্তিক

ব্যাকুলতা বা প্রাণের টান নাই! সেইহেতু তোমার ইষ্ট এখনও অটলই রহিয়াছেন। সুতরাং তোমার সাধনা কৈ? উপযুক্ত সাধনা না হইলে ইষ্ট লাভ হয় না। আসন ছাড়িয়া দৌড়িলে ত কথাই নাই।

কৃষ্ণ—ললিতা তুমি সত্যই বলিয়াছ। তাহার টানে আমি আসনে বসিতে পারিতেছি না, অটল হওয়া ত দূরের কথা! তবে তোমরা যদি দয়া কর তবেই আমার বাসনা সফল হয়, আমি সাধনা না করিয়াও আমার সাধ্য বস্তু পাইয়া ধন্য হই।

ললিতা—তুমি কপট। কপটের ইষ্ট দর্শন হয় না।

কৃষ্ণ—কিসে?

ললিতা—কিসে নয়? আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য অপেক্ষা করিবার আদেশ দিয়াছ, আর স্বয়ং ব্রজের পথে ঘাটে কুমারী নির্য্যাতনে ব্যস্ত আছ। গুণের কথা কি আমাদের কানে যায় নাই? সখীর নিকট তোমার কোন সংবাদই অজ্ঞাত নাই। চন্দ্রাবলীর যূথ তোমার নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছে বলিয়া শুনিতেছি।

কৃষ্ণ—ললিতা! একথা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী বিদ্যাবতী অপরিসীম চিন্তাশীলা রমণী বিশ্বাস করে? তবে আমার স্বভাব আনন্দ করা। তোমাদিগকে পাইলেও যেমন আনন্দ করি, অন্যের সহিতও তাহাই করি। কাহারও ঠাকুর পূজার নৈবেদ্য কাড়িয়া খাই, কাহারও পুষ্প-চন্দন মাল্য লইয়া পরি। কাহারও বস্ত্র ধরিয়া টানি লজ্জা দিবার জন্য। কারণ ব্রজে আমি ব্যতীত আর পূজ্য কে আছে? তাহারা না বুঝিলেও আমি বুঝি বলিয়া তাহাদিগকে আত্মসাৎ করি এবং করিব। আমার পূজা ব্যতীত যে অন্য পূজার আয়োজন করিবে তাহার নির্য্যাতন অবশ্যম্ভাবী। তোমরাও সাবধান হও আমার নিকট অনেকবার "শিব পূজা, শিব পূজা" বাক্য উচ্চারণ করিয়াছ, ইহা আমার অসহ্য। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের আকাশ-চুম্বী দেহ দেখিয়াছ!

যে দেবতা পূজা গ্রহণ বা নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন না, তাহাকে কেন পূজা করিবে ? পূজা করিতে হয় বরং গোবর্দ্ধনের পূজা করিও।

ললিতা—এত খেয়েও তোমার পেট ভরে না ? নন্দরাজের গৃহে দধি দুগ্ধ ছানা মাখনের অভাব নাই। তবু ব্রজের গৃহে গৃহে ননী-চুরি, আর ব্রজকুমারীদের নৈবেদ্য কাড়িয়া খাওয়া ! শুধু নৈবেদ্য খাবার জন্যই বুঝি আত্মপূজার প্রচারবিধান ? তুমি কি হিন্দু ধর্ম্মটা লোপ কত্তে চাও ? হিন্দু যে তার ইষ্ট দেবের পূজা করবে, তাতে বাধা দেওয়ায় হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হয় না ? মহাদেবের ন্যায় আশুতোষ ও বরদাতা আর কে আছেন ? বিশেষতঃ কুমারীদের পক্ষে। কুমারীরা বর লাভ করে কেবল আশুতোষের কৃপায়। আবার তিনি মহা-দেব ! তাঁহার ন্যায় দেবতা ত আর কেহই নাই। তুমি বালক, বালকের এত দৌরাত্ম্য ভাল নয়। আজ আমরা সবাই মিলে তোমায় বেঁধে নন্দরাণীর নিকটে নিয়ে যাব। কেউ কিছু বলে না বলে তোমার অত্যাচার চরমে উঠেছে, সাবধান !

কৃষ্ণ—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, মধুমঙ্গল প্রভৃতি সখাগণ নিকটে আছে তাহাদিগকে ডাকিব কি ? কে কাহাকে বাঁধে দেখিবে ?

ললিতা—ছি নিলর্জ্জ ! শীলতা কাহাকে বলে জান না ! ব্রজ-কুমারীরা অন্যের হস্তে নির্য্যাতিত হইবে তুমি দাঁড়াইয়া দেখিবে ? তুমি নাকি ব্রজের দেবতা ?

কৃষ্ণ—(হাসিয়া) তাহ'লে তোমরা আমায় দেবতা বলিয়া মান ?

ললিতা—প্রতি পদে যে কুমারীগণে অপমানিত করে, তাহাকে উপ-দেবতা বলিয়াই জানি, তবে লোক লজ্জার ভয়ে দেবতা বলিয়াই মানি।

এমন সময় বিশাখা অতি দ্রুতপদে আসিয়া বলিল, ললিতে ! তোদের মতন কুড়ে দুনিয়ায় নেই। তুই এলি শিবপূজার ফুল বিল্বপত্র তুলতে, আর কিনা রাস্তায় লম্পটের সঙ্গে গল্পে মেতে গেছিস্ ? সখীর পূজার সময় যাচ্ছে, অস্থির হচ্চে।

ললিতা কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, দেখলে ! আজ আমার বড় বিপদ ! বিশাখার খর্পরে যখন পড়েচি তখন আর রক্ষে নেই ! তুমি যদি রক্ষে কর ভাই তবেই রক্ষে !

বিশাখা—আবার কি ফুস্‌ফাস্‌ কচ্চিস্‌, শীগ্‌গির আয়। ফুল বেলপাতা তুলেচিস্‌ ?

ললিতা—কৈ তুলেচি, আমার রাস্তা আগলেচে যে, আমি যাই কেমন করে ?

বিশাখা—তোরা এতগুলো আছিস্‌ ঠেলে যেতে পারলি না ? তা নয়, তোরা ইচ্ছে করেই বচনসুধা পান কচ্চিস্‌।

ললিতা—তুইও না হয় কতকটা পান কর না।

বিশাখা—আমার প্রয়োজন নাই। আমি যে সখীর প্রেম বিকাইয়াছি, তাঁর আজ্ঞাই আগে পালন করব। তোর মত লম্পট দেখে অস্থির হই না।

ললিতা—(কৃষ্ণের প্রতি) দেখ ভাই ! দুটো কথা কইতেও দোষ তবু আমি ইচ্ছে করে দাঁড়াইনি, বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েচি !

কৃষ্ণ—সখারা সব এস, মধুমঙ্গল ! অপূর্ব্ব জিনিস্‌ দেখবে এস ! ললিতে ! তোমার রূপের চেয়ে আহা বিশাখার কি রূপ ! আহা ! শুধু রূপ নয়, গঠনের এমন লালিত্য কি মধুর ! এমন করে এক দিনও ত দেখিনি !

বিশাখা—আমার কপাল !

কৃষ্ণ—সত্যি বলচি বিশাখা, তোমায় কি বলে আদর করব খুঁজে পাইনি !

বিশাখা—কি হয়েচে ! আমার রূপ নিয়ে তোমার কি হবে ? আদর যে ধরেনি ! আমরা যে রূপের দাসী, সে রূপের চেয়ে আমাদের এ রূপ ? সে রূপটা যদি একবার চোখ দিয়ে দেখ, তবে যাবে !

কৃষ্ণ—সেরূপটা তোমরা ঘিরে রেখেচ যে, আমাকে দেখতে দিচ্চ কৈ? তা হোক্ বিশাখা আজ যখন তোমাকে পেয়েছি, তখন তোমার সহিতই আনন্দ করা যাক্।

ইহা বলিয়া কৃষ্ণ বিশাখার দিকে অগ্রসর হইলে সে মুখ ঝাম্‌টা দিয়া বলিল, খবরদার! ছুঁয়োনা! বলিয়া পলাইতে উদ্যত হইলে বিপরীত দিক হইতে মধুমঙ্গল প্রভৃতি সখাগণ আসিয়া রাস্তা আগুলিয়া দাঁড়াইল! তাহা দেখিয়া বিশাখা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বিশাখা এবার? পলাও!

বিশাখা কিয়ংকাল স্তম্ভিতা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ললিতে! তুই দাঁড়িয়ে দেখচিস্?

ললিতা—তোর ন্যায় আমিও যে বন্দী! তোর আস্ফালনের এই ফল! আমি সখীর জন্য অস্থিরচিত্ত হইলেও ধীরভাবে বিপদ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম—তুই এসে সর্ব্বনাশ ঘটালি!

কৃষ্ণ—ললিতা তুমি যাও, তোমাকে আমি চাই না, তোমার সখীর জন্য করণীয় কর্ম্ম করগে। তোমার বিল্ব পত্রের প্রয়োজন, সুবল, তুমি যাও ত ভাই এখনই পাড়িয়া দাও।

ললিতা সখীগণের সহিত সুবলের অনুগমন করিল। বিশাখা তাহার সহিত যাইবার উপক্রম করিলে বাধা প্রাপ্ত হইল।

বিশাখা—কৃষ্ণ! এ কি তোমার গুণ্ডামি? দিবাভাগে রাজ-পথের উপর এতগুলি সখার সহিত পরস্ত্রীর প্রতি তোমার একি আচরণ?

কৃষ্ণ—কেন, দুষ্টাচরণ ত কিছু করিতেছি না। সুন্দর ও অপূর্ব্ব জিনিস মানুষের চোখে পড়িলে প্রাণ ভরিয়া দেখিবে না? দেখিতেও দোষ?

বিশাখা—রাস্তায় গেলে দেখিতে দোষ নাই, কিন্তু আটকাইয়া কি দেখা?

কৃষ্ণ—গোলাপের রূপে আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাহা তুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহা দেখে ও রূপ-রস উপভোগ করে।

বিশাখা—আমি কি গাছের গোলাপ? আমার কি মা বাপ, আত্মীয়স্বজন নাই?

কৃষ্ণ—লোকে অপূর্ব্ব জিনিস দেখাইয়া পয়সা লয়। তোমার রূপ দেখাইয়া না হয় পয়সা লও।

বিশাখা—রাখালের বুদ্ধি আর কি হবে? রাখাল প্রেমের কি জানে? এই জন্যই সখীকে নিবারণ করিয়াছি যে, রাখালের সহিত কোন কথাই বলিও না। রাখাল তোমার মর্য্যাদা কি বুঝিবে? যাহারা নারীর সম্মান জানেনা, কিসে নারীর মর্য্যাদা রক্ষা হয় তাহার চিন্তাও করে না, ছায়া লাগিলে যে নারীর কলঙ্কের সম্ভাবনা, সেই নারীকে যাহারা খেলার জিনিস করিয়া জনসাধারণকে দেখাইতে চায়, বিপণির সামগ্রী করিয়া তুলে, তাহারা মানুষ না পশু? রমণীর লজ্জা সম্ভ্রম কিসে নষ্ট হয়, কিসে থাকে, সে জ্ঞান যাহাদের নাই, যাহারা আপন নারীকে অন্যের সম্মুখে অপ্রতিভ করে, তাহাদিগকে মানুষ বলা যায় কেমন করিয়া? সাধারণীরাও নারীসুলভ লজ্জা পরিত্যাগ করিতে পারে না। হে ব্রজনাথ! তোমর উদ্দেশ্যেই কাত্যায়নী পূজা করিয়াছি, আমরা তোমারই শরণাগত, তোমাকেই আত্মবিক্রয় করিয়া তোমারই আদেশে নির্দ্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু ধৃষ্ট ব্রাহ্মণ মধুমঙ্গল ও তোমার অন্যান্য সখাদিগের সম্মুখে তোমার চপলতা প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে। (শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে ইহাদিগকে সরাইয়া দাও সখীর বিশেষ কথা আছে।)

শ্রীকৃষ্ণ—সখাগণ! তোমরা সব যমুনার তীরে ধেনু সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য সত্বর গমন কর, আমিও শীঘ্রই যাইতেছি, বিপদের আশঙ্কা থাকিলেও ভীত হইও না।

ইহা শুনিয়া সখাগণ সত্বর প্রস্থান করিল।

বিশাখা—(কৃষ্ণের প্রতি) এখন উপায় কি ?

কৃষ্ণ—কিসের ?

বিশাখা—সখীর জন্য আমারা চঞ্চল হইয়াছি।

কৃষ্ণ—কেন ?

বিশাখা—আর ধৈর্য্য মানিতেছে না মুহুর্ম্মুহুঃ মূর্চ্ছা হইতেছে! প্রতিক্ষণেই যেন কি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছে! কৃষ্ণাসখীকে মুহুর্ম্মুহুঃ আলিঙ্গন করিয়া নয়নের জলে ভাসিতেছে। ময়ুর দেখিয়া অধীর হইতেছে, হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ সমূহ দর্শন করিয়া আপনাপনি বক্ষেঃ বসনাঞ্চল দিয়া রোদন করিতেছে। নারীর বুক ফাটিলেও মুখ ফোটে না! কিন্তু তাহাও আর পারে না, ধৈর্য্যের সীমা আছে, সে সীমাও অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমরা নানা অছিলায় তোমাকে দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছি। তোমার সেই নির্দ্দিষ্ট দিনের অপেক্ষায় ভয়ে কিছু বলিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহার প্রাণ রক্ষার কিছু উপায় কর।

কৃষ্ণ—সই! সত্য বলিতে কি আমিও অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছি। আমার হৃদয় আর স্থির থাকিতেছে না। তোমাদের সখীর আকর্ষণে আমার সত্যসঙ্কলতাও টলটলায়মান হইয়াছে। মিলন ব্যতীত এ অনুরাগের সাময়িক প্রশমনও অসম্ভব।

বিশাখা—রমণী শত-সহস্র যন্ত্রণায় কাতর হইলেও মুখে ওকথা বলিতে পারে না। তোমার প্রতিকৃতি আঁকিয়া সখীকে দেখাইয়াছি, তাহা দেখিয়া বক্ষেঃ লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে মূর্চ্ছিত হইতেছে। উদরে অন্ন যাইতেছে না, বহু চেষ্টা করিয়াও ভোজন করাইতে পারি না। আমরা এই বিষম বিপদে চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতেছি। একমাত্র প্রতিকার তোমার হস্তেই আছে। নারীবধের পাপের ভয় যদি তোমার থাকে তবে আশু প্রতিকার কর। (শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া) হে ব্রজনাগর! সখীর জন্য আমরা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, লজ্জাসরমের

আর কথা কি! কেমন করিয়া সখীকে বাঁচান যায় তাহারই উপায় কর।

কৃষ্ণ—সই! তোমাদের সখীর জন্য আমিও চিন্তাকুল হইয়াছি, কিন্তু উপায় ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তোমাদের সখীকে বলিও আমি তাহার প্রেমেই বাঁধা পড়িয়াছি। তাহার আকর্ষণে আমাকে সত্যভঙ্গের পাপেও লিপ্ত হইতে হইবে। সত্যভঙ্গ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ। যদি আমি এখন তাহার সহিত মিলিত হই, তবে সাময়িকভাবে তাহার দুঃখের উপশম হইতে পারে বটে কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আমায় তুষানলে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। ইহা যদি তাহার অভিপ্রেত হয়, আমি এখনই তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিব।

বিশাখা—নিষ্ঠুর! এ নিদারুণ কথা আমি কেমন করিয়া বলিব? একথা বলিবার পূর্ব্বে আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হয়।

কৃষ্ণ—সই! অধীর হইও না। বিকারে বিষবড়িরই প্রয়োজন হয়। আমি যাহা বলিলাম ইহাতে আন্তরিকতার উপশম হইবে। আমাদের মিলনের দিনও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। সুতরাং সব দিক দেখিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। বিশাখে! তোমাদের সখীর জন্য আমার প্রাণের ভিতর কি যাতনা হইতেছে তাহা তোমরা বুঝিবে না। রমণী কামাষ্টগুণা বলিয়া কথিত হইলেও তাহাদের ধৈর্য্য, বিচারশক্তি, লোকলজ্জার ভয় পুরুষ অপেক্ষা শতগুণ অধিক। আমি তাহাকে গ্রহণ করিলাম, এই প্রতিশ্রুতি স্বরূপ আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক ও হার দান করিলাম।

ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হীরামণিমানিণক্য-খচিত সুবর্ণ অঙ্গুরীয়ক ও হার বিশাখার হস্তে অর্পণ করিলে বিশাখা তাহা অঞ্চলে বন্ধন করিয়া বলিল, হে মনচোর! তোমার প্রদত্ত অলঙ্কার আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিলাম বটে, কিন্তু—

পত্রে কি ভুলে মন বিনা দরশনে,
শিশিরে কি ফলে ধান বিনা বরিষণে ?

জানি না, হয় ত ইহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়াইবে।

কৃষ্ণ—তবে কি বলিতে চাও ?

বিশাখা—কি বলিতে চাই তাহা জানি না। শুধু এই বলি যে, তাহার প্রাণ বাঁচাও। জগতে এমন প্রেমোন্মাদিনী থাকে তাহাও জানিতাম না। আমরা নিরুপায় হইয়াছি। কালরূপের কি মাধুর্য্য তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহা বলিতে পারি না।

কৃষ্ণ—বিশাখে! কালরূপ নয়, এ কালরূপ! এরূপই কাল হইয়াছে। বিশাখা তুমিও ত কাত্যায়নী পূজা করিয়াছিলে!

বিশাখা হাঁ করিয়া ছিলাম সখীর অভিপ্সিত বরলাভের জন্য।

কৃষ্ণ—অহো! তুমি বর লাভের আকাঙ্ক্ষা কর নাই ?

বিশাখা—আমি বর চাই নাই, বরের ত এই সুখ! কাঁদিতে কাঁদিতে জনম গেল! যাহারা ব্রহ্মচারিণী তাহারা জগৎকেও গ্রাহ্য করে না সর্ব্বদা সর্ব্বথা স্বাধীনা। বর চাওয়ার অর্থ—আত্মবিক্রয় করিয়া পরাধীন হওয়া। সখীকে ঐ বিষয়ে কত বুঝাইয়াও প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলাম না। তবে এখনও আশা ছাড়ি নাই। এক ভৈরবীকে আনাইয়া রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেছি। তিনি শিব পূজার আসন, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতি শিক্ষা দিতেছেন। তাহার ব্রহ্মচর্য্যের তেজ দেখিলে আশ্চার্য্যন্বিত হইতে হয়। তিনি পুরুষের মুখ দেখেন না।

শ্রীকৃষ্ণ—বেশ—বেশ! তবে ত বৈদ্য মিলিয়াছে। সে ভৈরবীকে একবার আমায় দেখাইতে পার ?

বিশাখা—খুব খুব! গোকুলেশ্বর শিব মন্দিরে আজিই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। ললিতা গিয়া এতক্ষণ শিব পূজার আয়োজন করিয়াছে। আমি শঙ্খ ধ্বনি করিতে করিতে যাইব। শঙ্খ ধ্বনি

শুনিলেই বুঝিবে আমরা শিব পূজায় যাইতেছি। তবে আমি এখন আসি ?

কৃষ্ণ—তোমায় ছাড়িতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। তুমিই প্রধান মন্ত্রী। তোমারই কূটবুদ্ধিতেই যত অনর্থ হইতেছে।

বিশাখা—সে কি! আমিই তোমাদের অর্থ সমাধানের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। তজ্জন্য বনে বনে ঘুরিয়া তোমার অন্বেষণ করিতেছি, আর আমারই দুর্ণাম ? আমি তোমাদের প্রেমে বাধা দিতেছি ? বিশ্বাস না কর, আমার সঙ্গে এস, নিজের চোখে দেখ! দেখিতে দোষ কি ? দেখিলে ত আর ছোঁয়া হয় না!

কৃষ্ণ—না—না ঐ শিব মন্দিরেই হবে।

বিশাখা—তুমি সাবধানে এস। ভৈরবী ঘোমটা দিয়া থাকে পুরুষের মুখ দেখে না। তুমি বালক হইলেও সে সাবধান হইবে; অতএব তুমি কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একা যাইবে। আমি দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত থাকিব, ইঙ্গিত করিলেই আমার নিকট উপস্থিত হইবে।

কৃষ্ণ—আচ্ছা, তুমি অগ্রসর হও, আমি সময় মত পৌঁছিব।

(কৃষ্ণ ও বিশাখা উভয়েই উভয় দিকে প্রস্থান করিলেন)

বিশাখা গিয়া দেখিল শিবপূজার আয়োজন সমস্তই ঠিক হইয়াছে। ললিতা সখীদের যূথ পরিচালনার ব্যবস্থা করিতেছে। শ্রীরাধা মালা গাঁথায় ব্যস্ত। সখীরা নৈবেদ্য, পুষ্প বিল্বদল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও চন্দনাদি সুবর্ণ পাত্রে সজ্জিত করিয়া আপনাদের বেশভূষায় মনোযোগী হইয়াছে।

বিশাখা বলিল ললিতে! তোমায় ভৈরবী সাজিতে হইবে। কাষায় বস্ত্র ও স্ফটিকের মালা পরিধান করিয়া হস্তে দীর্ঘ ত্রিশূল লইয়া রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি ভূষিত হইয়া গমন করিবে, দীর্ঘ ঘোমটা দ্বারা বদন আবৃত করিয়া রাখিবে। মস্তক এমনভাবে আচ্ছাদিত করিবে যেন

কোনরূপে কেহ মুখ দেখিতে না পায়। সেই আচ্ছাদনীর বাহিরে সুদীর্ঘ পিঙ্গল জটাজাল নিতম্ব অতিক্রম করিয়া লম্বিত হইবে।

ললিতা বলিল, ভাই তুই-ই ভৈরবী সাজিবার উপযুক্ত পাত্র। তুই ই ভৈরবী হ!

বিশাখা বলিল, না তা হ'বে না, আরও অনেক কথা আছে, আমাকে তদ্রূপ ব্যবস্থা ক'রতে হবে। আরও চতুর চূড়ামণির সঙ্গে যে সব কথা বার্ত্তা হ'য়েছে, আমায় না দেখলে তার সন্দেহ হবে। তা' হলে আমাদের সমুদয় উদ্যম ব্যর্থ হবে।

তাহা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন, ব্যাপার কি?

বিশাখা—আমি বলেছি যে, একজন আজন্ম ব্রহ্মচারিণী ভৈরবী আসিয়া আমাদের সখীকে শিবপূজা শিখাচ্ছেন। তিনি পুরুষের মুখ দেখেন না। পাছে হঠাৎ দেখে ফেলেন, এজন্য সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে বদন চন্দ্র আবৃত করিয়া রাখেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের তেজোদীপ্ত স্বরূপ তাঁহার বদনচন্দ্রে এমন জ্যোতিঃ নিঃসৃত হয় যে, অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়াও সে জ্যোতিতে দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমি আরও বলিয়াছি যে সেই ব্রহ্মচারিণী, সখীকে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিতেছেন, কোন পুরুষকে দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সখী তাহারই উপদেশ মত শিবপূজায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহারই ন্যায় অবগুণ্ঠন অবলম্বন পূর্ব্বক পুরুষ ত দূরের কথা, নারী লোচনেরও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছেন। তাহা শুনিয়া ভৈরবীকে দেখিবার জন্য তাহার মন অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছে।

তাহা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন আর উপায় নাই, সেই ভাবেই সাজ।

ললিতা বলিল—না—না যত সহজ ভাবিতেছে তা নয়, ওর কিছু মতলব আছে, নতুবা আমাকে ভৈরবী সাজিতে বলিতেছে কেন?

বিশাখার কথা শুনিয়া নাগরের আগমন বার্ত্তায় অত্যন্ত আনন্দ-

লাভ করিয়া, সেই আনন্দ সংগোপন পূর্ব্বক শ্রীরাধা বলিলেন, ললিতে! সেজন্য ভয় কি? তোমার যদি কিছু হয়, আমি প্রাণ দিয়া তোমায় রক্ষা করিব।

ললিতা—মন্দ নয়, তোমারও কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে নাকি?

শ্রীরাধা—আমরা এত সখী যাইতেছি, গূঢ় উদ্দেশ্যের জন্য তোর ভয়েরই বা কারণ কি? আচ্ছা চম্পকলতা অনঙ্গমঞ্জরী ও অন্যান্য সখীগণও তোমার ন্যায় ভৈরবী সাজিয়া তোমারই সখী হইয়া তোমায় রক্ষণবেক্ষণ করিবে, কেহ আর তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ললিতা—আচ্ছা তাহাই হউক। কিন্তু শিবমন্দিরে সকলকেই অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতে হইবে। আমি মন্ত্রোচ্চারণ করিলে সকলেই সমস্বরে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মহাদেবের উদ্দেশ্যে ফুল বিল্বদল নিক্ষেপ করিবে। আমি নীরব থাকিলে সকলেই নীরব থাকিয়া ধ্যানের ভাণ করিবে।

যত সত্বর সম্ভব আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া শ্রীরাধা সমভিব্যাহারে সখীগণ পূজোপকরণ লইয়া শঙ্খনাদের সহিত যাত্রা আরম্ভ করিলেন। রাজপথে বাহির হইলেই তাহাদের অপূর্ব্ব ভৈরবী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পথিকগণ বিস্ময়-চকিত নেত্রে তাহা দর্শন করিতে লাগিল।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সহিত ভৈরবী দর্শনের জন্য যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অভিনব সাজে সজ্জিত হইলেন। হস্তে মোহন বেণু, গলদেশে বনমালা, মস্তকে বর্হাপরিশোভিত অত্যুজ্জ্বল মুকুট, গণ্ডদেশ চন্দনচর্চ্চিত ক্ষুদ্র লতাপুষ্পদামে সুশোভিত, রক্তগর্ভ মখমলের পীতধড়ার অনির্ব্বচনীয় ঔজ্জ্বল্যে রত্নখচিত হেমহার বক্ষেঃ লম্বমান হইয়া দামিনীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। সখাগণ অনুরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। ইহা তাঁহাদিগের বাহিরের পরিচ্ছদ। ভিতরে তাঁহারা সকলেই ভৈরব সাজিলেন এবং ভৈরবের অন্যান্য উপকরণ অর্থাৎ ব্যাঘ্র চর্ম্ম,

বিভূতি, ত্রিশূল, ডম্বুরু ও জটাজাল প্রভৃতি এবং সিদ্ধিঘোটা দণ্ড, পাথরবাটী, গাঁজার সুবৃহৎ কলিকা ও বস্ত্রখণ্ডও সংগ্রহ করিয়া গোপনে সংরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

ব্রজবালাগণ পথে বাহির হইয়া শিবপূজোদ্দেশে গমন করিতে আরম্ভ করিলে অন্যান্য রামাগণ তাহাদের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের দল পুষ্টি করত চলিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে তাহারা গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলে কৌতুক দর্শনাগিনীগণ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

এদিকে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ললিতা ভৈরবীবেশধারিনী শ্রীরাধাকে দক্ষিণে লইয়া অন্যান্য ভৈরবীর সহিত সুবিস্তৃত অবগুণ্ঠনে বদনচন্দ্র অবগুণ্ঠিত করিয়া প্রধান আসন গ্রহণ করিল। সখীরা তাঁহাদিগের পার্শ্বে ও পশ্চাতে উপবেশন করিয়া যথারীতি পূজা ও মন্ত্রোচ্চারণ জন্য প্রস্তুত হইল। বিশাখা দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের পূজা-শৃঙ্খলার ভাণ করিয়া কোন পুরুষ, এমন কি রমণী-গণকে তফাতে যাইতে অনুরোধ করিতেছিল।

এদিকে ললিতা বিল্বপত্র, অর্কপুষ্প, অর্কপুষ্পমালা, চম্পকপুষ্প ধুতুরাপুষ্প প্রভৃতি চন্দন চর্চ্চিত করিয়া মহাদেবের উদ্দেশ্যে অর্পণ করিবার জন্য সকলকেই তৎসমুদয় একে একে হস্তে লইতে বলিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল। সখী ললিতার উচ্চারিত মন্ত্র আওড়াইয়া শিবপূজায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছে। মন্ত্রোচ্চারণ শব্দ মন্দির প্রতি-ধ্বনিত করিয়া বাহিরের আকাশ বাতাসে গিয়া মিশিতেছে। এমন সময় বিশাখা দেখিল সানুচর শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ববেশে আগমন করিতেছে। আগমনের ভঙ্গী যেন তাঁহাদিগের আগ্রহোৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে। তাহা লক্ষ্য করিয়া ভাবিল আজ কি একটা অপূর্ব্বকাণ্ডই সংঘটিত হইবে। সে ভয়ে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রদীপের সলিতা উস্কাইবার ভাণ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে রাখালের দল মন্দির দ্বারে আসিয়া ভৈরবীদের পূজা দেখিতে লাগিল। ঘোমটার ভিতর দিয়া তাহারা সানুচর বনমালীকে অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত দেখিয়া মন্ত্র ভুলিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল!

বিশাখা ইচ্ছা করিয়া এবং যেন সহসা পুরুষের আগমন হইয়াছে ইহা জানিতে পারার ভাণ করিয়া দ্বারদেশে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—ছি! ছি!! ছি!!! রাখালগণ তোমরা কর কি? সত্বর সরিয়া যাও, সত্বর সরিয়া যাও। ভৈরবীরা পুরুষ দর্শন করেন না। বিশেষতঃ প্রধান ভৈরবী. যিনি মধ্যস্থলে মহার্ঘ্য আসনে উপবিষ্ট আছেন, পুরুষের ছায়া স্পর্শ. ত দূরের কথা, নাম পর্য্যন্ত উঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না। বালকের আগমনও উনি সহ্য করিতে পারেন না। যদি তোমাদের প্রসাদ পাইবার লোভ থাকে, তবে এখন ঐ দূরে বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করগে। পূজান্তে আমি প্রসাদ লইয়া তোমাদের দিয়া আসিব। তোমাদের আগমনে উঁহাদের মন্ত্রোচ্চারণ শক্তিও লোপ পাইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ—হে গোপি! তোমাকে ত বেশ রূপসী, সাহসী ও যুবতী এবং সম্ভ্রান্ত পরিচারের কন্যা বলিয়া বুঝিতেছি, সুতরাং তোমার নিশ্চয়ই বিদ্যাবুদ্ধিও আছে; উঁহারা ত সকলেই ঘোমটা দিয়া শিব পূজায় নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া আছেন, আমরা যে এখানে আসিয়াছি, তাহা উঁহারা কেমন করিয়া বুঝিলেন? কারণ আমরা ত নিঃশব্দে এখানে আগমন করিয়াছি।

মধুমঙ্গল হা হা শব্দে হাস্য করিয়া বলিল, কেন ঘোমটার ভিতর দিয়া দেখা যায় না? বড় মানুষের মেয়েরা চিকের ভিতর দিয়া সব দেখে শুনে—যাত্রা-অভিনয়—আরও কত কি! তাদের লজ্জাশীতলার সেই পর্দ্দা দেখ নাই?

বিশাখা—ও কি কথা—অভদ্রের মতন! ভৈরবীরা পুরুষের

নামও কাণে শুনেন না, তাঁরা তোমদিগকে ঘোমটার ভিতর দিয়া দেখিতেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণ—তবে কেমন করিয়া টের পাইল—গন্ধে ?

বিশাখা—উহাদের নাকে তূলো দেওয়া আছে, গন্ধ লইবার যো নাই।

শ্রীকৃষ্ণ—কর্ণে কিছু শুনিল না, নাকে গন্ধ পাইল না, চক্ষে দেখিল না, তবে কেমন করিয়া উঁহারা পুরুষের অস্তিত্ব অনুভব করিলেন ?

বিশাখা—উঁহারা কি সাধারণ মানুষ ? উঁহারা যে যোগিনী, যোগবলে জানিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ—আচ্ছা তাহাই হউক, আমরা কি করিব, উঁহারা যোগবলে জানিয়া সাবধান হউন।

বিশাখা পূজার সময় বাধা দিও না—উৎপাত করিও না—রাখালী-বুদ্ধি ছাড়। পূজান্তে পেট ভরিয়া তোমাদিগকে প্রসাদ খাওয়াইব। ছানা, চিনি, মাখন, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, নবনী, পেড়া লাড্ডু সবই আছে। যে যত খেতে পার দিব। নন্দরাজের কুলে কালী দিওনা। মা যশোমতী নিত্য কত নূতন নূতন খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তোমায় ভোজন করান, কিন্তু তবু তোমার আশা মিটে না। তাঁর লক্ষ লক্ষ গাভী। দধি দুগ্ধ, ছানা, নবনীর সীমা নাই, তত খাইয়াও আশা মিটে না, ভৈরবীদের পূজার নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইতে দল বাঁধিয়া আসিয়াছ ?

মধুমঙ্গল—সখা! ওসব কথায় কাণ দিও না। অবান্তর কথা পাড়িয়া আসল কথা চাপা দিবার চেষ্টা! আমরা ভৈরবীদের নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইব, হাত তোলা লইব না; ত্রিশূল কাড়িয়া লইব। জটা ছিঁড়িব, গেরুয়া খসাইব, প্রবীণা ভৈরবীর মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দিব বলিয়া বিশাখার সহিত যে পরামর্শ করিয়াছ, তাহার এক-চুলও ব্যতিক্রম না হয়।

তাহা শুনিয়া প্রধানা ভৈরবীর পার্শ্বস্থ ভৈরবীরা হাসিয়া উঠিল! প্রধানা ভৈরবী যেন তাহা শুনিতে পাইল না, এরূপ ভাণ করিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল।

বিশাখা—অ্যা! এত বড় মিথ্যাবাদী কি জগতে আছে? সখার বলে তুমি বলীয়ান, নতুবা আজই তোমায় উত্তম শিক্ষা দিতাম! মিথ্যা কথা বলিয়া ভৈরবীগণের নিকট আজ আমাকে এত বড় অপ্রস্তুত করার ফল সঙ্গে সঙ্গেই দিতাম, কেবল তোমার সখার অপমানের ভয়েই নিরস্ত রহিলাম। তোমাদের সখাকে আমরা ভালবাসি এই জন্য যে, সে যশোমতীর সন্তান। রাণী আমাদিগকে কত যত্ন, কত স্নেহে আদর করেন, কত চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় খাদ্য খাওয়াইয়া পরিতোষ লাভ করেন, সে স্নেহ যত্নের তুলনা নাই। তাহাতে আমরা তাঁহার গর্ভজাত কন্যা অপেক্ষাও কম স্নেহের পাত্রী নই। আমরা যশোমতীর আদর আহ্বানে তাঁহার ভবনে গিয়া তাঁহার পাকশালায় কত লাড়ু তাঁহার গোপালের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতে আদিষ্ট হই। সে হিসাবে নন্দদুলালও আমাদের কম আত্মীয় নহেন।

মধুমঙ্গল—এত সব সখা এসেচে, আর কারোমুখে কোন কথা নাই। নীতি শাস্ত্রে আছে—

" ন গণস্যাগ্রে গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলং।
যদি কার্য্যে বিপত্তিস্যাৎ সাম্মুখর তত্র হন্যতে॥

আমি গাল খাইয়া মারধর করিয়া নৈবেদ্য কাড়িয়া আনিব, আর সখারা তার ভাগ লইয়া উদর-পূর্ত্তি করিবেন, বেশ মজা ত! বিশাখার কথা কেহ শুনিও না, এস সখাগণ সমবেত হও, বিশাখাকে দ্বারদেশ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দাও। উহাকে অপসৃত না করিলে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এস শ্রীদাম, সুদাম, দাম বসুদাম সত্বর অগ্রসর হও। সখার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিতেছ না? সখা উহাদের তৈরী মিঠাই লাডড়ু খায় কি না, তাই লজ্জায়

অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই এস।

তাহা শুনিয়া ভৈরবীগণ প্রমাদ গণিয়া ত্রিশূল হস্তে লইয়া সত্বর আসিয়া বিশাখার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।

বিশাখা—(বলিল), মধুমঙ্গল ! তোমাতে মধুও নাই, মঙ্গলও নাই। তুমি সর্ব্বদাই কেবল বিবাদ বাধাইতেই মজবুত। তোমার নারদের বংশে জন্ম। কিন্তু আজ আর তোমার নিস্তার নাই, ভৈরবীগণ ত্রিশূলহস্তে তোমার সর্ব্ব কলহের অবসান জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন, একবার অগ্রসর হইয়া ইহাদের বল পরীক্ষা কর।

শ্রীকৃষ্ণ—বিশাখা ক্ষমা কর। ব্রাহ্মণের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিও না। আমরা সন্ধি করিতে প্রস্তুত। এখন কিছু প্রসাদ মধুমঙ্গলকে দাও। ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই মধুমঙ্গলের কলহে প্রবৃত্তি জন্মে।

বিশাখা—আমরাও সন্ধি করিতে প্রস্তুত, তবে মধুমঙ্গলের সহিত নহে, তোমার সহিত। উহার উত্তরীয় কাড়িয়া লইয়া তাড়াইয়া দাও। আমরা উহাকে প্রসাদ দিব না, তোমাকে দিতেছি।

মধুমঙ্গল—বিশাখা ! একবার সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া দেখ, মধুমঙ্গলে কত মধু পাইবে ! মধুমঙ্গলের মধুতে সন্ধি করিয়া মধুমঙ্গল হইয়াছে।

বিশাখা—মূর্খ ব্রাহ্মণ ! সন্ধি কাহাকে বলে তাহাও জান না। স্বরবর্ণে—স্বরবর্ণে বা স্বরবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে পরস্পর মিলিত হইয়া আকার গত যে পার্থক্য জন্মায় তাহারই নাম সন্ধি। মধুমঙ্গলে সন্ধি হয় নাই, সমাস হইয়াছে। মধু ও মঙ্গল দুই-ই পৃথক। ঘৃত ও মধু দুই-ই জীবের হিতকারী উপাদেয় পদার্থ। কিন্তু উভয়ের মিলনে বিষ উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ মধুমঙ্গলে মধু ও মঙ্গল মিলিত হইয়া তাপ অর্থাৎ কলহ উৎপাদন করিতেছে !

মধুমঙ্গল—সখা ! আসল কথা চাপা পড়িতেছে। ভৈরবীরা যদি শুনিতে না পায়, তবে বিশখাকে তাড়াইয়া দিয়া নৈবেদ্য

কাড়িয়া লইবার কথায় ভৈরবীরা ত্রিশূল লইয়া দ্বারে দাঁড়াইল কেন ? নিশ্চয়ই উহারা আসল ভৈরবী নয়।

বিশাখা—অগ্রসর হইলেই তাহার পরিচয় পাইবে। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) এই কলহপ্রিয় ব্রাহ্মণকে সঙ্গে রাখিয়াছ কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ—উপায় কি ?

বিশাখা—(শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে বলিল) একবার মন্দিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াও, তারপর আমি যাহা বলিব, সেইরূপ কার্য্য করিলে প্রসাদ গ্রহণচ্ছলে তোমার দর্শন স্পর্শন উভয় ফলই হইবে। (অনন্তর প্রকাশ্যে বলিল) প্রসাদের জন্য হুড়োহুড়ি করিও না, ভোগের আগে প্রসাদ হয় না। তোমাদের জন্য শিবপূজার ব্যাঘাত হইতেছে, এখন তোমরা গরু চরাওগে, পরে আসিও।

শ্রীকৃষ্ণ—ভৈরবীরা একটু সর, পূজোটা দেখিয়া যাই।

ইহা বলিয়া কৃষ্ণ মন্দিরদ্বারদেশে উপস্থিত হইলে ভৈরবীরা সরিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলে নিমিষে মন্দির মধ্যে সর্ব্বশরীর-স্পন্দনকারী,—যেন বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত ভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হইল। সেই চঞ্চলতা লক্ষ্য করিয়া জনৈকা ভৈরবী বলিল পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।

শ্রীকৃষ্ণ—(তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন), যাঁহার পূজা করিতেছ সেই শিব, স্ত্রী না পুরুষ ? কি ধারণা করিয়া তাঁহার ধ্যান করিতেছ ?

ভৈরবী—আমরা ভৈরবী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ দর্শন করি না। আমরা ভৈরবের পূজা করি। মহাদেব মহাকাল ভৈরব। অন্য পুরুষ দর্শনে নবব্রতিনী যতিনীদিগের ব্রতনাশ সম্ভাবনা। তজ্জন্য অনুরোধ করিতেছি আপনি সত্বর সরিয়া যান।

শ্রীকৃষ্ণ—আপনাদের মহাদেবের পূজার নৈবেদ্য দেখিয়া সরিতে আর মন সরিতেছে না।

তোমাদের প্রধানা ভৈরবী দিদির দক্ষিণ দিকস্থ নব-ব্রতিনী-যতিনী ভৈরবীর রূপ গেরুয়া ভেদ করিয়া আমার প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে, আহা! রূপের এমন নৈবেদ্য মহাদেবকে দান করিয়া এখনও তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই? আমার যদি ঐরূপ রূপ থাকিত আমি এক মুহূর্ত্তেই মহাদেবকে বশীভূত করিয়া বেদিয়ার বাঁদর করিয়া রাখিতাম।

ভৈরবী—উঁহার কথাই বলিতে ছিলাম, উনি নব-ব্রতিনী-যতিনী—পরপুরুষ দর্শন উহার সহ্য হয় না। আপনি ক্ষমা করুন, সত্বর স্থান ত্যাগ করুন। আপনি অভদ্র লম্পট,—পরস্ত্রী দর্শন করিয়া অকুণ্ঠিত-চিত্তে কু কথা মুখে আনিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ—ভৈরবী দিদি রাগ করো না। আমরা রাখাল। রাখালের কি সম্ভ্রম জ্ঞান আছে? আমাদের মন মুখ এক। মনে যা হয় মুখেও তাই বলে ফেলি। মনে যা হয়েচে তাই বলেচি। এতে যদি দোষ হয়, ক্ষমা কর। আর তোমাদের পূজা ত শেষ হয়েচে বলেই মনে হচ্চে। কারণ দুগ্ধ, দধি ও ঘৃতাদি শিবের মাথায় অনেক পড়েচে। পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ করিতে হয়। প্রসাদ দেবার জন্য তোমরা আর কাকে ডাকতে যাবে, তাই আমরা তোমাদের প্রসাদ ভিখারী হয়ে এসেচি। দেবতার প্রসাদ দিতে হয় দাও কিন্তু ওসব প্রসাদ আমরা চাই না, তোমাদের প্রসাদই আমরা চাই।

বিশাখা—(হাসিয়া) আচ্ছা—আচ্ছা! তাই হ'বে। পূজা প্রায় শেষ হইয়াছে। তুমি এখন রাখালদিগকে লইয়া একটু তফাতে যাও। পূজান্তে ভৈরবীগণ দেবতার প্রসাদ পাইয়া তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ তোমাদিগকে দিবেন। তাহা হইলে তাঁহাদের প্রসাদই হইবে।

মধুমঙ্গল—কি! আমরা ওদের এঁটো খাব, আস্পর্দ্ধা কম নয়!

বিশাখা—তুমি ব্রাহ্মণ; তোমাকে শত শত প্রণাম; তোমায়

বলিতেছি না; যারা আমাদের এঁটো খায়, আমাদের সেই জাত ভাইকে বলিতেছি। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) ব্রাহ্মণকে দূরে রাখিয়া এস, উহার জন্য কথা কয়েও সুখ হচ্চে না, ও আমাদের স্বজনও নয়—আর অরসিক।

শ্রীকৃষ্ণ—উহার রস তোমরা বুঝিবে না, ও আমার পরম-বন্ধু। তোমাদের সেবার জন্যই উহাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়। এখন তোমরা রসের পরিচয় পাইবে না। মরুভূমির গোপাদপ, পান্থপাদপের ন্যায় আঘাত করিলেই উহা হইতে রসের ফোয়ারা বাহির হয়!

বিশাখা—ভৈরবীরা নীরস চাতকী! হ্রদ সরোবরে জল ঢল ঢল করিলেও সে জল তাহারা পান করে না। তাহারা পান করে জলদের জল! তাহারা নব জলধরকে চায়। জলধরের জলধারা ব্যতীত তাহাদের তৃষ্ণা মিটে না।

মধুমঙ্গল—সখা তুমি থাক। আমাদের ক্ষুধা আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না; যাই মা যশোদার নিকট গিয়া পেট ভরিয়া খাইগে। আর বলিগে যে, গোপেশ্বর শিবমন্দিরে বিশাখা ললিতা আর বৃষভানু নন্দিনী রাধা তোমার গোপালকে লইয়া শিবপূজার ছলে আনন্দ করিতেছে। গোপাল তাহাদেরই প্রসাদ পাইবে। তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি অগ্রেই হইয়াছে, তাহার খাদ্য আমায় দাও।

শ্রীকৃষ্ণ—নির্ব্বোধ! আর কিছু বলিবে না ত?

মধুমঙ্গল—ভোজন শেষ করিয়া বলিব, গোপীরা ভৈরবী সাজিয়া শিবপূজার ছলে গোপালকে লইয়া মন্দিরে খিল দিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ—(বল), ক্ষতি নাই, মা ওকথা বিশ্বাস করিবে না।

মধুমঙ্গল—বিশ্বাস না করেন, আনিয়া দেখাইব।

বিশাখা—(জনৈকা ভৈরবীরা প্রতি) ভাই! মধুমঙ্গল বড় ক্ষুধার্ত্ত, ইহার জন্য উত্তম উত্তম খাদ্য লইয়া আইস।

ভৈরবী তাহা লইয়া আসিলে বিশাখা তাহা আঁচল ঢাকা দিয়া দূরে এক বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া বলিল, দাদা মধু! তুমি খাও আমি আবার আনিতেছি। ইহা এমন কি দেবতাকেও নিবেদন করা হয় নাই।

মধুমঙ্গলকে খাদ্য প্রদত্ত হইলে অন্যান্য রাখালগণ তথায় সমবেত হইয়া মধুমঙ্গলের স্থালী হইতে ভোজ্য কাড়িয়া খাইতে লাগিল। মধুমঙ্গল বলিল, বিশাখা! সকলকে উত্তমরূপে না খাওয়াইলে আমরা তোমাদের সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিব।

বিশাখা—খাবে খাওনা। তোমরা সব এই বৃক্ষতলে উপবেশন কর। আমি ভৈরবীদের দ্বারা খাদ্য পাঠাইতেছি। তোমরা ধীরে ধীরে খাও। তোমরা কৃষ্ণ সখা, তোমারা আমাদের কত আদরের ধন তা বলিতে পারি না।

(ইহা বলিয়া বিশাখা ক্ষিপ্রপদে মন্দিরে গমন করিল।)

শ্রীদাম—ভাই মধুমঙ্গল! তোর বুদ্ধির তারিফ! এই জন্যেই ত তোকে সঙ্গে রাখি। অত ক্রোধ একবারে জল! যা হ'ক এখন ত পেটভরে খাওয়া যাক্।

মধুমঙ্গল—বুদ্ধির প্রয়োজন। ভোজন বিষয়ে ব্রাহ্মণের বুদ্ধিই প্রধান। কারণ ব্রাহ্মণের উদরই প্রধান।

নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ ময়ূরাঃ মেঘ দর্শনে।
সাধবঃ পর সম্পত্তৌ খলাঃ পরবিপত্তিষু॥

ভোজনের পন্থা ব্রাহ্মণ যেমন জানে অন্য কেহই তেমন জানে না। ওর যা অন্তর টিপনি দিয়েচি, তাতে জল না হয়ে আর উপায় আছে? আর খাওয়ারও আর ভাবনা নাই।

ইতিমধ্যে ভৈরবী চারিজন নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া সত্বর উপস্থিত হইয়া পরিবেষণ করিতে লাগিল। রাখালগণ পূর্ব্বেই বৃক্ষপত্র বিস্তৃত করিয়া ভোজনপাত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে

ছানা, চিনি, ক্ষীরের সন্দেশ, লাড়ু, দধি, সর, নবনী, লুচি, মোহনভোগ প্রভৃতি পাইয়া তাহারা অতি সত্বর বদনে দিয়া ভৈরবীগণের নানা প্রশংসা করিতে লাগিল !

কেহ বলিল আহা ! ভৈরবী দিদির হাত কি মিঠে ! হাতের গুণেই এসকল অমৃতের ন্যায় বোধ হচ্চে ! এমন কি এরা যদি পেটে হাত বুলাইয়া দেন, তাহা হইলেও হয় ত পেট ভরিয়া যাইবে।

কেহ বলিল আহা ! এমন রূপ, ইহারা কৃষ্ণকে অর্পণ না করিয়া ভৈরবী সাজিয়া বড়ই ভুল করিয়াছে। সর্ব্ব জিনিসই কৃষ্ণে অর্পণ করিলে তবেই তার সার্থকতা। হাঁ ভৈরবী দিদি ! তোমাদের এত রূপ কৃষ্ণে অর্পণ কর না কেন ? কৃষ্ণে অর্পণ করিলে তোমাদের রূপ স্থায়ী হবে, জ্যোতিঃ বাড়বে। কৃষ্ণকে তোমরা যা তা মনে করো না, কৃষ্ণ আমাদের সর্ব্বস্ব ! আমরা কৃষ্ণ ছাড়া থাকিতে পারি না। আমাদের যা কিছু সব কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ আমাদের দেহ, আত্মা, মন ! কাজ, কর্ম্ম, চিন্তা, শয়ন, ভোজন, ভ্রমণ ! কৃষ্ণ আমাদের আমরা কৃষ্ণের !

প্রথমা ভৈরবী—তা বুঝা যাচ্ছে। তোমরা খাচ্চ, কৃষ্ণকে ডেকেচ ? আবার আমাদের রূপ দেবার পরামর্শ দিচ্ছ। রূপ কেমন করে দেওয়া যায় ? রূপ দেওয়ার অর্থ কি ?

সুদামা—কৃষ্ণে আমাদের যেতে ইঙ্গিত করেচে, তাই এসেচি। নতুবা আমরা কি কৃষ্ণ ছাড়া হই ? আর ভৈরবী দিদি ! কৃষ্ণও কি না খেয়ে ফিরবে ? সে যখন মন্দিরে দাঁড়িয়েচে তখন তার খাওয়া বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাকে খাইয়ে খেয়ে আমাদের যেমন তৃপ্তি, অবশ্য সে তৃপ্তিটা হল না বটে ! কিন্তু কি ক'রব, তার যে আদেশ ? আর রূপের কথা ব'লচ,—রূপ কেমন করে দেওয়া যায় ? আমরা যে আমাদের সব রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সব তাকে দিয়ে ফেলেচি। অর্থাৎ তাতে আত্মসমর্পণ করলেই শুধু রূপ

কেন সব দেওয়া হল। কৃষ্ণের সেবা হ'ল স্পর্শ, কৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন হল—শব্দ, কৃষ্ণের গায়ে গঙ্গানুলেপন হল গন্ধ, কৃষ্ণ বিলাসের সহায়-তাই হল রস, আর কৃষ্ণের অপরূপ মাধুরী নিরীক্ষণের প্রবল তৃপ্তিই হল রূপ দান।

অন্তরে আনন্দিত হলেও দ্বিতীয় ভৈরবী প্রকাশ্যে বলিল—তোমরা খাও—খাও! তোমাদের ছেলে মুখে বুড়ো কথা কেন? রূপ দানের তোমরা কি জান? রূপ দান বড় সহজ কথা নয়। বড় হ'লে বুঝবে হিন্দু রমণীর সতীত্বই বড়! তার চেয়ে আর কিছু নয়! আমরা হিন্দু। সতীত্বের মর্ম্ম এক হিন্দুই বুঝে! নারীর সতীধর্ম্মের ন্যায় আর বড় সাধনা কিছুই নাই। সতীত্বেই তার চতুর্ব্বর্গ!

মধুমঙ্গল—তা বুঝি, শ্রীকৃষ্ণে সতীত্বটা একবার দিয়েই দেখ না।

তৃতীয় ভৈরবী—নির্ব্বোধ! সতীত্ব কি দেবার জিনিষ? সতীত্ব অদেয়। শুধু দেওয়া নয় দেওয়ার বাসনা একবার ভ্রম ক্রমে মনে উদয় হ'লেও সতীত্ব ধ্বংস হয়।

শ্রীদাম—বটে! এমন জিনিস? আচ্ছা সে জিনিষটা একবার আমাদের দেখাতে পার?

তাহা শুনিয়া ভৈরবীরা এক সঙ্গে হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিল! তৃতীয় ভৈরবী বলিল নির্ব্বোধ! সে জিনিস দেখাইবারও নয়, তাহা হৃদয়ের ভিতর থাকে। হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িলেও তাহা দেখান যায় না। কেবল সতীত্বের মহত্ত্ব দেখান যায়! ফণীর মণির ন্যায় লোকে তাহার জ্যোতিঃ দেখিতে পায়, কিন্তু মণি দেখিতে পায় না। তোমাদের সারল্যে আমাদের প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠিয়াছে। তোমাদিগকে শত শত মুখে চুম্বন করিলে যেন আমাদের সে আনন্দ পরিতৃপ্তি লাভ করে। তোমরা কৃষ্ণগতপ্রাণ! তোমরা ধন্য! আমরাও তোমাদের ন্যায় কৃষ্ণকে ভালবাসি! কিন্তু নিষ্ঠুর কৃষ্ণ আমাদিগকে দূরে তাড়াইয়া দিতেছে!

সুদাম—সে কি! কৃষ্ণ ত নিষ্ঠুর নয়! কৃষ্ণের দয়ার মত আর দয়া আছে? আমরা কত বিপদে পড়েচি, আমাদিগকে কতবার রক্ষা করেচে।

চতুর্থ ভৈরবী—তোমরা কৃষ্ণপ্রিয়—খেলার সাথী। তোমাদিগকে লইয়া খেলা করিবার জন্যই কৃষ্ণ সর্ব্বদাই সচেষ্ট। তোমরা ধন্য! তোমাদের সেবা করিয়া যদি কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইতে পারি, তবেই জীবন সার্থক হবে। তোমরা ভাই কৃষ্ণকে একটু বলে কয়ে দিও, সে যেন আমাদের তৈরী মিষ্ঠান্ন খায়।

মধু মঙ্গল—বলতে কইতে হবে না। তোমরা থালায় থালায় এমনই করিয়া চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় খাদ্য এনে দিও, আমরা ভাব করিয়ে দেবো। ভোজনের কাছে আর কিছু আছে? আহারের লোভে সবাই মরে! কীট, পতঙ্গ, সাপ, বাঘ, মাছ, হাতী, ঘোড়া, উট, সিংহ, ভল্লুক কোনটী নয়? মানুষই কি কম? রাজ্যধন, ঐশ্বর্য্য, বলবীর্য্য সবই ত আহারের জন্য! পরের কেড়ে খাবার জন্যই যুদ্ধ করে মরে! তাই বলি ভৈরবীদিদিরা নানা ছলে খাবার এনে কৃষ্ণকে খাইও, আর আমাদিগেই কিছু কিছু দিও; কৃষ্ণপ্রেম কেমন না হয় আমি দেখবো। সে দায় আমার আছে, আমি প্রেম করিয়ে দেবো!

প্রথম ভৈরবী—আহারে প্রেম হয়?

মধুমঙ্গল—কি মুস্কিল! আহারে প্রেম হয়, না ত হবে কিসে? তুমি আমায় দশ দিন খাওয়াও ত দেখি তোমার সহিত আমার প্রেম হয় কি না।

তাহা শুনিয়া ভৈরবীরা হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিলে মধুমঙ্গল বলিল অবশ্য দু এক দিনে হবে না, বেশী দিন ধরে খাওয়াতে হবে, তবেই ভালবাসা জমবে।

দ্বিতীয়া ভৈরবী—তোমাদের সহিত প্রেমের দরকার নেই।

মধুমঙ্গল—হুঁ! খাওয়াতে হবে কি না! অত সহজে প্রেম হয় না। রাস্তার লোককে খাওয়ালে তারও একটা টান হয়। যদি খাওয়াতে স্বীকৃত হও, তবে এস আমার কাছে, আমিই কৃষ্ণ-প্রেমের অধিকারী। যার যতখানি প্রেমের প্রয়োজন, খাওয়ান বুঝে আমি তাকে ততখানি প্রেম দেবো।

ভৈরবীগণ বলিল তোমরা ধীরে ধীরে খাও, আমরা জল আনি। ইহা বলিয়া তাহারা মন্দিরে ফিরিয়া গেল।

ইতিমধ্যে মন্দিরে অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ বলিলেন বাঃ! উহাদের জন্য খাবার গেল, আর আমি মন্দিরে আসিয়াও প্রসাদ পাব না? ইহা বলিয়া কৃষ্ণ অগ্রসর হইয়া দূর হইতে সম্বোধন করিয়া বলিলেন প্রধানা ভৈরবী দিদি! বিশাখা আমাকে যত্ন করা দূরে যাউক অপমান করিতেছে! বসিতে বলা দূরে যাউক তাড়াইয়া দিতেছে। একমাত্র তুমিই বিচারের মালিক, তোমার নিকটই অভিযোগ করিতেছি, বিচার তোমাকেই করিতে হইবে। নীরব থাকিলে চলিবে না, অত গম্ভীরতা ভাল নয়।

ইহা বলিতে বলিতেই কৃষ্ণ ক্রমশঃ প্রধানা ভৈরবীর নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ভৈরবীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিশাখা বলিল, কর কি, কর কি? পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, পুরুষের স্পর্শের ত কথাই নাই! সর্ব্বনাশ করিলে! সর্ব্বনাশ করিলে! ভৈরবী দিদি আজ আর প্রাণে বাঁচিবেন না। উনি মরিলে উঁহার শিষ্যাদের আর কি বাঁচিবার সাধ থাকিবে? এখনও নিবৃত্ত হও।

শ্রীকৃষ্ণ—তুমি আমার অপমান করিয়াছ তোমার কথা শুনিব না, ভৈরবী দিদির নিকট নালিশ করিয়াছি, তিনি কি বিচার করিবেন না? ইহা বলিতে বলিতেই তীরবেগে গিয়া প্রধানা ভৈরবীর ক্রোড়ে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়াই বলপূর্ব্বক অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবার

চেষ্টা করিয়া বলিলেন ভৈরবী দিদি! আমার নালিশের বিচার করিতে হইবে, বিশাখার অপমান আমার অসহ্য। ভৈরবী প্রমাদ গণিয়া অবগুণ্ঠন বল পূর্ব্বক ধরিয়া রহিলেন। কৃষ্ণও ছাড়িবার পাত্র নহেন, ভৈরবীর বদন চন্দ্র নিরীক্ষণ জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সুতরাং উভয়েরই যুদ্ধ বাধিল।

ইতিমধ্যে অন্যান্য ভৈরবীগণ স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে খিড়কী দ্বার দিয়া পলায়নের উপক্রম করিতে লাগিল। তাহারা দ্বার খুলিয়া বাহির হইবে, এমন সময় বৃক্ষতল হইতে রাখালগণ তাহা দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

এ দিকে কৃষ্ণ বলপূর্ব্বক অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দেখিলেন ললিতা! তখন তিনি দম্ভ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন বিশাখা! তোমার এই ভৈরবী দিদি? ইনি পুরুষ দর্শন করেন না? ইহা বলিতে বলিতে জটা ধরিয়া টানিতেই আসল মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল। কৃষ্ণ তখন সখাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, ভৈরবী দেখিবে এস, ভৈরবী দেখিবে এস!

রাখালগণ কৃষ্ণের ডাকে উত্তর দিয়া বলিল অন্য ভৈরবী দিদিরা পালাইতেছেন ইহাদিগকে আটকাইয়াছি। ইহাদিগকেও লইয়া যাইতেছি। বিশাখা বলিল খবরদার! গায়ে হাত দিও না।

মধুমঙ্গল—তোমরা মন্দিরে প্রবেশ না করিলে আমরা প্রবেশের পথ পাইতেছি না।

বিশাখা—আমরা দ্বার ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা আমাদের যাইতে দাও।

মধুমঙ্গল—কৃষ্ণের আদেশ না পাইলে ছাড়িতে পারিব না।

(মন্দিরের অভ্যন্তরে) প্রথমা ভৈরবী—আমরা যদি ভৈরবী হই, তাহাতে তোমার কি? আমরা পুরুষের মুখ যদি না দেখি? আমরা স্বাধীনা, কাহারও অপেক্ষা রাখি না, আমরা সন্ন্যাসিনী।

কৃষ্ণ—ভৈরবী দিদি! তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু সাজা সন্ন্যাসিনী কেন? গেরুয়ার অভ্যন্তরেও দেখিতেছি রেশমী বস্ত্র ঝলমল করিতেছে! ইহা বলিতে বলিতেই কৃষ্ণ গেরুয়া খুলিয়া ফেলিয়া দেখিলেন, স্বর্ণরজতাদি অলঙ্কার সজ্জিতা বক্ষঃদেশে মনোরম অত্যুজ্জ্বল হার সুশোভিত অপূর্ব্ব ললিতা মূর্ত্তি! তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ আবেগভরে তাহার বদন কমলে গাঢ় চুম্বন করিয়া বলিলেন ললিতে! আমায় সন্ন্যাসী সাজাইতে চাও? তোমাদের ভৈরবী রূপ দর্শন আমার প্রাণে সয় না। ললিতে আমার গৌরী কোথায়? বিশাখা! তোমাদের মনে এই ছিল?

ইহা বলিয়া কৃষ্ণ অবশ হইয়া ভূতলে শুইয়া পড়িলেন! তাহা দেখিয়া ললিতা চীৎকার করিয়া উঠিলে বিশাখা সহিত ভৈরবীবৃন্দ ও রাখালবালকগণ মন্দিরে প্রবেশ করিল এবং কৃষ্ণকে তদবস্থায় দেখিয়া আকুল হইয়া কে কি করিবে তাহার ঠিক পাইল না। বিশাখা রাখালগণকে জল আনিতে বলিয়া পাখা লইয়া ব্যজন করিতে লাগিল। ললিতার ইঙ্গিতে ভৈরবীগণ তৎক্ষণাৎ ভৈরবী বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রজবালা বেশ পরিগ্রহ করিয়া কৃষ্ণ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শুশ্রূষার নিযুক্ত হইল। শ্রীরাধা অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে প্রিয়তমের পদদ্বয় ক্রোড়ে লইয়া মুহুর্মুহুঃ তাহাতে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন।

বিশাখা কৃষ্ণের কানে কানে বলিল হে প্রিয়তম! উঠ। আমাদের প্রিয়তম সখী রাধা তোমার পদদ্বয় মস্তকে লইয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। তুমি ভিন্ন তাহার সান্ত্বনার আর কেহ নাই। রাখালগণকে লইয়া ভোজনে বস। আমরা তোমাদের জন্য নানাবিধ সুখাদ্য আনিয়াছি।

কিয়ৎক্ষণপরে শ্রীকৃষ্ণ নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক যেন চেতনালাভ করিয়া বলিলেন বিশাখা! ভৈরবীরা কৈ?

বিশাখা—ভৈরবীরা পলায়ন করিয়াছে। ভৈরবীতে তোমার প্রয়োজন কি? পদতলে কে দেখ।

শ্রীকৃষ্ণ (সখাদের প্রতি) তোমরা বাহিরে গিয়া দেখ এখানে অন্য কেহ না আসে। সখাগণ বাহিরে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিল ললিতে! তোমাদের সখী কৈ? তাহাকে ভৈরবী সাজাও নাই ত?

তাহা শুনিয়া শ্রীরাধা প্রিয়তমের অন্তরে অসহ্য ক্লেশ হইতেছে বুঝিয়া এবং সে ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া ও নিজের কোন সম্মানের অপেক্ষা না রাখিয়া, কাহারও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিলেন "এই যে আমি, এই যে আমি—তোমার দাসী। তুমি উঠ! উঠিয়া বসিয়া সখাদের ডাক। আমরা আজ প্রাণ ভরিয়া তোমায় ও তোমার সখাদের খাওয়াইব।

তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার রূপবহ্নিতে পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। অনিমেষ নয়নে রাধারূপ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন সই! আমি দাস—চিরদাস—আমার অপরাধ ক্ষমা কর। বিশাখা! আজ তোমায় কি পুরস্কার দিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না, আমার দেহ তোমাদের দিলাম; ইহা লইয়া তোমরা যাহা করিতে হয় কর।

ললিতা—আমরা এ দেহ আমাদের সখীকে দান করিলাম।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া কতকটা লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন। এবং ধীরে ধীরে ঘোমটা টানিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন এখনও লজ্জা? বস্ত্র হরণের কথা মনে নাই? লজ্জা অষ্ট পাশের এক পাশ। সখিগণ আজ আমাদের মিলনের শুভদিন। আজ যমুনায় মিলনের বাঁশী বাজিবে। এখনই তোমাদের আলিঙ্গন করিতাম কিন্তু সময় এখনও আসে নাই—সময়ের অপেক্ষার প্রয়োজন। আজ আমি প্রাণভরে চাঁদমুখ দেখে নব বলে বলীয়ান হইলাম। আজ আমার জীবন সার্থক। সময়ের

অপেক্ষায় চুম্বন করিতেও পারিতেছি না এবং থাকিতেও পারিতেছি না, কি করি ললিতে ?

ললিতা – মাঝামাঝি ব্যবস্থা অবশ্যই আছে—দূর হইতে আমাদের সখীকে প্রণাম কর।

তাহা শুনিয়া শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সরিয়া গেলেন।

বিশাখা—শাঁখ বাজাও শাঁখ বাজাও। আজ আমাদের শিব-পূজা সার্থক। প্রধানা ভৈরবীর প্রধানা শিষ্যা ভানুসুতার সাধনা সার্থক হইয়াছে। ভৈরবীরও সৌভাগ্য কম নহে। সেও আজ বিরিঞ্চি-বাঞ্চিত কোলে পাইয়া চুম্বন লাভ করিয়াছে। আমরাও প্রধানা ভৈরবীর পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতেছি। সে ব্যবস্থা আমাদের হইয়া প্রিয়তম! তোমাকেই করিতে হইবে। তুমি উহার কোলে বসিয়া উহাকে ধন্য করিয়াছ, এখন উহাকে তোমার কোলে লইয়া আপনি ধন্য হও, আমরা দেখিয়া স্থান ত্যাগ করি।

ললিতা—হে সখে! আমি তোমার গৌরীকে ভৈরবী সাজাইয়াছি বলিয়া আমার উপর তোমার ক্ষোভ ও দুঃখ হইয়াছে, তজ্জন্য আমার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। এ সব বিশাখারই কুট-কৌশল! আমরা যন্ত্রবৎকার্য্য করিয়াছি। যন্ত্রিনী ঐ বিশাখা। তুমি যে আমাদের সন্ন্যাসিনী বেশ দেখিয়া ক্লেশ পাইয়াছ ইহাতে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। আমরা অপরাধিনী। আমাদের ক্ষমা কর। তোমার ক্লেশের কথা স্মরণ করিয়া বিশাখার শ্লেষকেও অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইলাম।

কৃষ্ণ—ললিতে! তোমরা আমার কত প্রিয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না! তোমরা আমার নও, ইহা ভাবিতেও আমার প্রাণ কেমন করিয়া উঠে! তোমাদের সাজ, সজ্জা, বস্ত্র, অলঙ্কার আমার প্রাণে বড় আনন্দ দান করে। তোমাদিগকে যতিনী দেখিলে আমার মনে হয়, আমায় আদর করিবার জন্য জগতে আর আমার কেহই নাই। তোমরা আমার প্রণয় লাভ করিবার জন্য বিশাখার কথায় আমার

প্রণয় পরীক্ষা জন্য যতিনী সাজিয়া শিকার লাভের অপেক্ষা করিতে-ছিলে, শিবপূজা ছলমাত্র। তাহা হইলেও তাহা আমি সহ্য করিতে পারি নাই! তোমাদের হারাইলাম, সহসা ইহা আমার মনে উদয় হওয়ায় সম্ভবতঃ আমার চৈতন্য লোপ হইয়া ছিল। অতিপ্রিয় বস্তুর বৈরূপ্য দর্শন করিলে এইরূপই হয়, ইহাই জীবের স্বভাবজ-ধর্ম্ম। যাহা হউক, আর তোমরা চিন্তিত হইও না। কাত্যায়নীর বরে আজ আমাদের শুভ মিলনের দিন। সখাদের সহিত আজ আমি উপবেশন করিতেছি, আমাদের ভোজন করাও।

বিশাখা পূর্ব্ব হইতেই সখীদের দ্বারা আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিয়া ছিল। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সখাদের ডাকিয়া ভোজনে বসান হইল। ললিতা পরিবেশন আরম্ভ করিল। বিশাখা খাদ্য যোগাইতে লাগিল। শ্রীরাধা নিঃশব্দে স্বহস্তে প্রস্তুত বিবিধ মিষ্টান্ন মধ্যে মধ্যে তাহাদের পরিবেশন করিয়া প্রত্যেকের ভোজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সখীদের ফরমাইস করিতে লাগিলেন—ক্ষীর দাও, দধি দাও, ক্ষীরের সন্দেশ দাও, সর দাও, মাখন দাও, নবনী দাও।

মধুমঙ্গল মধ্যে মধ্যে বলিতে ছিল মধু—মধু—মধু!

কয়েকবার তাহাকে মধু দেওয়া হইলেও পুনঃ পুনঃ চাহিতেছিল দেখিয়া বিশাখা কাঁচা গুড় কতকটা লইয়া গিয়া দেওয়ায় সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—মধু কাহাকে বলে জান না? মধু কখনও খাও নাই বা দেখ নাই?

বিশাখা—তোমার ত মধুপর্কের সহিত সম্বন্ধ, তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত! তবে মধু অর্থ জলও হয়, তাহাই চাহিতেছ কি? অনেক মিষ্টান্ন খাইয়া বোধ হয় পিপাসা বাড়িয়াছে?

মধুমঙ্গল—বাঃ! পাণ্ডিত্যের সীমা নাই। আহারের সময় ওসব পাণ্ডিত্য রাখ। এখন মধু না থাকে আমায় ক্ষীর দাও, ছানা দাও, লুচি মোহনভোগ সখাদের দাও।

কৃষ্ণ—মধু, একটু তাড়াতাড়ি খাও, আমরা সবাই ত খাওয়া প্রায় শেষ করিয়া ফেলিলাম।

মধু ব্রাহ্মণেরও অভ্যাস নাই, বাড়ী গিয়া ক্ষুধা পাইলে খাইব কি?

কৃষ্ণ—ওঃ! ললিতে মস্ত ভুল করিয়াছ, সখার জন্য কিছু ছাঁদা দাও। শুধু একার জন্য নয়, আরও ৩।৪ জনের উদর পূর্ত্তি হয় এমন ভাবে দিও।

মধু—হুঃ! দেখ দেখি সখা নহিলে দয়া ভাবিবে কে? – দাও দাও দাও; তোমরা বাঁধা বাঁধি করতে করতে আমি খাইতে থাকি.— অভাব মত তোমরা যোগাও। একটা কথা শুধু ছাঁদা দিলেই হবে না, বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। কারণ, ভোজন শেষ করিয়া আমি যে উঠিতে পারিব এ সম্ভাবনা আমার নাই, কাজেই আজ এখানে আমায় শিবরাত্রি করিতে হইবে।

বিশাখা—কি রকম? না খাইয়া ত শিবরাত্রি হয় ইহাই ত জানি, এরূপ খাইয়া উদর ভারে নড়িতে না পারিয়া কিরূপে শিবরাত্রি হয়?

মধু—বিশাখে! তুমি ইহার মর্ম্ম বুঝিবে কেমন করিয়া? তোমরা ত ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়া এমন করিলে যে আর নড়িতে চড়িতে দিবে না। তোমরা যে যার গৃহে পলায়ন করিবে অগত্যা আমাকে শিব ভরসা করিয়া এই শিবমন্দিরেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। আর পড়িয়া থাকিলে ত আর শিবঠাকুর আহার দিবেন না, কাজেই উপবাসী থাকিতে হইবে। সুতরাং শিবরাত্রি হইবে না ত আর হইবে কি?

বিশাখা—ওহো! তবে তোমায় ভোজন করাইয়া আমরাই অপরাধী হইলাম বুঝি?

মধু—তা নয়। এখনও ভাল চাও ত ব্রাহ্মণ সন্তানকে ঘরে পৌঁছাইয়া দাও।

বিশাখা—নহিলে?

মধু—নহিলে শিবরাত্রি আর ক্ষুধায় জ্বালায় অভিশাপ!

ললিতা—তবে এখনও নিরস্ত হও আর খাইও না।

মধু—এও কি হয়? যা পাতে দিয়াছ তাও কি ফেলে রাখতে পারি? আরও পেট খালি করে উঠাও অভ্যাস নাই, তাতে বরাতে যা থাকে তাই হবে।

বিশাখা—বরাতে পাল্কিই আছে!

মধু—বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্চে,—সবার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, আমি এখনও শেষ কত্তে পাচ্চি না,—তোমরা সব সরে যাও, আর আমার ভোজ্য দ্রব্য যেটা ফুরায় সেটা দিতে থাক।

বিশাখা—দেবার আর কিছু নাই, সবই ত তোমার পাতে ঢালিয়াছি। আমরা পূজার উপকরণ আনিয়াছিলাম, তোমাকে ভোজন করাইব বলিয়া কিছু আনি নাই। তুমি এমন স্বার্থপর ভোজনসর্ব্বস্ব যে, সখাদের পাতের দিকে একবারও তাকাও নাই।

মধুমঙ্গল আর কোন কথা না বলিয়া এক একবার বিশাখার মুখপানে চাহিয়া তাড়াতাড়ি ভোজ্য দ্রব্য মুখে দিতে লাগিল দেখিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া মধুমঙ্গল অনুচ্চস্বরে বলিল, থাম আগে খাওয়া সারি।

আবার হাসির ধূম পড়িয়া গেল!

বিশাখা—দাদা মধু! তুমি বসে বসে খাও আমরা আসি।

মধু—তা—হা হ—ই—বে না। (খাইতে খাইতে বাঁ হাত পাতিয়া) দক্ষিণা? নহিলে শিবপূজায় ফল হবে না। আর জান ত লোভী ব্রাহ্মণ দক্ষিণা না পেলে অন্য ঘরে কিছু প্রাপ্তির আশায় তোমাদের শিবপূজার মন্ত্র বা কৌশল সব প্রকাশ করিয়া দিবে?

বিশাখা—বেইমান্! এত খেয়েও তবু নিন্দা!

মধু—দেখ বিশাখা, এ ত শ্রাদ্ধবাড়ী নয়—এ যে বিয়ে বাড়ী। তোমরা করবে আনন্দ আর আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ এ সুযোগে কিছু ট্যাকেও গুজতে পাব না?

বিশাখা—এই কথা ? আচ্ছা এই নাও আমার হেমহার তোমার গলায় পরিয়ে দিচ্চি। ইহা বলিয়া নিজ হার খুলিয়া মধুমঙ্গলের গলায় পরাইয়া দিলে সে এঁটো মুখ-হাতেই সেখান হইতে দৌড় দিল !

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বিশাখা ! তোমার হারের জন্য চিন্তা করিও না সখা তোমার সহিত পরিহাস করিতেছে।

তাহা শুনিয়া দূর হইতে মধুমঙ্গল বলিল পরিহাস নয়, সত্যই এ হার পরিয়া শর্ম্মা চলিল ! আর কেড়ে নিতে পারিবে না, বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল !

শ্রীকৃষ্ণ—অন্যান্য সখাগণে বলিলেন সত্বর উহার অনুসরণ কর, আমিও যাইতেছি, ও হার দেখাইয়া কাহাকে কি বলিবে তার ঠিকানা নাই। উহাকে সংযত করগে। তাহা শুনিয়া সখারা প্রস্থান করিল।

বিশাখা—পরিহাস করিয়া নয়, সত্যই আমি মধুকে হার উপহার দিয়াছি। ও দুষ্টু লোক, ওকে শান্ত রাখা ভাল, কি জানি কার কাছে কখন কি বলিবে।

ললিতা—(কৃষ্ণে প্রতি) হে নন্দনন্দন ! আমরা তবে আসি ? কিন্তু আমাদের সখীকে কেমন করিয়া লইয়া যাইব, তাহাই ভাবিতেছি। তোমার অদর্শনে উহার কি হয়, তা বলিতে পারি না। সে অবস্থা না দেখিলে অনুভব করিতে পারিবে না।

কৃষ্ণ—আজ শুভ মিলনের দিন। আর অপ্রাপ্তির ভয় নাই, এখন তোমার সব প্রস্তুত হওগে। শুন—শুন—শুন ! তোমরা সব শিবপূজায় বস। অদূরে কুটিলার কণ্ঠস্বর শুনিতেছি।

তাহা শুনিয়া বিশাখা পূর্ব্ববৎ সদর দ্বারে দাঁড়াই রহিল। সত্বর কুটিলা আসিয়া পৌঁছিলে কৃষ্ণ খিড়কী দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন। কুটিলা ত্বরিতগতিতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বলিল পূজা হইয়াছে ?

ললিতা—হাঁ শেষ হয়েচে।

কুটিলা—এই ভোজনপাত্র সব!

ললিতা—হাঁ ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইয়াছে। পরিষ্কার করিয়া যমুনায় যাইবার উপক্রম করিতেছি।

কুটিলা—মধুমঙ্গলসহ রাখালদিগকে ভোজন করাইয়াছ?

বিশাখা—রাখালরাও খাইয়াছে।

কুটিলা—কৃষ্ণ ছিল?

বিশাখা—কৃষ্ণ কোথায় নাই? রাখালরাজ—রাখাল ছাড়া কি থাকে?

কুটিলা—(হার দেখাইয়া) এ হার কার?

বিশাখা—আমার।

কুটিলা—মধু পাইল কেমন করিয়া?

বিশাখা—আমি তাকে দিয়েছি।

কুটিলা—কেন?

বিশাখা—ভোজন দক্ষিণা।

কুটিলা—তা হলে মধুর কথা মিথ্যা নয়?

বিশাখা—কি কথা?

কুটিলা—কৃষ্ণের সহিত তোমরা আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলে।

বিশাখা—মধু ছিল এবং রাখালরাও ছিল, তবে আমরা কি আমোদ করিলাম? আমরা শিবপূজা করিয়া তাহাদিগকেও খাইয়েছি। মধু ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহাকে ভোজন-দক্ষিণার জন্য হারটা দিয়াছি। তোমাদের বউ হার দেন নাই, তার হার তার গলায় আছে দেখ।

কুটিলা—(বিশাখার প্রতি) তুই ওস্তাদের গুরু। তোর মন্ত্রণাতেই আমাদের সোণার সংসার ছারে খারে গেল!

বিশাখা—তোমরা শিবভক্ত হয়ে তোমাদের এমন মন খারাপ কেন? কাগে কান নিয়ে গেল, বললেই বিচার না করে তার পিছু পিছু ছুটতে হবে?

কুটিলা—বাপ! তোরা এত চালাকি শিখলি কোথায়?

বিশাখা—চালাকি আবার কি?

কুটিলা—মধু কি মিথ্যে বল্‌লে?

বিশাখা—কি বল্‌লে?

কুটিলা—বল্‌লে তোরা ভৈরবী সেজে শিবপূজা কত্তে এসেছিলি।

বিশাখা—হাঁ এসেছিলুম।

কুটিলা—কৈ তোদের ভৈরবী বেশ।

বিশাখা—যে কাজের যে অঙ্গ। মহাদেব পূজা কর্ত্তে হ'লে ভৈরবী সাজা ত কর্ত্তব্য। ভৈরবী সাজিলে শিবপূজার উদ্দীপনা হয়। পূজা শেষ হল, আর এখন আমরা ভৈরবী সেজে থাকব কেন? তাই আমাদের সাধারণ বেশ ধরেচি।

কুটিলা—তার পর মধু বললে, কৃষ্ণ সহিত রাখালদের ভোজন করাবে বলেই ছল করে শিবপূজার নৈবেদ্যরূপে নানাবিধ খাদ্য নিয়ে গেছল।

বিশাখা—আমরা কি শিবপূজা করিনি? পূজার অঙ্গ ভোজন করান, তা ত পূর্ব্বেই বলেছি। তাতে দোষটা কি হল?

কুটিলা—বৌ নাকি কৃষ্ণের পদসেবা করেচে। কৃষ্ণের নাকি মূর্চ্ছা হয়েছিল। কৃষ্ণকে স্বহস্তে খাইয়ে তাকে বাঁচিয়েচে।

বিশাখা—এতগুলো লোকের মাঝে রাখালদের সামনে আর কি করেচে? মধুকে নিয়ে এসে আমাদের সামনে ভজাও ত! সে খাবার লোভে আর একটা ফন্দী আঁট্‌চে! তুমি যখন তার কথায় মজেচ তখন তোমাকেও ফাঁদে ফেলবে। ঐ যে হারটী দিয়েচে, লোকের কাছে বলবে, কুটিলা আমায় ভালবাসে সেইজন্যে তাকে হার দিয়েচি।

কুটিলা—অ্যাঃ! বলিস্ কি? হতচ্ছাড়া এমন নাকি?

বিশাখা—সত্যি—সত্যি সত্যি! তাকে আমাদের জানা আছে! খাবার ফন্দীতে বলতে না পারে, তার এমন কথা নাই। কেবল খাবার

ফন্দীতে ঘুরচে। হয় ত এতক্ষণ ঐ কথা রটিয়েচে! তোমার হাতে ঐ হার দেখলেই লোকে সে কথায় বিশ্বাস করবে।

কুটিলা তাহা শুনিয়া মধুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বিশাখার পদতলে হার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বেগে চলিয়া গেল।

বিশাখা হার কুড়াইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে গলায় পরিয়া সদলে যমুনার দিকে যাত্রা করিল। ললিতা বলিল সাবধান! আমাদের খুব হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে। শিবপূজা করে আমরা আনন্দে বাড়ী ফিরচি, এইটিই যেন সকলে দেখে। কুটিলা যে দৌড়িয়া পলাইল, উহাকে বিশ্বাস নাই। হয় ত উহার দাদা বা মাকে ডাকিয়া আনিয়া একটা গোল বাধাইবার চেষ্টা করিবে। আর একটা কথা, মধুকে কেমন করিয়া জব্দ করা যায় সেই ফন্দীটা সবাই ঠাওরাও!

শ্রীরাধা—ছি! ও কথা ভাবিবার আমাদের সময় কোথায়? ও পথ আমাদের নয়। সে যে তাঁর সখা! আর ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্যে। বিশাখা হারের কথায় ননদিনীকে যা বলচে তাতেই সে বেশ জব্দ হয়ে গেছে! মধুর কথায় আর বিশ্বাস করবে না।

সত্বর এঁটো পাতা ফেলিয়া, যমুনায় গিয়া হাত মুখ ধুইয়া বাড়ী ফিরিয়া, নব-সমাগমের নবীন উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া বাঁশীর আহ্বানের উদ্দেশে সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া রহিল।

——(০)——